সিকিম

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

আনন্দধারা প্রকাশন

বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক

মনোরঞ্জন মজুমদার

আনন্দধারা প্রকাশন

৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

মুদ্রক

সুধীর পাল

সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ

খালেদ চৌধুরী

শ্রীমতী আরতী সরকার

কল্যাণীয়াসু

এক

কার কণ্ঠস্বর !

বাইরে কার কণ্ঠস্বর !!

হুকার সাহেব লাফিয়ে ওঠেন। তাঁর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বুঝি থমকে যায় মুহূর্তের জন্য। উৎকর্ণ হয়ে শোনেন চীৎকারের শব্দ।

এ যেন ক্যাম্বেলের কণ্ঠ ! চীৎকার আরও স্পষ্ট হয়ে আসে। হ্যাঁ, ক্যাম্বেলই প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকছেন—হুকার, হুকার, শীগগীর বেরিয়ে এসো ? অসভ্যগুলো আমাকে মেরে ফেলল।

হুকার লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। ডাঃ ক্যাম্বেলের সাহায্যের জন্য দ্রুত অগ্রসর হবার চেষ্টা করতেই, কয়েক জোড়া সবল বাহু তাঁকে সাঁড়াশির মতো বেষ্টন করে চেপে ধরে। একচুল নড়বার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন হুকার। এমন কি, ধস্তাধস্তি করে ওদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার সুযোগও পান না। জবরদস্তি ঠেলতে ঠেলতে ওরা তাঁকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে চেপে বসিয়ে দেয় আসনে। হুকার সাহেব যেন পাথর হয়ে যান।

তারপর···

তাঁর আশেপাশে সবল মানুষগুলো বসে থাকে সতর্ক প্রহরীর মতো। দারুণ উত্তেজনা আর উচ্চতা-জনিত ক্লান্তিতে বসে বসে হাঁফাতে থাকেন হুকার সাহেব। এক মুহূর্তের জন্য যা দেখেছিলেন, তার সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিউরে ওঠেন। বাইরে থেকে ধস্তাধস্তি আর চাপা আর্তনাদের শব্দ তখনও ভেসে আসছিল ঘরে। নিষ্ফল আক্রোশে আর ক্রোধে, দারুণ ঠাণ্ডার মধ্যেও হুকার সাহেবের কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে দরদর করে। অসহায়ের মতো চারপাশের হিংস্র চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে

ও প্রায় নিঃশব্দ তার জলকল্লোল বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মতো যেন পা টিপে টিপে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হয়েছে জেষ্ঠা রঙ্গীতের কাছে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোলের মধ্যে। এই লিটল রঙ্গীতের ওপরে সযত্নে রচিত মজবুত সেতু দেখে কেমন যেন মনে হয়।

সেতু পেরুতেই সিঙলা বাজার। অশ্বত্থ গাছ, আমগাছের ছায়ায় ছায়ায় স্নিগ্ধ পথ। দু-ধারে বড় বড় দোকান। বাঙলাদেশের সীমান্তের শেষ ব্যবসাকেন্দ্র। সিঙলা বাজার পেরিয়ে প্রায় ফার্লং দুই দূরে রম্যম ও গ্রেট রঙ্গীতের সঙ্গমস্থলের কাছেই বিস্তীর্ণ বেলা-ভূমিতে সারি সারি রঙীন তাঁবু পড়ে বেলা বারোটায়। তাঁবুর ভেতরে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে সবাই সাবান তোয়ালে নিয়ে হাজির হয় রম্যম নদীর শীতল জলের ধারে। দেখতে দেখতে ছোট্ট নদীর কলধ্বনিতে মুখরিত বেলাভূমি নতুন যাত্রীদের সমাগমে আবার নতুন করে নির্জনতা ভঙ্গ করে। মাল বহনকারী নেপালী কুলির দল, শেরপানীর দল, একে একে হাজির হয় এসে। মালপত্র নামিয়ে সবাই মুখের ঘাম মুছে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় নদীর দিকে।

আমার সহযাত্রী ডাঃ বিমল ঘোষাল। দার্জিলিঙ মাউণ্টেই-নীয়ারিং ইনস্টিট্যুটের ডাক্তার। ১৯৬২ সনে বিমল কলকাতায় হিমালয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত নীলগিরি (২১,২৪০ ফুট) অভিযানে মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে প্রথম তার হিমালয় দর্শন। হিমালয়ের আঙ্গিনায় তার সঙ্গে আমারও পরিচয় হয়েছিল। অভিযান থেকে ফিরে এসে সে চাকরি নিয়ে এসেছিল দার্জিলিঙ মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিট্যুটে। অবশ্য উদ্দেশ্য উচ্চ হিমালয়ে মানুষের দেহের ওপরে উচ্চতার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করা। বিমলের কাছে আগেই শুনেছি সিকিম সম্পর্কে। পর্বতারোহণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাকে বারকয়েক আসতে হয়েছিল সিকিমে।

সমস্ত তাঁবুগুলি ঘুরে ঘুরে দেখি বিমলের সঙ্গে। একটি তাঁবুর সামনে দেখি চুপ করে বসে আছে বোম্বের আণবিক কমিশনের কর্মী

গোখেল। সে স্নান করতে যায় নি। আমাদের দেখে হেসে বলে, আমার নদীর জলে স্নান করতে ভাল লাগে না।

আমি বলি, সে কি! স্নান করলে শরীরের ক্লান্তি দূর হত।

না ডাক্তার সাহেব! গোখেল বিমলের দিকে তাকায়, স্নান করার চাইতে বসে বসে দেখছি চারধার। কাল ভোরেই তো আবার চলতে হবে। দেখার সময় আর সুযোগ কোথায়?

আমি আর বিমল দুজনেই অবাক হই। আমি ভাবি, তাই তো! সময় তো হিসেবের খাতায় জমা হয়ে রয়েছে। বুঝে-সুঝে খরচ করতে হবে। একথা ভুলেই গিয়েছি। বিমল আর আমি দুজনেই বসি গোখেলের পাশে। গোখেল খুশী হয়, তার কালো মুখ পথশ্রমে ক্লান্ত হলেও আনন্দে যেন ঝলমল করে ওঠে। গোখেল উৎসাহের সঙ্গে বলে, সিকিমের মাটিতে আমরা পা দিই নি এখনও। তবু অপূর্ব লাগছে নতুন দেশের কথা ভাবতে। কথাচ্ছলে গোখেল জানায়, তার দৈনন্দিন রোজগারের থেকে তিল তিল করে সঞ্চয় করে কেমন এক উদগ্র বাসনা নিয়ে এসেছে সুদূর বোম্বে থেকে। কর্তৃপক্ষ তাকে তার পাওনা ছুটি দিতে চায় নি। সংসার তাকে বাধা দিয়েছে, তাঁরা বলেছেন, কি হবে পর্বতারোহণ শিক্ষালাভ করে? চাকরিতে পদোন্নতি হবে কি? তাই যদি না হয় তবে কেন মিছামিছি পয়সা খরচ করে এত কৃচ্ছ্রসাধন? গোখেল বলতে পারে নি, হিমালয় তার ভাল লাগে। বোঝাতে পারে নি পাহাড় তার কেন ভাল লাগে। মধ্যবিত্তের অভাবের সংসার, সেখানে এই অদ্ভুত ব্যক্তিগত ভাল লাগার কৈফিয়ত দিতে কেমন যেন নিজেকে স্বার্থপর মনে হয়েছে। ভয়ে চুপ করে থাকতে হয়েছে তাকে। কিন্তু পাহাড়ের হাতছানি, দুচোখ ভরে দেখবার উদগ্র নেশা। গোখেলকে আসতেই হয়েছে সুদূর বোম্বে থেকে সিকিমের পথে। আমি আর বিমল মুগ্ধ হয়ে শুনি। গোখেলের কথা শুনতে শুনতে আমার বাড়ির চিত্রটি সহসা ওঠে ভেসে।

বিকালে চা জলখাবার খেয়ে বিমলের সঙ্গে সিঙলা বাজারে যাই বেড়াতে। সঙ্গে করে নিয়ে যাই গোখেলকে। সিঙলা বাজার পশ্চিমবাঙলা ও সিকিমের সীমান্তের শেষ বাজার। ছোট বড় অনেকগুলো দোকান, কয়েকটা হোটেলের মতো। দোকানে চাল, ডাল, তেল-নুন-মসলা সবই আছে সাজানো। চা আর বিস্কুটের দোকানের অভাব নেই।

দার্জিলিঙ পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করে, লিটল রঙ্গীত পেরুতেই শুরু হয়েছে সিঙলা বাজার। লিটল রঙ্গীতের উৎপত্তি-স্থান টঙলুর কাছে। নদীটির উৎস কোনো হিমবাহ নয় তাই জলও তেমন ঠাণ্ডা নয় অন্যান্য পাহাড়ী নদীর তুলনায়। সিঙলা বাজারের অপর প্রান্তে রম্যম নদী এসে মিলিত হয়েছে গ্রেট রঙ্গীতের সঙ্গে। রম্যম নদীর উৎপত্তি স্থান ফালুট ও সিংগালি-লা গিরিশিখরের কাছে। লিটল রঙ্গীতের তুলনায় এই নদী অনেকটা প্রশস্ত ও উচ্ছল, জল শীতল ও নীলাভ। ফালুট থেকে এই নদীটি গভীর গিরিখাত দিয়ে বয়ে এসে সিঙলার কাছেই মিলিত হয়েছে। রম্যমের গিরিখাত দর্শনীয়। সিঙলা থেকে মাত্র সাত-আট মাইল নদীর তটভূমি ধরে এগুতে হয়।

গ্রেট রঙ্গীতের উৎস সিকিম হিমালয়ের ওয়ালাথাঙ্ উপত্যকায়। টাশীডিঙ্ পাহাড়ের পাদদেশে র‍্যাথঙ্ নদী এসে মিলিত হয়েছে গ্রেট রঙ্গীতের সঙ্গে। সবার জলে পুষ্ট গ্রেট রঙ্গীত স্ফীতা ও উচ্ছ্বসিতা হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছে কালিমপঙে তিস্তার জলধারার মধ্যে।

সারা বিকালটা সিঙলা বাজারে ঘুরে বেড়াই। অবাক হয়ে দেখি এই পাণ্ডববর্জিত স্থানে সুদূর রাজস্থান ও গুজরাট থেকে ব্যবসায়ীরা এসে ফাঁদ পেতেছে নানা ব্যবসার। বাঙলার সীমান্তে বাঙালী ব্যবসায়ী কোথায়? দুচোখ মেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াই, স্থানীয় অধিবাসী অধিকাংশ নেপালী, কিছু সিকিমী।

গ্রেট রঙ্গীত ও রম্যম নদী পশ্চিমবাঙলার সীমানা নির্ধারণ করেছে। গ্রেট রঙ্গীতের ওপারে সিকিমের অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র নয়াবাজার। সিঙলা বাজার ও নয়াবাজারের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে নয়াবাজার আয়তনে ও বিপণিসম্ভারে নিঃসন্দেহে কৌলিন্যের দাবি করতে পারে। তবে দুটি স্থানের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে। ওপারে যাবার জন্য রম্যম নদীর ওপরকার ঝুলন্ত সেতু হয় পেরুতে। দুধারের জনসাধারণের যাতায়াত চলে সর্বক্ষণ। কোথাও নেই বাধানিষেধের গণ্ডী টানা। তবে উভয়দিকেই বাঙলা ও সিকিমের পুলিস রয়েছে মোতায়েন করা। এ ব্যবস্থা অনেক দিনের, তবু সুদূর অতীতে এই পথেই বহু পর্যটক সিকিম পেরিয়ে যেতেন তিব্বতের দিকে।

নয়াবাজারের উচ্চতা সিঙলার চাইতে খুব বেশী হলেও শ' খানেক ফুট মাত্র। তাই সিঙলার মতোই এখানে মধ্যাহ্নে সূর্যের প্রাখর্য অনুভব করা যায়। এখানকার দোকানপাট অনেক বড়। আধুনিক সভ্যতা পশ্চিমবাঙলার অলিগলি পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে সিকিমে এই পথেই। বিলাসের অনেক সামগ্রীই এখানে সহজলভ্য। জুতো, ছাতা থেকে শুরু করে অ্যালুমিনিয়ামের ও চীনামাটির বাসন-পত্র মেলে। মনোহারী দোকানে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সঙ্গে ভিড় জমিয়ে রয়েছে সুগন্ধি এসেন্স, পাউডার, সুবাসিত সাবান ও কেশতৈল। খাবারের দোকানসংলগ্ন মদের দোকানও লক্ষণীয়।

খরিদ্দারের অভাব নেই। সিকিমে মদ্যপান আদৌ নিন্দনীয় নয়। সিকিমে কমলালেবু থেকে তৈরি মদ সুলভ। মদের ওপরে আবগারী শুল্ক খুবই কম।

নয়াবাজার থেকে পীচঢালা রাস্তা দুদিকে গিয়েছে চলে। একটি গ্রেট রঙ্গীতের ধার ঘেঁষে বরাবর চলে গিয়েছে ঋষি, লেগসিপ হয়ে গেইজিং পর্যন্ত। অপরটি রঙ্গীত পেরিয়ে চলে গিয়েছে সিকিমের

রাজধানী গ্যাঙটক্ পর্যন্ত। গ্যাঙটক্ থেকে তিব্বত সীমানা নাথু-লা (১৪,৪০০ ফুট) পর্যন্ত পীচঢালা রাস্তায় ট্রাক বা জীপ গাড়ি চলাচল করে। নয়াবাজার থেকে বাস সার্ভিস না থাকলেও ট্রাক, স্টেশন ওয়াগন বা বা জীপ গাড়ি মিলবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে সিঙলায়। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। নদীর অস্ফুট কলধ্বনি ভেসে আসে। রঙীন তাঁবুগুলোর ভেতরে মোমবাতি জ্বলে। নুড়ি বিছানো বেলাভূমির ওপরে ছড়িয়ে থাকা কুলির দল নিজেদের খাবার তৈরি করে কাঠের আগুন জ্বেলে। ওদের কাছে গিয়ে বসি একটা বড় পাথরের ওপরে। ওরা আমাকে চা ভর্তি মগ এগিয়ে দিয়ে কলরোল করে অভ্যর্থনা জানায়। কুলিদের অনেকেই এসেছে নেপালের নানা গ্রাম থেকে রুজি-রোজগারের আশায়। কারও ঘর বা পোখারার কাছে, কারও বা কাঠমাণ্ডুর কাছা-কাছি। এরা কেউ কেউ বা শোলা খুম্বুর অধিবাসী। দলের মধ্যে জনকয়েক তিব্বতী রিফিউজীও দেখি। তিব্বতী রিফিউজীরা চার-পাঁচ বৎসর আগে এসেছিল তিব্বত থেকে পালিয়ে নানা দুর্গম গিরি-পথ দিয়ে। এরা দালাই লামার গোঁড়া ভক্ত, তাই দালাই লামা দেশ ছাড়বার পরই এরাও শুরু করেছে দেশ ছাড়তে। তিব্বতী ও নেপালীদের মধ্যে দৈহিক গঠন ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে প্রচুর পার্থক্য। তবু দেখি এদের সঙ্গে এসে মিশে গিয়েছে সবদিক দিয়েই। কথায় কথায় এরা ছোট ছোট চোখ মেলে তাকায় আর কারণে অকারণে উচ্চ শব্দে হাসে। কুলিদের কাছেই ত্রিপল টাঙিয়ে রান্নার স্থান করা হয়েছে। সেখানে হ্যাজাক্ জ্বলে। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে বেলাভূমির কিয়দংশ। বিমলের সঙ্গে চার-দিক ঘুরে ঘুরে দেখি। তারপর একসময় পছন্দমতো একটি জায়গা দেখে বসে নানা গল্পে মেতে যাই।

পর্বতারোহণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই সামরিক বাহিনীর অফিসার। তবে জনকয়েক বাঙালীও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন বেশ বয়স্ক। হঠাৎ তাঁদের এই অদ্ভুত ইচ্ছার কারণ জানতে ইচ্ছা করে। তাঁরা সংসারী মানুষ, পর্বতারোহণ শিক্ষার উৎসাহ থাকবার কথা নয়। তবু তাঁদের দেখি উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু উৎসাহ তাঁদের শিক্ষালাভের জন্য নয়, নতুন কিছু দেখবার। শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি! আর কিছু নয়।

আমি ভাবি আমিও কি এঁদের মতোই। আমার আশা আকাঙ্ক্ষার কি নতুনত্ব আছে কিছু?

পাঁচ

ঋষি!

নাম শুনে চমকে উঠি। এমন চমৎকার নাম! কাছাকাছি কোথাও বুঝি আশ্রম আছে ঋষিদের? অথবা কোনো এক অতীতে ছিল, আজ আর নেই!

সহযাত্রী বিমলকে ভাবি সর্বজ্ঞ। তাকেই জিজ্ঞাসা করি। বিমল বিব্রত হয়, হেসে জানায় ঋষি নামের তাৎপর্য তার জানা নেই। তবে ঋষিদের আশ্রম নেই কোথাও, সুদূর অতীতেও ছিল কিনা জানা নেই সে তথ্য। আর কাকে জিজ্ঞেস করি, এখবর কেই বা জানবে? চীর আর পাইন গাছে ছাওয়া পাহাড়ের ঢালু গা উঠে গেছে রঙ্গীত নদীর দুপাশ থেকে। কে জানে, এই বনচ্ছায়ার নিভৃতে রচিত হয়েছিল ঋষির আশ্রম। সেখানে মৃগশিশুরা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে ছুটোছুটি করে খেলত; ময়ুর-ময়ূরী দলবেঁধে ঘুরত চারপাশে। কে বলবে সে কথা…। ভাবতে ভাল লাগে, ভাবতে ভাবতে অনেক পথ পেরিয়ে যাই।

নয়াবাজার থেকে ঋষির দূরত্ব দশ মাইলের ওপরে। গ্রেট রঙ্গীতের উপকূল ধরে চওড়া পীচঢালা রাস্তা চলেছে এঁকেবেঁকে। উঁচুনীচু নেই বিশেষ কোনো স্থানে। বিলকুল সিধা। পাহাড়ী মানুষদের ভাষায় ময়দান। পথচলার শুরুতেই অভ্যাসবশে জিজ্ঞাসা করি পথের কথা। শুনি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ সমতলের মানুষ আমরা, পাহাড়ীদের কাছে পাহাড়ের রাস্তার বিবরণ না জিজ্ঞাসা করাই ভাল। ওদের ভাষায় ময়দান আমি দেখেছি। থোড়া দূর শুনে পথ চলছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠা বা নামা ওদের ভাষায় থোড়া চড়াই বা থোড়া উৎরাই। পথ চলাই যেখানে একমাত্র চিন্তা, সেখানে নির্বিচারে এগিয়ে যাওয়াই বোধহয় ভাল। পথের কথা নাইবা ভাবলাম পথে বেরিয়ে। পথ সহজসাধ্য শুনে ক্ষণিকের আশ্বাস নাইবা মনকে সান্ত্বনা দিল ?

নয়াবাজার থেকে রওনা হয়েছিলাম অন্ধকার থাকতে থাকতে। জলখাবার আর মগভর্তি গরম চা-পান করে আর দ্বিপ্রহরের খাবার বেঁধে নিয়ে চলি এগিয়ে। পিঠে বোঝা, পীচঢালা সমতল রাস্তা; পথ চলি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। রাস্তার একধারে খাড়া পাঁচিল, অপর পাশে জমি, মাঝে মাঝে বাড়ি। আতাফল আর বাতাবি লেবু গাছে ঘেরা বাড়ি। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া সবজির বাগান। নিচেই রঙ্গীত নদীর অশান্ত জলপ্রবাহ। চলতে চলতে দুচোখ ভরে দেখি। এসব দৃশ্য নতুন নয়। হিমালয়ের রূপ সর্বত্রই যেন মোটামুটি একরূপ। পথ চলতে চলতে রোদের তেজ বাড়ে। পীচের রাস্তা তেতে ওঠে, পীচ গলে চক্‌চক্‌ করতে থাকে। রাস্তার বুকে অনেকগুলো পদচিহ্ন পড়ে। মাঝে মাঝে রাস্তায় ছায়া পেলেই বসি ঘাসের ওপরে। একবার বসলেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমের আমেজ আসে। কিন্তু পথ চলার সংস্কার তাড়া দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ট্রাক চলে বিকট শব্দ করে। পায়েহাঁটা পথযাত্রীদের যেন ডাকে হাতছানি দিয়ে। জীপ গাড়িও চলে বিকট শব্দ করে

প্রচণ্ড বেগে লেগসিপের দিকে। পথ চলতে যান্ত্রিক সভ্যতার অভ্যস্ত পরিবেশে লালিত মন মাঝে মাঝে আকৃষ্ট হয়। বোম্বের গোখেল চলছিল আমাদের পাশে পাশে। বেশ কিছু সময় হাঁটবার পর গোখেলকে দেখি অসম্ভব ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে। কেমন যেন এক অস্বাচ্ছন্দ্য তার হাসিখুশী মুখের ওপরে বিষাদের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। ট্রম্বের আণবিক কমিশনের কর্মী গোখেল অত্যন্ত সহজ ও সরল মানুষ। পাহাড়কে সে ভালবাসে, তাইতো এসেছে অনেক কৃচ্ছ্র সাধন করে। চাকরি করতে করতে দেখেছে পাহাড়ের স্বপ্ন। অর্থ সঞ্চয় করেছে, সেই ফাঁকে নিজেকে তৈরী করেছে পাহাড়ে চলবার উপযোগী করে। দীর্ঘ পথ হেঁটে বেড়িয়েছে বোম্বের পাহাড়ী পথ। পাহাড়ী রাস্তায় হাইকিং করতে গিয়ে একবার সে হোঁচট খেয়ে পড়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছিল। দিনকতক ভুগতে হয়েছিল তাকে। এই সামান্য ঘটনাকে গোখেল আমল দেয় নি বিন্দুমাত্র। এই সামান্য ঘটনা হয়তো বা সে ভুলেই গিয়েছিল। তার মন সর্বক্ষণ জুড়ে থাকত হিমালয়। কিন্তু সে কখনই বুঝতে পারে নি সেই সামান্য ঘটনাই অসামান্য হয়ে দেখা দেবে।

দার্জিলিঙ থেকে সিঙলায় অবতরণ কালে বিপুল উৎসাহে গোখেল সব ভুলে গিয়েছিল। সিঙলা থেকে সকালবেলায় খাবার খেয়ে সবার সঙ্গে পরম উৎসাহের সঙ্গে রওনা হবার সময়ও বুঝতে পারে নি। মাইল তিন-চার চলবার পর তার অগ্রগতি মন্থর হতে শুরু করে। বিশ্রাম করতে বসে সকলের আগে, ওঠে সকলের শেষে। মুখে চোখে কেমন এক অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব। তারপর একসময় অত্যন্ত সন্তর্পণে আমাকে জানায় যে তার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে। সবার অলক্ষ্যে ওর হাঁটু দেখি, সামান্য ফুলে গিয়েছে। গোখেল জানায় সিঙলায় হাঁটু ভারী বোধ হয়েছিল। কিন্তু ভয়ে জানায় নি কাউকেই। কারণ ডাক্তার জানলে তাকে দার্জিলিঙ ফেরত পাঠাতে পারে। তাই নীরবে বেশ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতেই এসেছে হেঁটে। যতক্ষণ পেরেছে,

সহ্য করেছে নীরবে। এতটা পথ সে এসেছে সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

আরও মাইল খানেক এগুবার পর গোখেলের পায়ের যন্ত্রণা বেড়ে যায়। বিমলকে জানাতেই হয়। রাস্তার ধারে ওকে ভাল করে বিমল পরীক্ষা করে দেখে। বিমলের মুখটা কেমন যেন অপ্রসন্ন হয়। মুখে কিছু না বললেও আশার কথা কিছুই বলে না। তারপর আকস্মিক একটা জীপ গাড়ি পেতেই ওকে একরকম জোর করেই জীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক হয়, ঋষিতে ওকে নামিয়ে দেবে জীপের মালিক। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে আমাদের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের কাছে। তাঁবুতে পুরো বিশ্রাম নেবে, ওষুধ মালিশ করে, গরম সেক দেবে রাতে।

ঋষি এসে পৌঁছে যাই বেলা বারোটায়। প্রখর সূর্যকিরণ, পিঠের বোঝা, দীর্ঘ দশ মাইল পথকে বুঝি আরও দীর্ঘ করে তুলেছিল। শেষের দিকটা কেমন যেন ধৈর্য হারাতে বসেছিলাম। গাছের ছায়া আর ঝরনাধারা দেখলেই বসেছি, কি আছে এত তাড়াহুড়ো করার। তার চাইতে ঘুমিয়ে নিই খানিকটা। পথ চলতে যখন শুরু করেছি, তখন থামাটা তো ক্ষণিকের। চলা যেন অনন্তকালের পথযাত্রার ভগ্নাংশ।

ঋষিতে পৌঁছেই তাঁবুর ব্যবস্থা করে গাছতলায় বসি দলবেঁধে। পীচঢালা রাস্তার একটু নিচেই বেশ সুন্দর আম কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা একফালি জমি। তারও নিচে গ্রেট রঙ্গীতের উচ্ছল জলপ্রবাহ। কিছু সময় বিশ্রামের পর তোয়ালে সাবান আর খাবারের প্যাকেট নিয়ে গিয়ে বসি নদী তটে বিক্ষিপ্ত পাথরের ওপরে। এই স্থানে রঙ্গীতের সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে গাড়োয়াল হিমালয় বদ্রীনাথের কাছে গোবিন্দঘাটের অলকানন্দার তটভূমির তুলনা করা চলে। তবে গ্রেট রঙ্গীতের চাইতেও অলকানন্দা বেশী পরিমাণ জলভারে স্ফীত। রঙ্গীতের নীলাভ জল তুষারশীতল। কিন্তু ঋষির উচ্চতা মাত্র ১,৬০০ ফুট,

তাই তুষারশীতল জলে স্নান করতে ভাল লাগে। অবশ্য জলস্রোতের উদ্দামতার জন্য নদীতে নামা অসম্ভব। তাই পাথরের ওপরে বসে বসেই স্নান সারি মগ দিয়ে। স্নানের পরে এলো-মেলো বিক্ষিপ্ত পাথরের সিংহাসনে বসে বসে মধ্যাহ্নের আহার সেরে নিই পরম তৃপ্তিভরে। আহারের পর ঝিমুনি আসতে চায়। স্নিগ্ধ শীতল বাতাস আর রঙ্গীতের একটানা কলধ্বনি কানের কাছে ঘুম পাড়ানি গান গায়।

গোখেল তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল এসেই। আমি আর বিমল যাই তার তাঁবুর ভেতরে। আমাদের দলে আরও একজন ডাক্তার ছিল, তার নাম ক্যাপ্টেন মদন সিং। গোখেলকে সবাই মিলে দেখি। ওর হাঁটু ফুলে চক্‌চক্ করছিল। দেখে মনে হচ্ছিল জল জমেছে ওখানে। বিমল ভাল করে দেখে। ওর শরীর বেশ গরম। কপালে হাত দিতেই গোখেল কিন্তু প্রাণপণে বাধা দেয়। মুখে বলে, না না, কিছুই হয় নি। হাঁটুতে সামান্য ব্যথা, এ ছাড়া আর কোনো কষ্ট নেই। রাতে গরম সেক দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বিমল ও ক্যাপ্টেন মদন সিং ঘাবড়ে যায় দেখে। আর হাঁটা উচিত নয় গোখেলের। এমনকি দ্রুত হাঁসপাতালে ভর্তি হওয়া উচিত। বলা যায় না কিসে কি হয়।

গোখেলের মুখ দেখি। আমার মনের মধ্যে কেমন যেন এক বেদনা অনুভব করি। ডাক্তারদের মনোভাব গোখেল বুঝতে পেরেছিল। দার্জিলিঙে হোস্টেলে গোখেলকে দেখেছি প্রাণবন্ত। মিলিটারী অফিসাররা পর্বতারোহণ শিক্ষালাভ করতে আসে চাকরির তাগিদে। তাদের এই শিক্ষা চাকরিরই অঙ্গ। এজন্য তাদের অর্থ ব্যয় হয় না। ছুটির দুশ্চিন্তা নেই, ওপরওয়ালার মর্জির ওপরে নির্ভর করতে হয় না। তারা তাই আসে বাধ্য হয়ে। পাহাড়-পর্বত আর পথের সৌন্দর্য তাদের তেমন করে মুগ্ধ করতে পারে না। পথ

চলার আনন্দ তাদের মনকে আবিষ্ট করতে পারে না হয়তো। কিন্তু গোখেল রক্ত-জল-করা অর্থের বিনিময়ে এসেছে, সুদূর বোম্বে থেকে। পাহাড়ের ওপর তার ভালবাসা, পথ চলায় তার অনাবিল আনন্দ। সংসারে এইটাই বোধহয় বিচিত্র। মানুষ যা চায়, সব সময় তা পায় না। এই পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে এক অদৃশ্য হাত কলকাঠি নাড়ে। তাকে বলি ভাগ্য।

ডাক্তাররা গোখেলের তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাবার পরও আমার ভাল লাগে না গোখেলকে ছেড়ে যেতে। গোখেলের এত আশা, এত স্বপ্ন, ওকে কি শেষটায় ফিরে যেতে হবে? আমার মনের ছোঁয়া পায় যেন গোখেল। আমার হাত ধরে আবেগে ছলছল চোখে অনুরোধ করে, তার ব্যাপারটা ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলতে। গোখলের কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে। পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে ম্লান হেসে, জান, এ ব্যথা আজ রাতে ঠিক হয়ে যাবে।

আমি ভেবেছিলাম, গোখেলের আশা যদি পূর্ণ হত! কিন্তু সিকিম হিমালয় সহসা বুঝি নির্দয় হয়ে ওঠে। গোখেলের আশা পূরণ হয় না। রাতে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকে সে অনুভব করে, তার পায়ের ব্যথা রাতের অন্ধকার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে শুরু করেছে। আমরা ওর পায়ে গরম সেক্ দিই, ওষুধ দিই মালিশ করে করে। বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে সকালে শুষ্ক মুখে উদ্ভ্রান্তের মতো গোখেল তাকিয়ে দেখে সবাইকে। ডাক্তার ওর পায়ের অবস্থা দেখে দার্জিলিঙ ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দেয়। সকালে বেলায় জলখাবার খাইয়ে একটি জীপ গাড়ি যোগাড় করে গোখেলকে তুলে দিই গাড়িতে। সবাই জীপ গাড়ির কাছে গিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাই। গোখেল রুমাল দিয়ে দুচোখ ঢেকে চীৎকার করে কাঁদে বাচ্চা ছেলের মতো।

ঋষি আমার ভাল লেগেছিল। তাই বুঝি ঋষি ছেড়ে আসতে

বুকের ভেতরটা কেমন যেন হালকা হয়ে গিয়েছিল। দার্জিলিঙ থেকে মোট দূরত্ব প্রায় বাইশ মাইল। যাতায়াতের কোনো অসুবিধাই নেই।

ঋষি ছোট জনপদ। দুধারে মাত্র গুটিকয়েক দোকান, দুটো ছোট হোটেল আর চায়ের দোকান পাশাপাশি। চায়ের দোকানের সঙ্গে লাগোয়া সিকিমে তৈরি দিশী মদ রক্সির দোকান। দোকানগুলোর পাশ দিয়ে একটি ছোট জলধারা এসে পড়েছে গ্রেট রঙ্গীতের বুকে। সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে দেখি ঋষির আশেপাশে। রাস্তার নিচে ছোট ছোট বাড়ি। ঋষির দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখি।

একটি চায়ের দোকান দেখে এগিয়ে যাই। দোকানের মালিক নিবিষ্ট মনে বসে জিলিপী ভাজছিল। আমার পায়ের শব্দে, হঠাৎ আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। তারপর কপালের ঘাম এক হাত দিয়ে মুছে, পরিষ্কার পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় আহ্বান করে, আইসেন বাবু। জিলাপী খাইবেন নাকি ?

অবাক হয়ে এগিয়ে যাই। কি আশ্চর্য! সুদূর সিকিমেও বাঙালী একজন বসেছে চা-বিস্কুটের দোকান দিয়ে। ছোট দোকান, অনেকটা অস্থায়ী বলেই মনে হয়। ওর কাছেই বসে যাই, দোকানী জিলিপী ভাজে আর পথচারীরা কিনে খায় প্রচুর। সকালবেলা থেকে ভাজতে শুরু করে, বেলা বারোটা পর্যন্তও ভেজে সামলাতে পারে না। সামান্য পুঁজি, তাই শেষ হয়ে যায় চট্ করে। তার দোকানে বসে দুটো কথা বলি। নিজের দেশের কথা বলে দোকানীও।

যে দেশ সে ছেড়ে এসেছে কয়েক বছর আগে, সেই দেশের কথা বলে। দেশ তার পূর্ববঙ্গে। কোন্ জেলা, গ্রামের নাম কি ? দোকানীর নামই বা কি কিছুই জানবার কথা মনে হয় না। পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা, এই পরিচয়ই যেন আমার কাছে চিরপরিচিতের মতো মনে হয়। ছোট্ট দোকানের আয়ে তার দিন কাটে। অনেক জায়গা ঘুরে, অনেক

আশা-নিরাশায় দোল খেতে খেতে সে এসে পড়েছে হিমালয়ের আঙ্গিনায়।

দোকানী বলে বিড়ি টানতে টানতে—এই ছ্যাশেই থাকমু।

দোকানীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি আমি। দোকানী বলেই চলে—এই ছ্যাশেই পাকা ঘর বাধমু। ছুটাছুটি কইর‍্যা তো ছ্যাখলাম। অইলডা কি?

বুঝি, অনেক জায়গায় ঘা খেয়েছে এই মানুষটা। অনেক জায়গাতেই চেয়েছে ঘর বাধতে। দোকানী হাসে—জানেন বাবু, কণ্ঠস্বরটা নামিয়ে বলে, এই ছ্যাশের মাইয়া বিয়া কইর‍্যা নিমু। এই ছ্যাশের মাইয়াগুলা মইষের মতো খাইটবার পারে। অগো গায়ে জোর আছে। আমি মুরুখ্যু মানুষ, অগো বুইঝাবার পারি।

আমি তাকিয়ে থাকি দোকানীর দিকে। মুখে অনেক দুঃখ-কষ্টের আঁচড় পড়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরিধানে ময়লা পায়জামা, চোখ দুটোয় কিন্তু অনেক আশার দীপ্তি। অবাক হয়ে ভাবি, সব হারিয়ে এই ছিন্নমূল মানুষ আবার সব কিছু পেতে চায়। চাওয়া বোধহয় অপরাধের নয়, পাওয়ার অধিকার অর্জন করার যে কঠোর সংগ্রাম, সে সংগ্রামে এই সর্বহারা মানুষটি কোন্ হাতিয়ার নিয়ে নামবে? ভাবতে ভাবতে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এক অজ্ঞাত বেদনায় বুকটা বুঝি টনটন করে।

দেকানীর আপনার বলে কেউ নেই। তাই বাঙলাদেশে ফিরে যাবার কথা জিজ্ঞেস করতেই ম্লান হেসে বলে, কি অইব বাবু ছ্যাশে ফিরা, যে ছ্যাশ আমারে দুই বেলা দুই মুঠা খাইবার ছ্যায় নাই, মাথা গুইজবার ঠাই ছ্যায় নাই, দূর দূর কইরা তাড়াইয়া দিছে। সে ছ্যাশের কথা ভাইব্যা কি অইব? অ্যাই আমার ছ্যাশ, অ্যাই ছ্যাশকেই ভালবাসমু।

বুঝি দারুণ অভিমানের কথা:

জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেহ আর মন নিয়ে দিশেহারা হয়ে

পালিয়ে এসেছে। আবার নতুন করে আশার স্বপ্ন দেখতে এসেছে। স্বপ্ন তার মনের ক্ষতের উপরকার প্রলেপ।

বাঙালীর চায়ের দোকানের উল্টোদিকে বেশ মাঝারি গোছের একটা হোটেলের মতো। সিকিমী পথযাত্রীরা সেখানে গিয়ে বসে, চা পাকৌড়ি কিনে খায়। হোটেলের পেছনে একটা ছোট ঘর। খাওয়ার পর সেই জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় হাত বাড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একজনকে দেখি রক্সি ভর্তি গেলাস এগিয়ে দিতে। দু-তিন গেলাস চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করে মুখ মুছে পথযাত্রীরা আবার চলে এগিয়ে। নয়াবাজার থেকে যারা নানা দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে পথ চলেছে, ঋষিতে এসে সব ভুলে সম্রাট্ হয়ে বাকী পথটা যায় পেরিয়ে। সারাদিন বসে বসে দেখি আর ভাবি, অভাব-অভিযোগের বেদনা ভোলবার কি এক অদ্ভুত প্রচেষ্টা।

হোটেলের মালিক কে জানি না। একটি অল্প বয়সী তরুণী সব সময়ই হোটেলে বসে সব কিছুর তদারক করে। খাবার দেওয়া, পয়সা হিসেব করে নেওয়া থেকে শুরু করে পথচারীদের ডেকে আদর আপ্যায়ন করে বসানো। তরুণীটি মোটামুটি সুন্দরী, তার ওপরে যৌবনের মাদকতা তার চোখেমুখে দেহের সর্বাঙ্গে। চোখে মুখে ভুবনমোহিনী হাসি লেগেই আছে। হোটেলের চেয়ারবেঞ্চগুলো তাই খালি থাকে না কখনও। মিষ্টি হাসি, আর দুটো কথার জন্য একবারের জায়গায় বিনা প্রয়োজনে বারকয়েক চা নিয়ে বসে পথচারীর দল। তরুণীটি হাসি মুখে সবার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে। আমাদের সঙ্গে চৌহান বলে একজন তরুণ এসেছিল বোম্বে থেকে। বেশ অর্থবান ঘরের ছেলে, শখ হয়েছে পর্বতারোহণ শিখবে। রাজপুত্রের মতো চেহারা, টকটকে গায়ের রং, টিকলো নাক, মুখে গোঁফের রেখা উঠেছে জেগে। খুবই কম বয়স। ক্যাপ্টেন মদন সিং চৌহানকে নিয়ে একফাঁকে ঢোকে হোটেলে! রসিকতা করে ডাকে, এ কাঞ্চি!

তরুণীটি হাসিমুখে এগিয়ে আসে দু গেলাস চা নিয়ে।

বিস্কুট লাও, মদন সিং বলে চোখ টিপে হেসে। কাঞ্চীও হাসে। ক্যাপ্টেন মদন সিং বলে, কাঞ্চি! তেরে লিয়ে এক নয়া চীজ লায়া।

তরুণীটির সারা মুখ লজ্জা বিনম্র হাসিতে ভরে যায়। ফর্সা গাল দুটোয় লাল রঙের ছোপ লাগে।

ক্যাপ্টেন মদন সিং চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, দেখ্, এ চীজ কো পকড়্ কে রখ দো ইধর!

কাঞ্চী মদন সিংএর কৌতুকভরা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসে।

চৌহানের ফর্সা মুখও রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায় আর ক্যাপ্টেন মদন সিং-এর রসিকতায়। মেয়েটির সঙ্গে চোখোচোখি হতেই কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে থতমত খায় চৌহান। মৃদু প্রতিবাদ করে বলে, এ কেয়া হোতা হ্যায় দাজু?

মেয়েটি কিন্তু হাসে চোখ টিপে টিপে। চৌহানের অসহায় ও বিব্রত মুখটা সে যেন উপভোগ করে। মৃদু হেসে বলে, তব্ তো হোটেল বঢ়িয়া ছে বঢ়িয়া চলেগা

ক্যায়্সে?

ম্যায় লড়কা কো চা পিলাউঙ্গী ঔর খানা খিলাউঙ্গী। ঔর উনকে লিয়ে লেড়কিয়া আয়েগী হোটেলমে।

কালো কুচকুচে দাড়ির আড়াল থেকে ক্যাপ্টেন মদন সিংএর সাদা ঝক্ঝকে দাঁত দুপাটি উঁকি দেয়। হা হা করে প্রাণ খুলে হাসতে থাকে মদন সিং। মেয়েটিও অপ্রতিভ না হয়ে খিলখিল করে হাসির জলতরঙ্গ বাজিয়ে চলে মদন সিংএর সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

উৎকর্ণ হয়ে শুনি আর তাকিয়ে দেখি দৃশ্যটা। উপভোগও করি। তরুণীটির নাম জানি না, জানার সুযোগও হয় নি। অবশ্য জানবার চেষ্টা করলে জানা যেত নিশ্চয়ই। সিকিমের পথে এই সদাহাস্যময়ী তরুণীটিকে দেখে আমার মনে হয়েছে, বাঙালী

দোকানীর কথা সত্যি। সত্যি এরা বড় সরল, সহজ ও সুন্দর। ঋষিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে এই তরুণীটি। হোটেলের ভিড় এর জন্যই, কত জন আসে যায় কত ফিকির নিয়ে। কত নরনারী, দেশী ও বিদেশী। পথ চলার কষ্ট, কত চিন্তায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বেড়ানো পথচারীর মনে তরুণীটি বুঝি স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেয়।

বিকেল হতেই ঋষির অন্য রূপ। অন্ধকার চারপাশ থেকে বুঝি ছুটে এসে যেন প্রবল বন্যার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার পর সবই একাকার হয়ে যায়। কিন্তু এই নিরবছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট আলো জ্বালিয়ে হোটেলটি অপেক্ষা করে পথচারীর জন্য। তরুণীটিও দেখি ঠিক দিনের আলোর মতোই উজ্জ্বল ও উচ্ছল। হোটেলে যারা আসে, তাদের সামনে ভুট্টা ভাজা, নয়তো মাছ ভাজা, আর রক্সির বোতল। গেলাস আনবার ধৈর্য নেই। তখনও দেখি নেশাগ্রস্ত মাতালদের সামনে লাবণ্যবতী তরণী সমানে হাসি কলরোলে মুখরিত করে তোলে অন্ধকারাচ্ছন্ন হোটেল। টেবিলের এককোণে বসে এক গেলাস গরম চা নিয়ে বসে থাকি, আর দেখি সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে, নির্ভীক, সদাহাস্যময়ী তরুণীটিকে।

হঠাৎ কেমন যেন হোঁচট খাই ডাক শুনে।

বাবু?

আরে, কি আশ্চর্য। সেই দোকানীও বসে গেছে আমার পাশে একধারে রুটি তরকারী আর রক্সির বোতল নিয়ে। অস্পষ্ট আলোয় ঠিক দেখতে পাই নি। দোকানী তরকারী দিয়ে রুটি খেতে খেতে মাঝে মাঝে রক্সির মধ্যে ভিজিয়ে নেয় শক্ত রুটি। জলের পরিবর্তে চকঢক করে রক্সি খায়। অন্ধকারে মদের প্রভাবে তার চোখ দুটো যেন জ্বলে ওঠে।

কি ছাহেন বাবু? মদ খাওয়া? ছাহেন, ঘেন্না কইরেন না বাবু। মদ আমি অ্যামনি খাই না। দিনে জিলাপী বেইচ্যা যা কামাই, রাইতে তাই দিয়া খাই।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। দোকানীবলে, কি করমু কন্, পয়সা দিয়া অইবডা কি? কারে দিমু, কোন হালারে? তবে হ্যা জব্বর কড়া মাল, আমাগো ছ্যাশের ধাম্যেশ্বরীর থিক্যাও! এই এক বোতলের ঠেলায় স্বর্গ মর্ত্য ত্রিভুবন, সারা ছুনিয়ার মালিক অইবার পারি। এডা কি কম সুখের? দোকানী খ্যাক খ্যাক করে হাসে। হাসতে হাসতে কাশে, তার পর কেমন এক আর্তনাদের মতো শব্দ করে। আমার মনে হয় ও যেন কাঁদে গুমরে গুমরে।

ছয়

সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ঋষি ত্যাগ করেছিলাম। আকাশ নীল, রঙ্গীত উচ্ছল, বেশ একটা ঠাণ্ডা আমেজ। পীচ ঢালা রাস্তা রাতের শিশিরসিক্ত। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করি আকাশে ছু এক টুকরো মেঘের আনাগোনা। ধীরে ধীরে সূর্যের প্রখরতা হ্রাস পেতে থাকে। দেখি, হঠাৎ কোন মায়াবলে সমস্ত নীল আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে। গাঢ় সে মেঘ; মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগে।

ঋষি থেকে টাশীডিঙ্ প্রায় বারো মাইল। সমস্ত পথটাই মোটা-মুটি ভাল। বিশেষ করে লেগসিপ পর্যন্ত রাস্তা পীচের। লেগসিপ থেকে একটি রাস্তা গিয়েছে গেইজিঙ হয়ে পেমিওঙচি পর্যন্ত। গেইজিঙ এই অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র। পেমিওঙচিতে সিকিমের সব চাইতে বড় ও সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ অবস্থিত। পেমিওঙচি পূর্বে সিকিমের রাজধানী ছিল।

ঋষি থেকে লেগসিপের দূরত্ব ছয় মাইলের মতো। কোথায়ও নেই চড়াই বা উৎরাই। রঙ্গীত নদীর ধার ঘেঁষে আর পাহাড়ের কোল

ঘেঁষে এগিয়ে যাওয়া প্রশস্ত পথ। সে পথে ট্রাক চলে, জীপ চলে। সেই পথ দিয়ে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাই। লেগসিপ পৌঁছবার মাইল চারেক আগেই রঙ্গীত নদীর অপর পাড়ে নদীর তটভূমি ঘেঁষে দেখি ছোট মন্দিরের মতো। শুনি স্থানীয় লোকের কাছে, মন্দিরের কাছেই একটি গুহা। কাছেই নদীর তটভূমিতে রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণ ও গুহা সিকিমীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র তীর্থভূমি। প্রস্র:ণটি প্রায়ই দেখা যায় না। কারণ রঙ্গীতের জল বৃদ্ধি হলেই অনেক সময় প্রশ্রবনটি নদীগর্ভে চলে যায়। মন্দিরটি বেশ কিছুটা উঁচুতে। ফলে বর্ষার জল গুহা বা মন্দিরকে প্লাবিত করতে পারে না। সমস্ত সিকিমে এই ধরনের পবিত্র গুহা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে আরও তিনটি। কথিত আছে, এই গুহাগুলিতে গুরু রিম্পোচে, লাহ্বছেন ছেম্বু কোনো এক সময় বাস করেছিলেন কিছু কালের জন্য। এই গুহাগুলি তাই সিকিমীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান। ঋষি ও লেগসিপের মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণ যুক্ত এই গুহাটির নাম খাদো সাঙ্‌ফু। খাদো সাঙ্‌ফু অর্থ পরীদের বাসস্থান। এই গুহায় পাথরের ওপরে অনেকগুলো পদচিহ্ন রয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ঐ পদচিহ্নগুলি পরীদের। কথিত আছে গুরু রিম্পোচের অবস্থানের পর এই গুহাটিকে রক্ষা করবার জন্য পরীরা অদৃশ্যভাবে পাহারা দেয়। লেগসিপ পৌঁছতে না পৌঁছতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমে আসে। একটি দোকানে বসে বসে শুনি, খাদো সাঙ্‌ফুর কথা। প্রখ্যাত বৌদ্ধ লামা লাহ্বছেন ছেম্বু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছিলেন এই গুহায়। তিনি দেখতে পান গুহাটি সযত্নে রক্ষা করে চলেছে পরীরা। লাহ্বছেন ছেম্বু জানতেন লামাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, গুরু রিম্পোচে এই গুহায় এসে বাস করেছিলেন।

খাদো সাঙ্‌ফু দর্শন করতে হলে নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে নয়া বাজার থেকেই। তারপর পায়ে হেঁটে যেতে হবে দশ মাইলের মতো।

বর্ষণ আর থামতে চায় না। প্রচণ্ড বর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন ঝড় বইতে থাকে শোঁশোঁ করে। জলের ঝাপটা আর ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে ঘরের ভেতরে আশ্রয় নিয়েও ভিজে যাই। বৃষ্টি থামবার নামগন্ধ নেই, বাধ্য হয়ে এর মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হয় সবাইকে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ফার্লং খানেক এগিয়ে যাই। তারপর রঙ্গীতের ওপরকার সেতু পেরিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে চলি রঙ্গীতের ওপার দিয়ে। মাটি ও কাদায় ভরা রাস্তা, ভিজে জুতো আটকে যায় কাদার মধ্যে। পিছল পথের জন্য অগ্রগতি মন্থর হতে থাকে। কুলিদেরও কলরব শুনি বৃষ্টি ও ঝড়ের শব্দের মধ্যে। কুলির দলের মধ্যে অনেকগুলো শেরপানীও রয়েছে। তাদের ভেতরে দু-চারজন ছাড়া সবাই তরুণী ও অবিবাহিতা। সুন্দর ফর্সা মুখ, গালে লাল রঙের ছোপ, দীর্ঘ বেণী। অর্থাভাবে আর শিক্ষার অভাবে তাদের গৃহিণী হবার সৌভাগ্য হয় নি। তারা পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলে। তাদের পিঠে প্রচুর মালপত্র। বৃষ্টিতে ভেজা মুখ, ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। তবু তারা হাসে কলরব করে যখন দেখে কোনো তরুণ শিক্ষার্থী এই জল-কাদায় পিচ্ছিল রাস্তায় চলতে বোঝা নিয়ে পা হড়কে পড়ে যাবার উপক্রম হয়। রসিকতা করে হাত বাড়িয়ে দেয়, উঠতে সাহায্য করবার জন্য। ওদের অভাব-অভিযোগের দুঃখ, মনকে ভারাক্রান্ত করতে পারে না কিছুতেই।

পথ চলতে চলতে থামতে হয় সবাইকেই। সামনেই পথ নাকি খুবই বিপজ্জনক। বিপদ কথাটা শুনে ভাবি কিসের বিপদ? পথের? কেন, এই তো শুনেছিলাম সহজ ও সরল পথ। বিপদের কথাটা শুনে সবার মনেই বেশ একটা কৌতূহল জাগে। বিপদের গুরুত্ব কতটুকু দেখবার আগ্রহ হয়। শেরপানীরা জানায়—সামনে গিলা পাহাড়, ধস নামছে সেখানে।

কোথায় ধস! ধস নামতে দেখি নি কখনও। ধস নামার পরে দেখেছি। তাই পরম আগ্রহ ভরে তাকিয়ে দেখি। মুহূর্তের

মধ্যে আমার দুচোখের দৃষ্টি যেন আটকে যায়। এমন অদ্ভুত দৃশ্য বোধহয় দেখার সৌভাগ্য হবে না। বিপদ নিশ্চয়ই, মৃত্যু হতে পারে এই বিপদের শিকার হলে। তবে বিপদের বীভৎসতা নেই। বরং অপরূপ সাজে সজ্জিত মৃত্যু যেন অপেক্ষমান। ভাবি, মৃত্যু যদি আসতে চায় এমন বিশাল রূপ নিয়েই আসুক। সামনের সমস্ত পাহাড়টাই স্লেট পাথর ও মাটির স্তর দিয়ে গঠিত। বৃষ্টির জল প্রবেশ করার ফলে মাটি পাথর আলগা হয়ে যায়। এই পাহাড়ের ঢালু গায়ে অজস্র পাইন আর চীর গাছ। একে নরম ও ঢিলে মাটি, তার ওপর ঝড়ো হাওয়ার দাপট। চীর আর পাইন গাছসুদ্ধ অনেক জায়গা জুড়ে বিরাট ফাটল ধরে। তারপর একসময় একসঙ্গে ভেঙে ধসে পড়ে। পাহাড়ী মানুষগুলো জানে প্রকৃতির এই অদ্ভুত পরিবেশ সম্বন্ধে। তারা পায়ে হেঁটে আর দুচোখ ভরে দেখে ভূপ্রকৃতির গঠন সম্পর্কে মোটামুটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তাই প্রচণ্ড বর্ষণের মধ্যে সামনের এই বিপজ্জনক রাস্তা দেখেও নিরুদ্বেগে দাঁড়িয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর দল এগিয়ে চলে। তাদের চলতে হয়। কারণ, তারা যে দুঃসাহসী হবার শিক্ষা নিতেই এসেছে। তারা এসেছে প্রকৃতির বাধাকে কৌশলে এড়িয়ে যাবার কায়দা শিখতে। মৃত্যুর চোখে ধুলো দিয়ে এগিয়ে যাবার কৌশল আয়ত্ত করতে। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হলে কাঞ্চনজঙ্ঘার দরবারে হাজির হবে কি করে?

প্রচণ্ড বর্ষণের শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেঘ গর্জন চারপাশের পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। দারুণ উত্তেজনা আর পরিশ্রমে বর্ষণের ধারায় সিক্ত হয়েও কপাল বেয়ে ঘাম ঝরে। সেই ঘাম বেয়ে বেয়ে পড়ে চোখে মুখে। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে গিয়ে চোখ-মুখের ঘাম মুছে ফেলি। আমাদের সামনেই পাহাড়ের গা থেকে বিশাল অংশ চীর আর পাইন গাছ নিয়ে কাত হয়ে ধসে পড়ে। বৃষ্টির জলে পাথর আর মাটি মিশে গেছে, তাই ধসের বেগ মোটামুটি ভাবে সংহত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি ধ্বংসের এক অপরূপ

দৃশ্য। বিশাল বিশাল পাইন গাছ আর চীর গাছ, কেমন করে কাঁপতে কাঁপতে কাত হয়ে পড়ে বিরাট ধসের সঙ্গে সঙ্গে। এই স্থান দিয়েই সবাইকে বেরিয়ে যেতে হবে। পথের রেখা নিশ্চিহ্ন। নিচে রঙ্গীত নদী, অদূরেই দেখি উত্তর দিক থেকে আসা র‍্যাথঙ্ নদী ও রঙ্গীত নদীর সঙ্গমস্থল। তারপর প্রায় আরও এক মাইল রাস্তা গিয়ে রঙ্গীত পেরিয়ে যেতে হবে ওপারে। সেখান থেকে শুরু হবে টাশীডিঙ্-এর পাহাড়। ধসের স্থানটি পেরুবার জন্য আমরা সবাই মোটামুটি নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করি। একজন একজন করে দ্রুত ধসের স্থানটি পেরিয়ে ওপারে দাঁড়িয়ে যায় নিরাপদ দূরত্বে। তারপর সবাই পেরিয়ে যায় এক এক করে, ধসের দুপাশ থেকে আর সবাই লক্ষ্য রাখে পাথর গড়াচ্ছে কিনা অথবা ধস নামছে কিনা। শেষের একজন অপেক্ষা করে কুলি ও শেরপানীদের নিরাপদে পার করার জন্য। সবাই নির্বিঘ্নে ধস পেরুবার পর অবাক হয়ে দেখি। কেমন যেন আত্মস্থ হই মুহূর্তের জন্য। কিছু সময় আগেও যা ভেবেছিলাম অসম্ভব, যেখানে দেখেছিলাম মৃত্যুর ফাঁদ পাতা, সেই ফাঁদ এড়িয়ে এতগুলো প্রাণী চলে এসেছে নির্বিঘ্নে কি এক আত্মপ্রত্যয় নিয়ে জানি না। মনে হয় ওটা মৃত্যুর ফাঁদ নয়, আমাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য মৃত্যু দেবতার এক অপকৌশল।

বৃষ্টির বেগ কমে আসে। সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়াও। পাহাড়ের কোল বেয়ে রাস্তা, ঝরনা আর ছোট ছোট জলধারা পেরিয়ে সোজা যেন আমাদের নিয়ে নেমে আসে রঙ্গীতের তটভূমিতে। ধীরে ধীরে বৃষ্টি থেমে যায়। নদীর ওপারে টাশীডিঙ্ পাহাড়, তার গায়ে জমে থাকা কুয়াশা। ওই পাহাড়ের পাদদেশে যাবার আগেই যেন প্রকৃতি-দেবী সবাইকে পরীক্ষা করেন। আকাশ থেকে সমস্ত মেঘ একে একে উধাও হয়ে যায়। নীল আকাশ বেরিয়ে পড়ে। মেঘের আস্তরণে ঢাকা নীল আকাশ যেন আমাদের মতোই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। ঝুলন্ত সেতু পেরয়ে ওপারে যাই রঙ্গীত নদীর তটভূমি

ছাড়িয়ে। তটভূমির সমতলে ছোট গ্রামের মতো। গুটিকয়েক স্লেট পাথরে ছাওয়া ঘরের সামনে প্রশস্ত জমিতে রামদানার রঙীন শীষ, মাচায় ঝুলন্ত বৃহদাকৃতি শসা। স্বল্প পরিসর জমিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়ায় রেড রোড-আয়ল্যাণ্ড মুরগী। পাথরের ওপরে বসে বিশ্রাম নিই সবাই। বিশ্রামের ফাঁকে গভীর বনানী ঘেরা টাশীডিঙ পাহাড় দেখি। আমাদের যাত্রা পথের বিশ্রামস্থল এই পাহাড়ের ওপরে টাশীডিঙে। পাহাড়ের বনচ্ছায়ার ভেতর দিয়ে পাকদণ্ডী পথ, মোট দূরত্ব তিন মাইল। তার পরেও আরও মাইল কয়েক যেতে হবে পাহাড়ের ওপর দিয়ে। ঝড়ে জলে বিপর্যস্ত দেহমন সামান্য বিশ্রামে আবার সতেজ হয়ে ওঠে। ঝিমিয়ে পড়া মানুষগুলো আবার যেন হয়ে ওঠে উচ্ছল। শেরপানীদের কলকণ্ঠ, হাসি আর রসিকতায় মুখর হয়ে ওঠে নির্জন পাহাড়ের পাদদেশ। আবার এগিয়ে চলে সবাই।

•

সাত

টাশীডিঙ্!

পবিত্র নাম টাশীডিঙ্। পবিত্র তার মাটি, পাথর ও জল। পবিত্র সবুজ বনানীতে ঘেরা পাহাড়। টাশীডিঙ একটি পবিত্র তীর্থ স্থান। একথা আগে জানতুম না। টাশীডিঙ না এলে একথা আমার অজানাই থেকে যেত।

সবুজ বনানীর ছায়ায় চড়াই ভেঙে ভেঙে উঠেছিলাম। পথ চলতে চলতে তৃষ্ণা মিটিয়েছিলাম কাঁচা আমলকী সংগ্রহ করে। বড় বড় সেই আমলকী, এমন আকৃতি সচরাচর সমতলে দেখা যায় না। চলতে চলতে বৃষ্টিতে ভেজা পোষাক গায়েই শুকিয়েছিল। ক্লান্তিতে

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত পথের মাঝেই বসে পড়তে। তখন কিছুতেই ভাবতে পারি নি, আমি এক পবিত্র তীর্থস্থানে চলেছি।

পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই কখনও সুখকর নয়। কিন্তু উত্তুঙ্গ চড়াই মনের মধ্যে কল্পনার এক বিচিত্র জাল মেলে ধরে। পথ চলার দুঃসহ ক্লান্তি, ফলশ্রুতির অজানা আশা-ভরসাকে নিষ্প্রভ করে। পা চলতে না চাইলেও মন ছুটে চলে দুর্বার গতিতে।

আমি পথিক হতে পারি নি, পথ চলার কৃচ্ছ্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমার পক্ষে অসম্ভব। তবু পথ চলার সাধনায় যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের চিন্তায় আমার মন আচ্ছন্ন থাকে সর্বক্ষণ। টাশীডিঙ পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। মনে হয় আমার পথচলা বুঝি সার্থক হতে চলেছে।

ঘুমের বৌদ্ধমন্দির আমি দেখেছি। কিন্তু টাশীডিঙের বৌদ্ধ মন্দির বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানকার চোর্তেন বা চৈত্যগুলি, সিকিমের অন্যান্য স্থানের চোর্তেনের তুলনায় বৃহৎ। এখানকার মানেওয়াল বুঝি অতুলনীয়, মন্দিরের অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সব কিছুই শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মন্দির নির্মাণের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ সহজলভ্য নয়। কারণ পরিবেশের ওপরে মন্দিরের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল।

বৌদ্ধ লামাতন্ত্রে মোট তিন প্রকার বৌদ্ধমন্দিরের উল্লেখ আছে।

প্রথম প্রকার মন্দিরকে বলা হয়—টাক্‌ফু বা গুহামন্দির।

মন্দির নির্মাণ যেখানে সম্ভব নয়, অথচ প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূলে, সেখানে যদি পাহাড়ের গায়ে কোনো গুহা থাকে, তাহলে সেই গুহাকেই বৌদ্ধমন্দির হিসাবে ধরা হয়। পরিব্রাজক লামাদের কোনো কোনো সম্প্রদায় আদৌ মন্দির বা বৌদ্ধ বিহার স্থাপনে বিশ্বাসী নন। তাঁরা কিন্তু সাধন-ভজনের জন্য এই টাক্‌ফুকেই বেছে নেন। প্রাকৃতিক পরিবেশে, প্রকৃতিদেবীর নিভৃতে, তারই সৃষ্ট এই গুপ্ত আশ্রয়স্থান। সেখানে তাঁরা লোকসমাজ থেকে সবার অজ্ঞাতে সাধন-

ভজন করে থাকেন। এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের বর্ণিত মুনিঋষিদের সাধন-ভজনের জন্য পাহাড়-পর্বতের গুহার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল আছে। থাকবেই না বা কেন। এ বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না যে আর তিব্বত, সিকিম ও ভুটানের লামাতন্ত্র একদা ভারতবর্ষে গিয়েছিল হিমালয়ের গহনগিরির অন্দর মহলে।

সারা সিকিমে সবসুদ্ধ চারটে গুহামন্দির আছে। কথিত আছে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গুরু রিম্পোচে সুদূর অতীতে এসেছিলেন এদেশ ভ্রমণে। তিনি এই গুহামন্দিরগুলিতে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। তখন এদেশে লামাতন্ত্রের বিকাশলাভ ঘটে নি।

এই চারটে গুহামন্দিরের মধ্যে দক্ষিণদিকে অবস্থিত খাদো সাঙফু বা পরীদের আবাসস্থল। স্থানটি নয়াবাজার থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে।

পূর্বদিকের গুহামন্দিরটির নাম পেফু বা পবিত্র গুহা। স্থানটি সিকিমের টেনডঙ্ ও মানাঙ্ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত। ইয়াঙগঙ থেকে পেফুর দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। সিঙটাম থেকে এই গুহাটি উত্তর-পশ্চিমে।

পশ্চিমদিকের গুহামন্দিরটির নাম দ্বে চেন্ ফু বা পরম আনন্দময় গুহা। এই গুহাটি র‍্যাথঙ্ উপত্যকায় জোঙ্‌রীর কাছে অবস্থিত। জোঙ্‌রীতে কালা পাহাড় কাবুড়ের পাদদেশে চৌদ্দহাজার ফুটেরও উঁচে এই গুহার অবস্থান। শীতের কয়েক মাস দ্বে চেন্ ফু তুষারে আবৃত থাকে।

উত্তরের গুহামন্দিরটির নাম লাঙ্‌রী নিয়াঙ্‌ফু বা ঈশ্বরের প্রাচীন আবাসস্থল। এই গুহাটি টাশীডিঙ্ থেকে উত্তরে প্রায় তিন দিনের হাঁটাপথ। এই পায়ে চলার পথ তেমন দুর্গম নয়।

দ্বিতীয় প্রকার মন্দিরকে লামারা গোম্ফা বলে উল্লেখ করেন। গোম্ফা শব্দের অর্থ 'নির্জন স্থান'। সিকিমের সমস্ত অংশে পয়ত্রিশটি প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল ১৬৯৭ সন

থেকে ১৮৮৪ সন পর্যন্ত। এই মন্দিরগুলির মধ্যে পাঁচটি বৃহদাকৃতির মন্দির। সব চাইতে বড় মন্দির রয়েছে পেমিওঙচিতে। আর সব চাইতে ছোট মন্দির আছে লাচুঙ ও নবলিঙে। মন্দির যেখানে-সেখানে স্থাপিত হতে পারে না। তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ ও স্থান। মন্দির স্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ ও স্থান সম্পর্কে লামারা উল্লেখ করেছেন।

গোম্ফা নির্মিত হওয়া উচিত পাহাড়ের শীর্ষে, গিরিশিরার ওপরে বিস্তৃত স্থানে। গোম্ফার সামনে হ্রদ থাকলে খুবই ভাল, কাছাকাছি ঝরনা থাকলে তো কথাই নেই স্থানের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে। গোম্ফার পূর্বদিকটি উন্মুক্ত থাকা উচিত। যাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, সূর্যের সোনালী রশ্মি মন্দিরকে উদ্ভাসিত করতে পারে। মন্দিরের প্রধান দরজা হবে পূর্বদিকে বা দক্ষিণে অথবা দক্ষিণ-পূর্বে।

মন্দির স্থাপনের শ্রেষ্ঠ স্থান—

পাহাড়ের ও পাথরের পেছনে

ছোট্ট হ্রদের সামনে।

মন্দিরের স্থান থেকে নদী দেখতে পাওয়া আদৌ শুভ লক্ষণ নয়। এ ছাড়া মন্দিরের সামনে থাকবে প্রেয়ার ফ্ল্যাগ বা প্রার্থনা পতাকা। মন্দির প্রাঙ্গণের প্রবেশ-মুখে থাকা উচিত চোর্তেন ও মানেওয়াল। তৃতীয় প্রকার মন্দিরের নাম গোম্পস্। গোম্পস্ সাধারণত লোকালয়ে, গ্রামের ভেতরে অথবা গ্রামের খুবই নিকটে স্থাপিত হবে। মন্দিরের পরিবেশের ব্যাপারে সেখানে কড়াকড়ি শিথিল করা হয়ে থাকে। লামাতন্ত্রে তিনপ্রকার মন্দিরের মধ্যে এটি বোধহয় নিকৃষ্ট ধরনের।

সমস্ত টাশীডিঙ পাহাড়টাই মঠ-মন্দির স্থাপনের উপযোগী। এতটা উঁচুতে, এত দীর্ঘ গিরিশিরার শীর্ষে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত স্থান খুব

কমই দেখা যায়। টাশীডিঙ গিরিশিরার উচ্চতা ৪৩৪০ ফুট ; পূর্ব ও দক্ষিণদিকটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। অনেক নিচে বয়ে চলা র‍্যাথঙ্ নদীর জলকল্লোল খাড়া পাহাড় ও বনভূমি ডিঙিয়ে এত উঁচুতে পৌঁছতে পারে না। ওপর থেকে নদীর গিরিখাত শুধ্ বোঝা যায়, নদীর জলধারা দৃশ্যমান নয়। পূর্বদিকটা উন্মুক্ত বলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ আলো এসে পড়ে টাশীডিঙের বুকে। দক্ষিণদিকটা ঢালু ও পরিষ্কার, যার জন্য দূরে দার্জিলিঙ পাহাড়ের সবুজ গিরিদেশ দেখা যায়। টাশীডিঙের পাহাড় খাড়া ও মোচাকৃতি। ভূগোলবিদ্‌দের মতে এটি কাঞ্চনজঙ্ঘার গিরিশিরার শেষ অংশ। এই অংশের নাম পওহুঙরী। পওহুঙরীর পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে গ্রেট রঙ্গীত, উত্তর-পশ্চিমদিক থেকে র‍্যাথঙ নদী এসে মিলিত হয়েছে গ্রেট রঙ্গীতের সঙ্গে! র‍্যাথঙ বয়ে চলেছে পওহুঙরীর উত্তর-পশ্চিম পাদদেশ দিয়ে। টাশীডিঙ পাহাড়ের মোট চড়াই অংশ ১৮০০ ফুট।

এখানে তিনটি বৌদ্ধমন্দির ও চব্বিশ-পঁচিশটি চোর্তেন রয়েছে। পাহাড়ের শীর্ষে সমতল ভূমি জুড়ে রয়েছে মন্দির ও লামাদের বাসস্থান। বৌদ্ধ বিহারের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই প্রথমে দেখা যাবে লামাদের আবাস স্থানগুলি। ঘরের সামনে ছোট বাগান, সেখানে নানা বর্ণের ফুল ফুটে থাকে। তারপরই পাথর দিয়ে বাঁধানো অসমান বেদীগুলোর ওপরে তিনটি বড় বড় মন্দির। মন্দিরের পরেই কিছু অংশ বর্গাকার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আরও উত্তরদিকে চব্বিশ-পঁচিশটি বিভিন্ন উচ্চতায় চোর্তেন যেন রয়েছে ভিড় জমিয়ে। দূর থেকে মনে হবে সমাধিস্থানের উপরে ওগুলো স্মৃতিস্তম্ভের মতো। চোর্তেনগুলির মাঝে মাঝে পাম গাছ, এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

লামাদের বাসস্থানগুলির মধ্যে প্রথমে নজরে পড়ে প্রধান লামার বাসস্থান্। বর্গাকার দ্বিতল বাড়ি। তার নিচতলা পাথর দিয়ে মোটামুটি শক্ত করে গাঁথা। ওপরতলা কাঠ দিয়ে তৈরি। ওপরের ঘরটির দৈর্ঘ্য প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ ফুট, প্রস্থ আট থেকে নয় ফুট। ঘরের

সমস্ত জানালাগুলি বাঁশ দিয়ে সুন্দর জাফরীর মতো গাঁথনি করা। ঘরের ভেতর থেকে ওপরের আচ্ছাদন পর্যন্ত বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি। এই লামাদের আবাসস্থলে মোট কুড়িজন লামার থাকবার মতো ব্যবস্থা রয়েছে।

এই বৌদ্ধ বিহারে তিনটি মন্দির, প্রতিটিই পরস্পর থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে নির্মিত। কিন্তু কোনো মন্দিরই পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল নয়। প্রতিটি মন্দিরই আয়তাকার, ওপরের দিকটা ধীরে ধীরে সরু হয়ে গিয়েছে। শেষ দিকটায় রয়েছে দরজা। মাঝখানের মন্দিরটি অপর দুইটির তুলনায় আয়তনে ছোট। এই মন্দিরটি পশ্চিমাভিমুখী, অপর মন্দির দুইটি পূর্বাভিমুখী। সব মন্দিরগুলির প্রবেশদ্বার প্রশস্ত, কিন্তু উচ্চতা বেশ কম। মন্দিরের দ্বারের ওপরে বেশ বড় পোর্টিকো রয়েছে। ঘরের দেওয়াল অত্যন্ত পুরু, স্লেট পাথর দিয়ে দৃঢ়ভাবে গাঁথা। ঘরের অভ্যন্তরের উচ্চতা কম। মন্দিরের ওপরে ছোট একটি তলা আছে, সেখানে লামাদের অনুচরেরা বাস করে। ওপরে ওঠবার জন্য বাইরে থেকে লাগানো আছে মই।

মন্দিরের প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ হলেও অভ্যন্তরভাগ বেশ প্রশস্ত। সেখানে প্রায় সমস্ত স্থান জুড়ে আছে মস্ত বড় ড্রামের মতো বিশালকায় প্রার্থনা চক্র। কাঠের দরজার কারুকার্য প্রশংসনীয়। দরজা উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত, কোথাও বা সোনালী রঙের ছোপ।

উত্তরদিকের মন্দিরটি অত্যন্ত সাদাসিধে, প্রায় কারুকার্যবিহীন। মাঝখানের মন্দিরটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত। সমস্ত দেওয়ালটিতে কালো রঙের কতকগুলি মুখাকৃতি অঙ্কিত। মুখাকৃতিগুলির চোখ দুটো গোলাকার, সাদা ধবধবে বিশাল দন্তরাজি। শুনি মন্দিরটি ভূত প্রেত ও অপদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত। দক্ষিণদিকের মন্দিরটিই সবচাইতে বৃহৎ ও সুন্দর কারুকার্যখচিত। এইটিকেই টাশীডিঙের প্রধান মন্দির বলা হয়। মন্দিরটি আয়তাকার, ভেতরের দেওয়াল ও মেঝে মসৃণ। দেওয়ালে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কিত অনেক কাহিনীচিত্র

অঙ্কিত। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রাচীন পুথিপত্র সম্বলিত ছোট পুস্তকাগারও রয়েছে।

এই প্রধান মন্দিরটির নাম দুগাঙ্। দুগাঙের প্রবেশ-মুখে প্রকাণ্ড কাঠের দরজা। ঘরের দেওয়াল অত্যন্ত পুরু বলে অভ্যন্তরে আলো প্রবেশ করতে পারে না যথাযথভাবে। অভ্যন্তরে ছয়টি ষড়ভুজযুক্ত কাঠের সোনালীরঙে রঞ্জিত থামগুলি মন্দিরের ছাদটিকে রয়েছে ধারণ করে। মন্দিরের ছাদের নিচের আচ্ছাদন আড়া-আড়িভাবে কড়িকাঠ দিয়ে মজবুত করা।

সেই কড়িকাঠগুলোও সোনালীরঙে রঞ্জিত।

মন্দিরের অভ্যন্তরে দুটি বেঞ্চ সমান্তরালভাবে সন্নিবিষ্ট। তারপরেই সামান্য উঁচু বেদী। বেদীর পেছনেই মূর্তি। বেদীর পাশেই একটি উচ্চাসন। বেঞ্চদুটোতে লামারা বসেন প্রার্থনায় যোগদানের জন্য। বেদীর নিকটবর্তী আসনে প্রধান লামা উপবেশন করে পূজা ও প্রার্থনা পরিচালনা করেন। বেদীর ওপরে থাকে সাতটি পিতল নির্মিত জলপাত্র। পেছনে প্রতিষ্ঠিত মূর্তির ওপরে সুন্দর করে টাঙানো চন্দ্রাতপ। পেছনে সবুজ সিল্কের পর্দা। মুখ্য মূর্তির দুপাশে স্ত্রী ও পুরুষ দেবতার মূর্তি। তাদের সামনেও বেদী। মন্দিরের দেওয়ালে সুন্দর করে অঙ্কিত লামাদের মূর্তি।

দুগাঙ্ মন্দিরের মুখ্য দেবতা শাক্যসিংহ। তিনি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালি ডান পায়ের ওপরে স্থাপিত। বাঁ হাত উরুর ওপরের। হাতের মধ্যে পদ্ম ও মণি। ডান হাত ডান পায়ের ওপরে স্থাপিত। হাতের আঙুল দুটি নিম্নদিকে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা প্রদর্শিত। শাক্যসিংহের মূর্তির ডান ও বামপার্শ্বে পুরুষ ও স্ত্রী দেবতার মূর্তি দণ্ডায়মান। মূর্তির পশ্চাতে জ্যোতিচ্ছটা। বেদীর ওপরে পিতলের জলাধার ছাড়াও ফুল ময়ুরের পালক এই সব বেদীসজ্জার উপকরণ। মন্দিরের পুস্তকাগারে কয়েক শত বৎসর পূর্বের প্রাচীন পুথি ও পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে সযত্নে।

অস্পষ্ট আলোকপূর্ণ মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল। তুগাঙ্ মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত সুন্দর শিল্পকলার নিদর্শন রয়েছে দেওয়ালে। দেওয়াল, কাঠের থাম, আর কড়ি কাঠের বর্ণবৈচিত্র্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বলে সর্বক্ষণ। এই অস্পষ্ট দীপালোক তাই এক মোহময় পরিবেশ রচনা করে। মন্দিরের অভ্যন্তরে ধূপ, গুগ্গুল প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্য পোড়ানোর পরিবর্তে, জুনিপারের সুগন্ধি পাতা, উচ্চ হিমালয়ের অন্যান্য গাছের সুগন্ধি পাতা পোড়ানো হয়। এই সব পাতার সুমিষ্ট ও অপরিচিত গন্ধের মাদকতায় মন মুহূর্তের মধ্যে প্রবেশ করে এক কল্পলোকে। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ, অবস্থান ও পরিবেশ সবই মন হরণকারী। মূর্তি সেখানে শ্রদ্ধার আসন নিয়ে বিরাজমান, পূজা বা প্রার্থনা তাই মনে হয় গৌণ। টাশীডিঙ্ মন্দিরের লামাদের দেখি, তারা স্বল্পবাক্, দীর্ঘ জপের মালায় মন নিবদ্ধ। লামাদের মধ্যে জনকয়েক বৃদ্ধ। অনেক প্রাচীন স্মৃতি তাদের মনের মধ্যে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। লামারা নির্জনতা প্রিয়, কদাচিত তাঁরা আসেন দর্শকদের সামনে। এলেও তাঁরা জিজ্ঞাসিত না হয়ে কথা বলেন না। অনেকক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করেও জবাব পাওয়া যায় না। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতোই তাঁদের আচরণ। তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র হলুদরঙের সিল্কের। তাঁরা তুগ্কা সম্প্রদায় ভুক্ত।

টাশীডিঙের মন্দির ও বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়েছিল ১৭১৫ সনে। সেই সময়ে সিকিমের সিংহাসনে আসীন ছিলেন চাকদর্ নামগিয়াল। কিন্তু বৌদ্ধ মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্থান নির্বাচন, মঠ স্থাপন করা হয়েছিল আরও তুইশত বৎসর পূর্বে। সিকিমে তখন সবেমাত্র লামাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিন জন প্রখ্যাত লামার প্রচেষ্টায়। তাঁরাই ফুণ্টসগ নামগিয়ালকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

রাজ্য শাসনের দায়দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিতে পারেন নি। তবে রাজশক্তির সহায়তায় সিকিমের বিভিন্ন অংশে মন্দির ও মঠ নির্মাণ, ধর্মপ্রচারের প্রচুর সাহায্য তিনি করেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধদেব মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ভ্রাতা নন্দ একবার প্রণাম করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলে ভগবান বুদ্ধ তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেছিলেন যে প্রণামের দ্বারা তিনি তুষ্ট হবেন না। সদ্ধর্ম পালন করে ধর্মের প্রচারেই তিনি বরং সুখী হবেন। ভগবান বুদ্ধের মনোভাব, তাঁর নির্বাণ প্রাপ্তির পর চারশত বৎসর পর্যন্ত ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ স্মরণ রেখেছিলেন বিশেষভাবে। সম্ভবত এই জন্যই ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ প্রাপ্তির চারশত বৎসরের মধ্যে ভারত বা এসিয়ার কোথায় তাঁর কোনো মূর্তি পাওয়া যায় নি।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কোনো কোনো অঞ্চলে ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এবং হিন্দুধর্মের তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায়, বৌদ্ধধর্মও সম্ভবত এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে শুরু করেছিল। ফলস্বরূপ, বৌদ্ধদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কারও কারও মধ্যে মূর্তি পূজার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মূর্তি পূজার প্রারম্ভিক পর্যায়ে শুরু হয়েছিল বোধিবৃক্ষ পূজো করা, ভগবান বুদ্ধের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, বা তার সম্পর্কিত সবকিছুই পবিত্র জ্ঞানে পূজো করার প্রচেষ্টা। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতে বৌদ্ধধর্মের কোনো কোনো সম্প্রদায় মূর্তি পূজার প্রচলন করেছিলেন ব্যাপকভাবে। তিব্বতে তখন যথারীতি ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্মে মূর্তি পূজার প্রচলন করেন। এই সময়ে প্রখ্যাত পরিব্রাজক হিউ এন্ সাঙ ভারতে পরিভ্রমণকালে বৌদ্ধধর্মের মহাযান সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তখন এই মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যেও তান্ত্রিক মতবাদ প্রচলিত হতে

শুরু করেছিল। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় "Mahajan school then predominated in India and Tantrik and mystic doctrines were appearing."

ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পণ্ডিত পদ্মসম্ভব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক মতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিব্বতে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ পূর্ণভাবে সম্পাদন করেছিলেন ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অতীশ (খ্রীঃ ১০৩৮—১০৫২)। তিনি পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের প্রতিষ্ঠিত বজ্রযান মতবাদের পূর্ণ সংস্কার সাধন করেছিলেন। প্রাথমিক অবস্থায় বজ্রযান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল চারটি দল। তারা যথাক্রমে, কাহ্‌ডেম পা, গ্যেলুক্ পা, নিঙমা পা ও কার্গিয়া পা। কাহ্‌ডেম পা অর্থ সংশোধিত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় শাস্ত্র ও বিধিনিষেধ ও আচার মেনে চলত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। এরা তাই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই জড়িয়ে পড়ত। ধর্মাচরণের মুখ্য উদ্দেশ্যই মূলত ব্যাহত হত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

পরবর্তীকালে এর ভেতর থেকেই এক নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, যার নাম গ্যেলুক্ পা। গ্যেলুক্ পা সম্প্রদায় পুরোনো রীতিনীতির সংশোধন শুরু করে, এক নতুন সংস্কারমুক্ত সম্প্রদায়রূপে পরিচিত হয়। কিন্তু বজ্রযানীদের মধ্যে অনেকেই এই সংস্কারমুক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে অনিচ্ছুক হন। তাঁদের বলা হয় নিঙমা পা। নিঙমা পা পুরোনো রীতিনীতিতে বিশ্বাসী।

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রখ্যাত লামা মার্‌পা তিব্বত থেকে ভারতে এসে পণ্ডিত অতীশ ও তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ মতো কার্গিয়া পা বা কার্মা পা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই শ্রেণীর লামারা গুহায় বাস করেন। বহির্জগতের সঙ্গে বস্তুত তাঁরা সম্পর্কহীনভাবে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁদের সমস্ত অবস্থায় সব রকম বিপদ ও

অপদেবতার দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবেন কৃষ্ণ পোষাকে আচ্ছাদিত ভগবান।

তাঁদের ধ্যানের মূর্তি হবেন ডেমচক্ বা মুখ্য আনন্দময় সত্তা। সংস্কৃতে যাকে 'সম্ভব' বলা হয়। তাঁদের অলৌকিক শক্তিধর আরাধ্য দেবতার নাম দোর্জেছাঙ্ বা বজ্রধর। তিনি বজ্রধারণকারী অসামান্য শক্তিধর। তাঁকে সংস্কৃতেও বজ্রধর নামে অভিহিত করা হয়। তাঁদের শিরাবরণের নাম গোমঝা পুখিয়া।

কার্গিয়া পা সম্প্রদায়ের মুখ্য উপাস্য দোর্জেছাঙ্ বা বজ্রধর। এই সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক পণ্ডিত ও ভারতীয় দার্শনিক তিলোপা ও নারোপা (১০৩৯ খ্রীঃ)। কার্গিয়া পা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অধিকাংশ স্থানেই মারোপার তিব্বতীয় শিষ্য মারাপার উল্লেখ করা হয়েছে। মারাপা-র গুরুদেব হিসাবে প্রখ্যাত ভারতীয় পর্যটক লামা মিলারাপ্পার নাম উল্লেখ করা হয়েছে কোথাও কোথাও। মিলারাপ্পার জন্ম হয়েছিল ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। কথিত আছে মিলারাপ্পাই কার্গিয়া পা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

কার্গিয়াপা সম্প্রদায়ের আরও একজন একনিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন তিব্বতীয় লামা রঙচুঙ দোর্জে। তিনি ছিলেন মিলারাপ্পার অন্য এক জন শিষ্য। লাসার উত্তর-পশ্চিমে টু লাঙৎস্তুফু নামে বৌদ্ধবিহার স্থাপন (১১৫৮ খ্রীঃ) রঙচুঙ দোর্জের অন্যতম কীর্তি।

এই সম্প্রদায়ের সিকিমস্থিত বৌদ্ধবিহার ও মন্দির স্থাপিত হয়েছিল ১৭৩০ সনে রালামে। বৌদ্ধমন্দিরটি মোটামুটি বৃহৎ, এখানকার মঠে আশিজন বৌদ্ধ লামা বাস করেন। রালাম, গ্যাঙটক্ থেকে যেতে হয় লাচেন উপত্যকার দিকে। তৎকালীন সিকিমরাজ গিরমে নামগিয়াল যখন তিব্বতে গিয়েছিলেন তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে, তখন সেখানকার কার্গিয়া পা বা কার্মাপা সম্প্রদায়ের নবম লামা তাঁকে এই মন্দির ও মঠ নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

সিকিমে দুই সম্প্রদায়ের লামাই অবস্থান করছেন দীর্ঘকাল ধরে। তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও ধর্মাচারণের রীতিনীতিতে রয়েছে খুবই সামান্য পার্থক্য। এরা পরস্পর পরস্পরের খুব কাছে এসেও কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছেন। এই দুটি সম্প্রদায় নিঙমা পা ও কার্গিয়া পা। সমস্ত সিকিমে নিঙমা পা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বেশি। কারণ এই সম্প্রদায়ের লামারা প্রথম পদার্পণ করেছিলেন সিকিমে। এই নতুন ঘরের নতুন মানুষদের কাছে শুনিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের বাণী। তাঁদের নিষ্ঠা, অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সমস্ত সিকিমে লামা ধর্মের প্রসার লাভ করেছিল। তখন কার্গিয়া পা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না।

নিঙমা পা অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী লামা—প্রাচীন সাধনপ্রণালী ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ধারক ও বাহক। এই নিঙমা পা সম্প্রদায় আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা সিকিমে। এই তিনটি ক্ষুদ্র দলের নাম লাহ্বছুন পা, কার্তক পা ও নাগদা পা। লাহ্বছুন পা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক প্রখ্যাত লামা লাহ্বছেন ছেম্বু। এই সম্প্রদায়ের প্রধান বৌদ্ধমন্দির ও মঠের নাম পেমিওঙচি।

কার্তক পা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রিগজিন ছেম্বু। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মন্দিরগুলির নাম কার্তক ও দোলিঙ। কারও কারও মতে দার্জিলিঙের নাম ছিল দোর্জেলিঙ। এই দোর্জেলিঙ নামটি এসেছিল লামা দোর্জেলিঙ পা থেকে। দোলিঙ মঠ সিকিমে অবস্থিত। দার্জিলিঙে অবস্থিত ঘুম বৌদ্ধমন্দিরটি দোলিঙ মঠের অধীনস্থ।

নাগদা পা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন নাগদাক ছেম্বু বা শেম্পা ছেম্বু। এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ স্থাপিত হয়েছিল সিকিমের নামচে, সিনোন, ওথাঙ, মচু ও টাশীডিঙে। এর মধ্যে টাশীডিঙের বৌদ্ধমন্দির সব চাইতে বৃহৎ।

নিঙমা পা সম্প্রদায়ের তিন দলই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও তত্ত্বগত মতবাদে মোটামুটি একমত। সবাই মহাযোগ বা মুক্তি সম্পর্কে

সমানভাবে বিশ্বাসী। তাঁরা গুরু পদ্মসম্ভব বা গুরু রিম্পোচেকে বিশেষভাবে পূজা করে থাকেন। এই তিনটি সম্প্রদায়ের উপাস্য সবচাইতে প্রিয় দেবতা সামন্তভদ্র। বিশেষভাবে পূজ্য দেবতার নাম তুব্‌পা কাট্‌গি। এদের মঙ্গলকামী দেবতার নাম পাল্‌গন দাঙগা। এই সম্প্রদায়ের সবাই একরূপ অদ্ভুত লাল টুপি শিরাবরণ হিসাবে ব্যবহার করেন। এই শিরাবরণের নাম উগায়েন পেনঝু।

এই তিনটি সম্প্রদায়ের লামারা গুরু রিম্পোচকে বিভিন্ন নামে পূজা করে থাকেন। তার মধ্যে আটটি নামই সমধিক প্রচলিত। এই আটটি নাম গুরু পদ্মজুগ্‌মে, গুরু পদ্মসম্ভব, গুরু পদ্ম গিয়াল্‌পো, গুরু দোর্জে দোলা, গুরু নিঙ্‌মা অড্‌জায়, গুরু শাক্যসিংহ, গুরু শিঙ গেদা ডক্‌, গুরু লো টেন, ছাগ সি।

আট

টাশীডিঙের মন্দির।

ধর্মরাজের মন্দির। ধর্ম এখানে সদা বিরাজমান। সে ধর্ম রোগ শোক জরাব্যাধির অত্যাচারে জর্জরিত মানুষকে মুক্তির স্বর্গে, মহামুক্তির আনন্দধামে নিয়ে যাবার বাহক। এই ধর্মের মূলতত্ত্ব, বজ্রের মতো দৃঢ়, অপরিবর্তিত, অমোঘ ও অবিনশ্বর! বজ্রযানের মোটামুটি বক্তব্য সম্ভবত এই। সবচাইতে অবাক হয়ে শুনি, যখন এই দুরূহ তত্ত্বকথা আমাকে সহজ সাধারণভাবে শুনিয়ে দেন আমার পর্বতারোহণের শিক্ষাগুরু প্রখ্যাত পর্বতারোহী ছা নামগিয়াল। ১৯৫৩ সনের এভারেস্ট অভিযানে ২৭,৩৫০ ফুট থেকে স্বেচ্ছায় ফিরে আসেন তিনি। আঙুলে তাঁর তুষারক্ষত হয়েছিল, হয়তো তাই। না, হলে এভারেস্টের শীর্ষে আরোহণের গৌরবময় সাফল্যের ইতিহাসে আরও

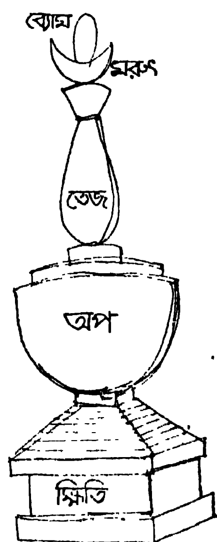
একটি নাম সংযোজিত হত। ছা নামগিয়াল নামের প্রত্যাশী নন, সত্যিকারের হিমালয়প্রেমী। এই নিরহঙ্কারী, সহজ, সরল ও স্নেহপরায়ণ মানুষটিকে দেখেছি ধর্মের কথা বলতে বলতে কেমন যেন তন্ময় হয়ে যেতে। ধর্মে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস, আমার কাছে কেমন অদ্ভুত লাগত। পর্বতারোহণে দুঃসাহসিক মানসিকতার যখন প্রয়োজন, যেখানে মৃত্যুর সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে মোকাবিলা করতে হয়, সেখানে ধর্মবিশ্বাসের দুর্বলতা থাকবে কেন? ছা নামগিয়াল হাসতেন, পাহাড় হল মঙ্গলকামী দেবতা। এই দেবতা আদেশ করলে তবেই আমরা ওপরে উঠতে পারি, আর নারাজ হলে ফিরে আসি দুহাত কপালে ঠেকিয়ে।

টাশীডিঙের মন্দির-চত্বর পেরিয়ে ছা নামগিয়াল উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে যান আমাকে নিয়ে। পথটা ঢালু হয়ে পাম গাছের ছায়ার ঘেরা অপ্রশস্ত জমির সামনে এসে থমকে দাঁড়াই। বিস্ময়ে যেন মূক হয়ে যাই কিছু সময়ের জন্য। ছা নামগিয়ালের কণ্ঠ শুনি স্বপ্নাবিষ্টের মতো, ভাল করে তাকিয়ে দেখ তোমার সামনে কি?

আমি দুচোখ ভরে দেখি, ছোট বড় বিভিন্ন আকারের চব্বিশ-পঁচিশটি চোর্তেন সমস্ত সমতল ভূমি জুড়ে ছড়ানো। এই চোর্তেন-গুলোর মাঝে মাঝে পাম গাছ সৃষ্টি করেছে এক মোহময় পরিবেশের। চোর্তেনগুলি পুরোনো, তার গঠনকৌশল, সবকিছু দেখে মনে হয়, এগুলো টাশীডিঙের মন্দিরের সমসাময়িক। চোর্তেন বা চৈত্য অথবা বৌদ্ধ স্তূপগুলির আকৃতি সর্বত্রই একরকমের। এর সবসুদ্ধ পাঁচটি অংশ। একটি অংশের গঠনকৌশল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চোর্তেনের পাঁচটি অংশ যথাক্রমে, একটির ওপরে অপরটি স্থাপিত। সর্বনিম্ন অংশটি ভূমিসংলগ্ন, অনেকটা বেদীর মতো। তার ওপরের অংশ মোটামুটি গম্বুজাকৃতি। গম্বুজাকৃতি অংশের ওপরে রয়েছে মোচাকৃতি অংশ। মোচাকৃতি অংশের ওপরে অনেকটা পদ্ম-পাপড়ির মতো, পদ্মপাপড়ির ওপরে পদ্মকোরক। এই পাঁচটি

অংশের রয়েছে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। এই পাঁচটি অংশ মূলত পঞ্চতত্ত্বের প্রতীক। এই পঞ্চতত্ত্ব হল—পৃথ্বীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও শূন্যতত্ত্ব, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত।

মনুষ্যদেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। এই পঞ্চভৌতিক দেহ, মৃত্যুর পরে আবার পঞ্চভূতেই লীন হয়ে যায়। চোর্তেনের সর্বনিম্ন ভূমি-সংলগ্ন অংশ ক্ষিতি বা পৃথ্বীতত্ত্বের প্রতীক। তার ওপরে গম্বুজাকৃতি অংশ অপ বা জলতত্ত্বের প্রতীক। প্রায় মোচাকৃতি অংশ তেজ বা অগ্নিতত্ত্বের পরিচায়ক। পদ্মপাপড়ির মতো আকৃতিবিশিষ্ট অংশ মরুৎ বা বায়ুতত্ত্বের প্রতীক। সর্বোপরি পদ্মকোরকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট অংশ ব্যোম বা শূন্যতত্ত্বের প্রতীক। সিকিমের সমস্ত বৌদ্ধস্তূপ বা চোর্তেন এর গঠনপ্রকৃতি ও তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এক। এই পঞ্চতত্ত্বের সবিশেষ পরিচয় রয়েছে ঋষি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে। বজ্রযানীদের শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করলে এই কথাই মনে হবে। টাশীডিঙের চোর্তেনগুলি সারিবদ্ধভাবে স্থাপিত নয়। প্রশস্ত ভূভাগের ওপরে এলোমেলোভাবে স্থাপিত বিভিন্ন উচ্চতার চোর্তেনগুলো লক্ষ্য করলে মনে হবে, সবগুলি চোর্তেন একই দিনে বা অল্প সময়ের ব্যবধানে নির্মিত হয় নি। সব চাইতে উচ্চ চোর্তেনটি নির্মিত হয়েছিল চাকডর নামগিয়ালের কনিষ্ঠ পুত্রের স্মরণে।



চোর্তেন

টাশীডিঙের চোর্তেনগুলি পরম পবিত্র। এইগুলি দর্শনেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। চোর্তেনগুলির পবিত্রতা সম্পর্কে বিশেষ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে—শাক্যসিংহের মৃত্যুর পরে তাঁর দেহাবশেষ শিষ্য-প্রশিষ্যরা সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই দেহাবশেষ পরম পবিত্র বলে সর্বত্র পূজিত হত। সিকিমের জনক

লাহ্বছেন ছেম্বুর প্রিয় শিষ্য জিগমে পাও শাক্যসিংহের দেহাবশেষ সংগ্রহ করে এনেছিলেন সিকিমে। সেই দেহাবশেষ স্থাপিত হয়েছিল এখানকার চোর্তেনে। লামাদের মতে শাক্যসিংহের দেহ চিতার আগুনে ভস্মীভূত হলেও দুই রকম দেহাবশেষ অবশিষ্ট ছিল। শ্বেত শস্ত্যকণিকার মতো দানাযুক্ত দেহাবশেষের নাম ফাদুঙ। অস্থি থেকে অবশিষ্ট হলদে রঙের কণাগুলোর নাম রিগস্রেন। টাশীডিঙের চৈত্যে নাকি ফাদুঙ স্থাপিত হয়েছিল। এর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। সিকিম রূপকথার দেশ। অনেক কাহিনী, অনেক রূপকথা তার পাহাড়ে, পাথরে, জলধারার কল্লোলে আর ঘন বনচ্ছায়ায় রয়েছে ছড়ানো। সেগুলোর কোনো ইতিহাস নেই। তৎকালীন বৈদেশিক পর্যটক যা কিছু শুনেছিলেন স্থানীয় লামাদের কাছে তাই সংগ্রহ করে গেছেন লিপিবদ্ধ করে। এর মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে, অবিশ্বাসী মনের খোরাক রয়েছে প্রচুর। তবু আমি ভেবেছি এই চোর্তেনগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে, লোক পরম্পরায় অনেক সত্য ঘটনাও প্রচার হতে গিয়ে কি রূপকথায় পরিণত হয় না?

টাশীডিঙের মন্দিরের মুখ্যমূর্তি শাক্যসিংহের। তার চুলগুলি কোঁকড়ানো, দেহের বর্ণ অনেকটা পীতাভ। বৌদ্ধদের দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বেই আরও চতুর্বিংশতি বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধকেই শেষ বুদ্ধ মনে করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে সাতজন বুদ্ধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাঁদের বলা হয় মানুষী বুদ্ধ। এই মানুষী বুদ্ধদের নাম যথাক্রমে, বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভু, ক্রকুচ্ছন্দ, কনক মুনি, কাশ্যপ ও শাক্যসিংহ। শেষোক্ত তিনজন ঐতিহাসিক পুরুষ। প্রত্যেক মানুষী বুদ্ধের একটি করে বোধিবৃক্ষ থাকে। মূর্তির মুখাবয়ব, দেহের বর্ণ একই প্রকার। তাঁরা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান। তাদের একটি মুখ, দ্বিভুজ, দেহের বর্ণ পীত, বা স্বর্ণাভ। বজ্রযানীদের মধ্যে গৌতমবুদ্ধের স্থান একরূপ নেই বললেই চলে। তবে অনেক স্থানেই তাকে অক্ষোভ্য বলে প্রতিমূর্তিত করা হয়।

টাশীডিঙের দুগাঙ মন্দিরের মূর্তিগুলি অক্ষোভ্যকুলের। অক্ষোভ্য, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম। অক্ষোভ্য শব্দের অর্থ যিনি ক্ষোভশূন্য, অচল অচঞ্চল। অক্ষোভ্যকুলের দেবতাগণের দেহবর্ণ নীল, তাঁরা ভীষণাকৃতি ও ভীতিজ্ঞাপক। বজ্রযান বৌদ্ধদেবমণ্ডলের মূল দেবতা আদি বুদ্ধ, ইনিই সৃষ্টির আদি, ইনি সর্বশক্তিমান। সর্বত্র প্রতি অণু পরমাণুতে তাঁর অবস্থিতি। আদি বুদ্ধ থেকেই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের উদ্ভব। ধ্যানী বুদ্ধ আদি বুদ্ধের শক্তিস্বরূপ।

টাশীডিঙের মন্দির এক সময় তিব্বতীয় লামাদের দ্বারা আনীত ধনৈশ্বর্যে পূর্ণ হয়েছিল। এই মন্দিরের প্রাচীন পুঁথির গ্রন্থাগারেও প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এই মন্দিরের অধিকাংশ সম্পদই নেপালী সৈন্যেরা নিয়ে গিয়েছিল লুণ্ঠন করে। প্রাচীন গ্রন্থ তারা বিনষ্ট করেছিল নির্বিচারে।

টাশীডিঙ, ধর্মরাজের মন্দির।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বৎসর পূর্বে এই মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। চোর্তেনগুলোর ভিড় ঠেলে, স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনের অনেক জিজ্ঞাসার ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। চোর্তেন পেরিয়েই বিশাল মানেওয়াল, তার চারপাশে স্লেট পাথর দিয়ে খোদাই করে বড় বড় করে লেখা ওম্ মনি পদ্মে হুম্। মানেওয়াল স্লেট পাথর দিয়ে গাঁথা বিরাট আয়তকার স্তূপ। আরও উত্তরে ইস্কুল বাড়ির পেছনে ছোট ছোট কয়েকটি মানেওয়াল। টাশীডিঙ, যথার্থই ধর্মরাজার আবাস স্থল। সেখানে পাথর, বৌদ্ধস্তূপ নিরন্তর অবলোকিতের বীজমন্ত্র জপ করে চলেছে ওম্ মনি পদ্মে হুম্! টাশীডিঙে সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। পাখিরা কলরব করে। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ছোট ছোট স্লেট পাথরে ছাওয়া ঘর, তার স্বল্প পরিসর আঙ্গিনায় সাদা আর লাল রঙের মুরগী

ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ঝরনার ধারে মোষ আর ভেড়ার পাল নিয়ে বসে থাকে ছেলেমেয়েরা। অনেক নিচে স্থপেয় জলের ঝরনা থেকে ঘড়া ভর্তি করে জল নিয়ে আসে সদা হাস্যময়ী তরুণীরা। ওরা হাসে, অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখে শুধু হাসে। ওরা কি কাঁদতে জানে না! ধর্মরাজের মন্দির থেকে ওরা বুঝি মহামুক্তির মন্ত্র পেয়েছে!

নয়

সূর্য উঠবার আগেই পাহাড়ে পথ চলার রীতি। টাশীডিঙ ছেড়ে তাই এগিয়ে চলি সূর্য ওঠার আগেই। টাশীডিঙ মাঝারি ধরনের গ্রাম। পাহাড়ের ঢালু অংশ জুড়ে ধানক্ষেতে, বড় এলাচের ক্ষেত। স্লেটপাথরে ছাওয়া ছোট ছোট ঘর আর অধিকাংশ বাড়িতে কমলালেবু গাছ। ছোট বাজারের মতো রয়েছে টাশীডিঙে, সেখানে গুটি তিনেক দোকানে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য, চাল ডাল তেল মসলা থেকে শুরু করে জামা-জুতো, সৌখীন সুগন্ধি দ্রব্য, টর্চলাইট, বিড়ি-সিগারেট, বিস্কুট-লজেন্স সবই আছে। দোকানীরা নেপালের অধিবাসী। তারা মোটামুটিভাবে স্ত্রীপুত্র নিয়ে রয়েছে এখানেই। কাছেই গুটিকয়েক চা ও খাবারের দোকান। খাবারের দোকানের সঙ্গে লাগোয়া মদের দোকানও। সেখানে সন্ধ্যা হতেই নরনারীর ভিড়। হাসি হুল্লোড়, জড়িত কণ্ঠ, অসংলগ্ন কথা। ধর্মরাজের রাজ্যে এ এক আরেক চিত্র। পথ চলতে চলতে টাশীডিঙের ঢালু জমিতে দেখি অজস্র বড় এলাচের গাছ। গাছগুলো দেখতে অনেকটা হলুদ গাছের মতো। গাছের গোড়ায় বড় এলাচ অনেকটা চীনাবাদামের মতো জন্মে। এই বড় এলাচ বড় হয়, পুষ্ট হয়। তার পর সেগুলোকে তুলে রোদে ঝরঝরে করে শুকিয়ে রাখা হয় ঘরে।

সেই শুকনো এলাচ পরে চলে আসে দার্জিলিঙের বাজারে। টাশীডিঙ থেকে ইয়ক্সামের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। পথ আদৌ ভাল নয়, তাই আগেই রওনা হতে হয়েছিল আমাদের। মাইল খানেক পথ ধানক্ষেত আর পাইন গাছের বনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতেই লক্ষ্য করি, চারপাশ থেকে কুয়াশার ঘন আবরণ আমাদের যেন ঘিরে ফেলেছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পায়ে চলা। পথ পাহাড়ের ঢালু গায়ে ধানের ক্ষেত ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে র‍্যাথঙ নদীর তটভূমি পর্যন্ত। টাশীডিঙ থেকে পায়ে চলা পথ নেমে গিয়েছে র‍্যাথঙ নদীর তটভূমিতে। সেখানে ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে উঠে গিয়েছে পেমিওঙচিতে। পেমিওঙচির পাহাড় গম্বুজাকৃতি। ঐ পাহাড়ের শীর্ষদেশে সিকিমের প্রাচীন রাজধানী পেমিওঙচি। ওখানে সিকিমের সবচাইতে বড় বৌদ্ধমঠ ও মন্দির আছে। একই গিরিশিরায় অবস্থিত সিকিমের সব চাইতে প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ সাঙাছোলিঙ্।

ধীরে ধীরে কুয়াশা গাঢ় হতে গাঢ়তর হতে থাকে। কোন্ এক অদৃশ্য মায়াবলে সমস্ত নীল আকাশ ছেয়ে যায় গাঢ় মেঘে। বাড়তি মেঘ যেন আকাশে ঠাঁই না পেয়ে নেমে আসে মর্তে। পাইন, ওয়ালনাট ও শালগাছের গভীর বনের খাঁজে খাঁজে পেঁজা তুলোর মতো জমতে শুরু করে ধীরে ধীরে।

আরও কিছু দূর যেতে না যেতে বৃষ্টি শুরু হয়, তার পরই ঝড়ো হাওয়া। প্রকৃতির এই আকস্মিক নির্দয় আচরণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ার আর বৃষ্টির ঝাপটায় পথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে শুরু করে। চারদিক থেকে ক্লান্তি যেন দুর্বহ বোঝার মতো চেপে ধরে সৌন্দর্যপিপাসু মনকে। পা দুটো যেন আর চলতে চায় না। ভাবি, কেমন করে সুদূর অতীতে এদেশের অধিবাসী এসেছিল নতুন ঘর বাঁধতে। তাদের তো সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে এড়িয়ে আসতে হয়েছিল।

পথে একবার বেরিয়ে পড়লে বোধহয় পথ না চলে উপায় থাকে

না। তাই এগিয়ে চলি পায়ে চলা পথ ধরে। কিছুদূর যাবার পরই পথের নিশানা হারিয়ে যায় গভীর বনের মধ্যে। উৎকট চড়াই, প্রচণ্ড বর্ষণে পিচ্ছিল। গাছের শিকড় আর ঝোপঝাড় ধরে এগিয়ে যেতে থাকি। পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে আসা ছোট ছোট ঝরনা, যেগুলো প্রখর সূর্যতাপে ঝিমিয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ বর্ষণের জাদুস্পর্শে মহানন্দে ফুলে ফেঁপে বিচিত্র কলরোলে শুরু করেছে বইতে। পথের মাঝে এই শীতল জলপ্রবাহ পেরুতে গিয়ে থমকে যাই। স্যাঁতসেঁতে পাথর আর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে লেগে রয়েছে অজস্র ছোট ছোট জোঁক। ওরা যেন শুঁড় উঁচিয়ে বাতাসের গন্ধ শুকছে। মানুষের দেহের গন্ধ পেয়েই তারা সজাগ হয়ে তৈরি হয়ে যায় আক্রমণের জন্য। তারপর কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে হাতে এসে ধরে, পায়ের মোজার ভেতর ঢুকে পড়ে সন্তর্পণে। শরীরের আক্রান্ত স্থানে মুখ বসিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম একপ্রকার তরল পদার্থ ঢেলে দেয়। যার জন্য আক্রান্ত স্থান সাময়িকভাবে অসাড় হয়ে যায়। একবার জোঁক ধরলে যতক্ষণ রক্ত চুষে তৃপ্ত না হয় ততক্ষণ আর ছাড়ে না। জোর করে টেনে ছাড়ালে, ওদের রক্তমোক্ষণের সূক্ষ্ম যন্ত্র ছিঁড়ে আটকে থাকে চামড়ার মধ্যে। সেজন্য আক্রান্তস্থান ফুলে ওঠে, একরকম কষ্টদায়ক চুলকানির সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও জোঁক রক্ত চুষবার সময় রক্তের মধ্যে একপ্রকার তরল পদার্থ মিশিয়ে দেয়। যে জন্য রক্ত সহজে জমাট বাঁধতে পারে না। ফলে জোঁক ছেড়ে গেলেও আক্রান্ত স্থান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়তে থাকে। টাশীডিঙ ছাড়াতে না ছাড়াতেই জোঁকের এলাকা শুরু হয়। জোঁক সব চাইতে বেশী ইয়ক্সাম ও তার সাত মাইল এগিয়ে।

টাশীডিঙ্ থেকে ইয়ক্সাম দীর্ঘ পথ ও কষ্টসাধ্য। তবে সমস্ত পথটাই আয়াস সাধ্য নয়। প্রথম মাইল তিনেক পথ পাইন শাল আর চির গাছের ভিতর দিয়ে। পাহাড়ের পাদদেশে টেরেস কাল্টিভেসন। কোথাও ঢালু পাহাড়ের কোলে অজস্র বড় এলাচের ক্ষেত।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল অর্ধেক পথ যেতেই। ততক্ষণে আমরা সবাই ভিজে গিয়েছি। প্রথম মাইল তিনেক পথ যেমন চড়াই, পরের মাইল চারেক পথ তেমন সমতল উপত্যকা দিয়ে। পথের দুধারে ঘরবাড়ি দেখলে বাঙলাদেশের গ্রামের কথাই মনে হবে। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া সবজির বাগান। কাছেই কয়েকটা ছোট দোকান, সেখানে রয়েছে চাল, ডাল, নুন, তেল, মসলা। সেখানে ট্রানজিস্টার রেডিও বেজে চলে সর্বক্ষণ। দোকানের সামনে স্থানীয় অধিবাসীরা ভিড় করে। সিকিমের পুরুষেরা মেয়েদের মতো অত কর্মঠ নয়। কোনো স্থানে কোনো বৈচিত্র্যের সন্ধান পেলেই বসে যায় সব কিছু ভুলে। মেয়েরা একাধারে সুগৃহিণী, অন্যদিকে মাঠে ঘাটেও কাজ করে। রেডিওতে ফিল্মী গান শোনার নেশা দেখে, গানের সুর আর কথার তারিফ করা দেখে অবাক হতে হয়। মাত্র চারশত বৎসর পূর্বেও এদেশে সভ্যতার আলো প্রবেশ করে নি। পথের শেষ দুই মাইল শুধু চড়াই। চড়াই শুরু হবার মাইলখানেক আগেই পাহাড়ের গায়ে খানিকটা উঁচুতে দেখি প্রাচীন চোর্তেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটা বেশ ভগ্ন।

চড়াইয়ের গোড়ার দিকে সুদৃশ্য ঝরনা। ঝরনার ধারে বিশ্রাম করে পথচারীরা। কিন্তু পথের শেষে চড়াই বুঝি শেষ হতে চায় না কিছুতেই। পথের কোথাও শেষ নেই। নিবিড় অরণ্যের মধ্যেও হারিয়ে যায় না পথের রেখা। অথচ মানুষের পায়ে চলা পথের রেখার চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্য প্রকৃতির কতই না কলাকৌশল। প্রকৃতি তার এক্তিয়ারের মধ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ বরদাস্ত করতে চায় না। মানুষও এগিয়ে যেতে চায় সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে। এই নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড বজ্র নির্ঘোষে পথের রেখা মুছে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে।

ইয়ক্‌সাম পৌঁছতে বেলা একটা বেজে যায়। মাথার ওপরে সূর্যিদেব নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ। কিছু আগেই বৃষ্টি হওয়ার চিহ্ন

আকাশে বাতাসে। মর্তের মৃত্তিকা সিক্ত, গাছপালার বর্ষণসিক্ত গায়ে গায়ে খয়েরী রঙের জোঁকগুলো সপরিবারে অপেক্ষমান। বাতাসে রক্তের গন্ধ পেয়ে ওরা সজাগ। এর ভেতর দিয়েই এগিয়ে যাই সন্তর্পণে। বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে আর ধানক্ষেতের পাশ কাটিয়ে পায়ে চলা পথ এগিয়ে গিয়েছে ইয়ক্‌সাম। ছবির মতো সুন্দর গ্রাম, দূরে দূরে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ, সবুজ আর লাল রঙের কমলালেবু ধরে আছে গাছ ভর্তি হয়ে। ছোট ছোট স্লেটপাথরে ছাওয়া ঘরের ওপরে রয়েছে ফলভারে নুইয়ে পড়া নাসপাতি গাছ। পথের ধারে চেরী গাছ, তার ডালে পাতা নেই একটাও। শুধু বেগুনী রঙের থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। দূরে দীর্ঘ পাইন আর দেওদার গাছ কটা দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। এমন সুন্দর গ্রাম সিকিমের অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। র‍্যাথঙ নদীর উপত্যকায় এই গ্রাম দার্জিলিঙ থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে। হাঁটা পথে মাত্র চারদিনের পথ। সবুজ বনানীতে ছাওয়া গিরি প্রাচীর ইয়ক্‌সামকে তিনদিক থেকে রেখেছে ঘিরে। উত্তর-পশ্চিম দিকে সুউচ্চ গিরিশিরার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তুষারধবল কাব্রু গিরিশিখর। সিকিমীদের কাছে এই গিরিশিখর অত্যন্ত পবিত্র। দক্ষিণ-পূর্ব দিকটা অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত। সূর্যের প্রথম রশ্মি তাই গ্রামের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আলোয় আলোয় ঝলমল করে ওঠে সোনালী ধানের ক্ষেত আর সবুজ বনানী। এই দিকটা হঠাৎ ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে অনেক নিচে। সেখানে গিরিখাত বেয়ে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে র‍্যাথঙ চ্যু। র‍্যাথঙ চ্যুর পশ্চিমে পেমিওঙচির গম্বুজাকৃতি গিরিশিখর। ওপরে প্রশস্ত স্থানে অবস্থিত পেমিওঙচির সুদৃশ্য মন্দির ও বৌদ্ধবিহার।

ইয়ক্‌সামের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৫৬০০ ফুট। ইয়ক্‌সামের উত্তর-পূর্বে পণ্ডহুঙরী গিরিশিরার একাংশ। এই গিরিশিরার ওপরে প্রশস্ত অংশে ইয়কসামের প্রাচীন মন্দির ডুবদি। ফলে ফুলে

সাজানো এই ছোট্ট গ্রামটির একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সুপেয় জলের ঝরনা। তার পাশেই সুদৃশ্য সরোবর নামে কাতক পোখরী। সিকিমের রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এই সরোবরের তীরেই জন্মলাভ করেছিল। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র চারশ' বৎসর আগের কথা। সে অতীতের ইতিহাস আজ সিকিমীদের ঘরে ঘরে রূপকথা হয়ে বিরাজ করছে। অতীতের সেই ইয়ক্‌সামের এ পরিচয় হয়তো বা ছিল না। আজকের পরিচয়ের লিপি অনেক ইতিহাস আর ইতিকথায় ভারাক্রান্ত হলেও, এ কাহিনী সত্য যে একদিন সন্ধ্যার নিষ্প্রভ আলোয় গাঢ় কুয়াশায় ঘেরা এই ইয়ক্‌সামের পথে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসেছিলেন সুদূর তিব্বত থেকে। তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথ, দুর্গম গিরিশিরা পেরিয়ে তিনি এসেছিলেন এই নতুন দেশে। তখন এদেশের আদি বাসিন্দাদের কোনো ধর্ম ছিল না, রাজা ছিল না। জন্ম, মৃত্যু আর আবাল্যের সঙ্গী এই দুর্গম গিরি-পর্বত, যারা সময়ে অসময়ে তুষার ঝড় বইয়ে দেয়, আকাশের মেঘকে মর্তে ডেকে নিয়ে আসে, রুক্ষ পাথর আর মাটির বুক সরস করে দেয়, তারাই তখনকার দিনে দেবতার আসন দখল করে বসেছিল। স্বর্গ ও নরক এসে বাসা বেঁধেছিল এই তুষার ঝড় আর বরফের ভেতরেই। এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসেছিলেন সেদিন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে জ্ঞানের বর্তিকা নিয়ে। সিকিমের ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়েছিলেন তিনি, ধর্ম আর জ্ঞানের আলো। তাঁর নাম আজ সিকিমের ঘরে ঘরে ছড়ানো। তার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বৌদ্ধমন্দিরে। ডুবদির বৌদ্ধমন্দিরে তার মূর্তির সামনে প্রতিদিন সুগন্ধি দ্রব্য পোড়ানো হয়, তার পুজো হয় পরম শ্রদ্ধাভরে। তিনি আজকের সিকিমের জনক লাহ্বছেন ছেম্বু।

লাহ্বছেন ছেম্বু কিন্তু প্রকৃত নাম নয়। আসলে ওটি তাঁর উপাধি। এই উপাধির অর্থ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঈশ্বর। লাহ্বছেন ছেম্বুর প্রকৃত নাম কুনজান নামগিয়াল। এ ছাড়াও তিনি লাহ্বছেন

নামখা জিগ্‌মে নামে পরিচিত। এই নামের অর্থ সর্ব শক্তিসম্পন্ন দেবতা, যিনি আকাশকে ভয় করেন না। এই নামের পেছনে হয়তো তাঁর ঐশী শক্তিবলে শূন্যে বিচরণ করবার ক্ষমতার ইঙ্গিত রয়েছে।

তিব্বতে যাবার পথে গুরু রিম্পোচে কোনো একসময় নাকি এসেছিলেন এদেশে। ফলে ফুলে সজ্জিত এই অপূর্ব দেশের সৌন্দর্যে তিনি হয়তো মুগ্ধ হয়েছিলেন। চারপাশে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো উত্তুঙ্গ গিরিশিরা, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তুষারশুভ্র গিরিশিখর। সূর্যের প্রথম রশ্মিতে যেন সোনা ঝরে পড়ে। সুপেয় জলের ঝরনা, কাকচক্ষু সরোবর, সবকিছু মিলিয়ে এমন স্বপ্নরাজ্য, কিন্তু কি আশ্চর্য! গুরু রিম্পোচে অবাক হয়েছিলেন সেদিন, এই রাজ্যের রাজা কোথায়? এই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নি কেন? এই রোগ-শোক জরা-মৃত্যুর অত্যাচারে নির্যাতিত অসহায় মানুষদের মুক্তির পথের সন্ধান দিতে আসে নি কেউ? গুরু রিম্পোচের মনের অনেক কৌতূহল। অনেক জিজ্ঞাসা হয়তো বা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল সেদিন। তিনি হয়তো বা ভেবেছিলেন ধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা, রাজধর্ম স্থাপনের কথা। তিনি অনেক ভেবেছিলেন। তিব্বতে ফিরে গিয়েও তাঁর ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে নি।

তারপর, একদিন তিনি প্রজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন, চারদিক থেকে চারজন প্রখ্যাত লামা মিলিত হবেন এই স্বপ্ন রাজ্যের কোনো এক পবিত্রতম স্থানে। তাঁদের মিলনের শুভ মহাক্ষণে ধর্ম সংস্থাপিত হবে। এই চারজন লামার একজন গ্রহণ করবেন এই নতুন ঘরের রাজ্য পরিচালনার ভার। প্রজ্ঞার দ্বারা লব্ধ এই নির্দেশ তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন তিব্বতের এক মঠের গুহায় ভবিষ্যৎ পথিকৃতদের আশায়।

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছিল। কালের হিসাবে আনুমানিক নয়শত বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দি'কের কোনো এক সময় গুরু রিম্পোচের এই উপলব্ধ জ্ঞানের নির্দেশনামার মর্মোদ্ধার করেছিলেন প্রখ্যাত লামা লাহ্বছেন ছেম্বু। তিনি গুরু রিম্পোচের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন ঘরের সন্ধানে বার হবার মনস্থ করেন।

লাহ্বছেন ছেম্বু তিব্বতের সাম্পো বা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কঙবোর অধিবাসী। জলবায়ু ও পরিবেশ অনুযায়ী কঙ্‌বো প্রায় সিকিমেরই অনুরূপ। আনুমানিক ১৫৯৫ সনে তিনি সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘকাল বিভিন্ন মঠে অতিবাহিত করে তিনি সমগ্র তিব্বত পরিভ্রমণ করেছিলেন। অবশেষে তিনি যান তিব্বতের রাজধানী লাসায়। তিনি কঠোর ও একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধলাভ করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নত স্তরের অধিকারী হয়েছিলেন। তাই তাঁর খ্যাতি সমগ্র তিব্বতে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিনি তাঁর সমকালীন লামাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের শুরুতে তিব্বতে লামাতন্ত্রের পরিপূর্ণতা এসেছিল। সেখান থেকে এই ধর্ম বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে। ঠিক সেই সময় দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতের গিয়ালা মঠের প্রখ্যাত লামা নাকগোয়াঙের কাছেও লাহ্বছেন ছেম্বুর খ্যাতির সৌরভ পৌঁছেছিল। পরে নাকগোয়াঙই গিয়ালবু নাকগোয়াঙ্‌ নামে তিব্বতের দালাই লামার পদে অধিষ্ঠিত হন। লাহ্বছেন ছেম্বু তাঁর কাছে যথোচিত সাহায্য ও সমাদর পেয়েছিলেন।

তিব্বত থেকে লাহ্বছেন ছেম্বু বেরিয়ে পড়েছিলেন হিমালয়ের পথে। গুরু রিম্পোচের ভবিষ্যদ্বাণীর ভেতরে নতুন দেশের পথের নির্দেশও ছিল। সেই সঙ্গে ছিল এই পথে কাম্পাকোরবাঙ্‌ (কাব্রু) গিরিশিরার সন্নিকটবর্তী পর্বতগুহার বর্ণনা। লাহ্বছেন ছেম্বু পশ্চিম তিব্বত থেকে নেপালে প্রবেশ করেছিলেন সিকিমে। সেখান থেকে

কাঙ্‌লা নাঙ্‌মা গিরিপথ পেরিয়ে প্রবেশ করেছিলেন সিকিমে। কিন্তু এ পর্যন্ত এসেই তিনি কাম্পাকোরবাঙ্‌ বা কাব্রু গিরিশিখরের গিরিশিরার পাদদেশে অবস্থিত পবিত্র গুহায় উপস্থিত হতে পারেন না সহজভাবে। সেই গুহার নাম ছে চেন ফু। সেখানে গুরু রিম্পোচে কিছুকাল বাস করে গেছেন। পবিত্র গুহায় উপস্থিত হবার জন্য লাহ্বছেন ছেম্বুকে তাঁর অসাধারণ যোগবলের সাহায্য নিতে হয়। যোগবলে তিনি কাব্রুর সুউচ্চ গিরিশিরা অতিক্রম করে এসে হাজির হয়েছিলেন জোংরীর কাছে। সেখান থেকে তিনি এসে হাজির হন কাবুড় গিরিশিখরের পাদদেশে অবস্থিত গুহার কাছে। তারপর শিঙা বাজিয়ে বাজিয়ে দুই সপ্তাহ ধরে দুর্গম পথ পেরিয়ে আসেন জোংরীতে। জোংরীতে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন দুজন অনুচরের। এই অনুচর দুজন তাকে মন লেপচা হয়ে প্রেগিয়ালটাক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। প্রেগিয়ালটাকে এক রাত্রি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থেকে পরদিন বাকিমের কাছে অপদেবতাদের সমস্ত শক্তিকে তুচ্ছ করে, বাকিম হয়ে হাজির হন নরবুগাঙ্‌।

নরবুগাঙে লাহ্বছেন ছেম্বুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় আরও দুজন লামার। তাঁরা কাতক লামা বা রিগজিন ছেম্বু ও নাগদা পা সম্প্রদায়ের শেম্পা ছেম্বু।

রিগজিন ছেম্বু ও লাহ্বছেন ছেম্বুর মতো কাঙলা নাঙ্‌মা গিরিপথ পেরিয়ে পথ খুঁজতে খুঁজতে প্রবেশ করেছিলেন সিকিমে। সেই সময় তিনিও জোংরীর কাছে কাবুড়ের পাদদেশে ছে চেন ফুতে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই, সন্ন্যাসী তাকে জানিয়েছিলেন যে উত্তরদিক দিয়ে সিকিমে প্রবেশ পথ খুঁজে বার করার কাজ তাঁর জন্য নয়। তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে পশ্চিমদিক দিয়ে প্রবেশ পথ। রিগজিন ছেম্বু তাই পশ্চিম দিকের সিংগালি লা হয়ে প্রবেশ করেছিলেন সিকিমে। সেখান থেকে হাজির হয়েছিলেন নরবুগাঙ।

ঠিক একই সময়ে শেম্পা ছেম্বু, দক্ষিণদিকের পথ উন্মুক্ত করে দার্জিলিঙ থেকে নামচে হয়ে প্রবেশ করেছিলেন সিকিমে। তারপর দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছিলেন নরবুগাঙ। এইরূপে তিনজন লামা প্রায় একই সময়ে তিনদিক থেকে এসে যেখানে মিলিত হয়েছিলেন, সে স্থানের নামকরণ হয়েছিল ইয়ক্‌সাম। ইয়ক্‌ অর্থ তিন, সাম অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনদিক থেকে আসা তিনজন লামা এসে মিলিত হয়েছিলেন এই গ্রামে। তাই এই গ্রামের নাম ইয়ক্‌সাম।

দশ

ইয়ক্‌সামের নীল আকাশ সন্ধ্যার অন্ধকারে ম্লান হয়ে যায়। জ্বল-জ্বলে সাঁঝ তারাটি দেখি পাইন আর দেওদার গাছের মাথার ওপরে। শুধু আকাশের বুকে ছিল মেঘের আনাগোনা। তারাগুলো বুঝি ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। তারপর একসময় মেঘের দল কৈলাস, অলকাপুরী আর রামগিরি যাওয়া আসা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঝরে পড়েছিল ইয়ক্‌সামের বুকে। শীর্ণ ঝরনাধারা প্রাণ ফিরে পায় যেন। শুকনো মাটির বুক নরম হয়। কচি কচি ঘাসের ডগায় হাজার হাজার জোঁকেরা মহানন্দে বাতাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মহানন্দে কিলবিল করতে শুরু করে। একদিকে সবুজের মহাসমারোহ অপরদিকে সৌন্দর্য উপভোগের দর্শনীয় আয়োজন কেমন এক অস্বস্তি, অথচ অদ্ভুত এক আনন্দময়তা।

লোবসাঙ বলে, দাজু, জোঁক দেখে তোমরা এত ভয় পাও কেন? দেখ তাকিয়ে, আমাদের ঘরের মেয়েরা কেমন মাঠে কাজ করছে নিশ্চিন্তে। জল বয়ে আনছে ঝরনা থেকে। জোঁক ওদের ধরে, তোমাদের দেশে মশা যেমন ঠিক তেমনি।

লোবসাঙের কথা মিথ্যে নয়। ঝরনা থেকে জল বয়ে নিয়ে আসা মেয়েদের দেখি ধব্‌ধবে ফরসা, পুষ্ট হৃপা দিয়ে বেয়ে পড়ছে টক্‌টকে রক্তের ধারা। ওদের যেন লক্ষ্যই নেই সেদিকে। লোবসাঙ হাসে জোঁক যখন বেশী হবে, তখন আমাদের মহানন্দ।

আমি আঁতকে উঠি, বলে কি লোকটা? লোবসাঙের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। লোবসাঙ বলে, তখন আমরা ভাবি এবার বুঝি ভাল ফসল হবে!

চোখের সামনে চিত্রটা যেন ভেসে ওঠে। কচি ধানের সবুজ পাতার গায়ে অসংখ্য চট্‌চটে ঐ জোঁক গাছের পাতায়, বাগানে বাগানে সবজির পাতায় জোঁকেদের মিছিল। কিন্তু ওরা তো নিরামিষাশী নয় যে গাছের পাতার রস খেয়ে বাঁচবে। ওদের দেহ নিঃসৃত যা কিছু তাই একমাত্র জমিতে সারের কাজে আসতে পারে। তার পরিমাণও তো তুচ্ছ। লোবসাঙের বক্তব্যের পেছনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা ভাবি। লোবসাঙ হয়তো বা এর বৈজ্ঞানিক কার্য কারণের খবর জানে না বা জানবার চেষ্টাও করে নি। আমার মনে কিন্তু সন্দেহের ছায়া দূর হয় না।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন চেহারা লোবসাঙের। ইয়ক্‌সামের স্কুলের শিক্ষক। এই নতুন ঘরেরই সে বাসিন্দা। তার ইস্কুল দেখেছি, নতুন টিনের শেড দিয়ে বানানো দোচালা ঘর। ঘরের বারান্দায় সিকিমের জঙ্গল থেকে সংগৃহীত অর্কিড গাছ ঝুলছে। স্কুলের সামনে স্বল্প পরিসর বাগানে নানা রঙের জিনিয়া ও বিভিন্ন আকারের গাঁদাফুল। স্কুলের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা দেখি জন পঞ্চাশেক।

লোবসাঙের কাছে জোঁকের কথা শুনতে গা শিরশির করে। লোবসাঙ বলে জান, দাজু, মে জুন মাসে জোঁকগুলোর অজস্র বাচ্চা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। কেমন করে ছড়িয়ে পড়ে ভাবতে পারো?

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, কেমন করে?

লোবসাঙ বলে, আমাদের ছেলেরা ভেড়ার পাল নিয়ে যায়

ওপারে। ভেড়াগুলো মাঠের ভেতর দিয়ে আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে সমানভাবে। তখন ওদের লোমের ভেতরে আশ্রয় নেয় অসংখ্য জোঁক, ভেড়ার পালের সঙ্গে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অনেক উঁচুতে চলে যায়। তারপর শীতের আগেই যখন ভেড়ার পাল নিয়ে ছেলেরা নেমে আসে নিচে, সেই সঙ্গে ভেড়াগুলোকে আশ্রয় করে জোঁকের দলও নিচে নেমে আসে। কারণ, তুষার সীমায় তুষারের মধ্যে ওরা বাঁচতে পারে না। লোবসাঙকে আমার ভাল লাগে। ফরসা গায়ের রঙ, মঙ্গোলীয়ান রক্ত, চোখ দুটো ছোট ছোট, ভ্রূ নজরে পড়ে না। মুখে দাড়িগোঁফের চিহ্ন মাত্র আছে। সর্বদা হাসি মুখ, অথচ লাজুক স্বভাব। স্কুলের প্রায় কাছেই তাঁর বাড়ি।

সেদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর গাঢ় কুয়াশার মধ্যে লোবসাঙ আমাকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি বলতে কাঠের মাচার ওপরে ঘর, ওপরে কাঠ ও স্লেট পাথরের ছাউনি। নিচে মাটিতে গুটি কয়েক গরু, শূকর ও মুরগী। ঘরের চালে ফলভারে নুইয়ে পড়া নাসপাতি গাছ। গাছে অজস্র বড় বড় নাসপাতি। এই নাসপাতির মতো বড় আকারের নাসপাতি কখনও দেখি নি। এক একটি নাসপাতি পাঁচশ' গ্রামেরও বেশী ওজন। নাসপাতি গাছের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরুফল গাছ। এই গাছ আমি গঙ্গোত্রী অঞ্চলে চীরবাসার কাছাকাছি দেখেছি প্রচুর। আরু ফলকে পীচফলের ছোট সংস্করণ বলা যেতে পারে। স্বাদে প্রায় পীচ ফলের মতোই। তবে আরুফলের সবচাইতে আকর্ষণীয় তার বীজ। এই বীজের শক্ত খোলা ফাটালে যে শাঁস মিলবে, সেই শাঁসকে কাগজিবাদাম বলা হয়। নাসপাতির লোভে লোভে জোঁকের ভয় তুচ্ছ করে হাজির হই লোবসাঙের বাড়ি। ঘরে ঢুকতেই দেখি ধোঁয়ায় ঘরটি প্রায় ভর্তি। লোবসাঙের বোন পেমা যত্ন করে বসায় মেঝেয় হাতে তৈরি পশমের গালিচার ওপরে।

ঋষির হোটেলের সেই মেয়েটির তুলনায় পেমা অনেক সুন্দরী,

তবে অতটা স্বাস্থ্যবতী নয়। কেমন যেন নিষ্প্রভ। সিকিমী মেয়েদের মধ্যে মোটামুটি সুন্দরী মেয়ের সাক্ষাৎ মেলে। মেয়েরা সাধারণত স্বাস্থ্যবতী, হাজার দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাদের চোখে মুখে হাসি লেগে থাকে। পেমার দিকে তাকিয়ে দেখি। তার বিবাহ হয়েছে। বয়স কতই বা হবে দেহে অপুষ্টির দরুন কেমন যেন নিষ্প্রভ মনে হয়। সিকিমের বিবাহিতা মেয়েদের কোমরে একরকম হাতে বোনা মোটা কাপড়ের বিচিত্র বর্ণের বন্ধনী থাকে। এ ছাড়া এয়োতির আর কোনো চিহ্নই থাকে না। সিকিমে বহু বিবাহ বা একজন স্ত্রীর বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা নেই।

লোবসাঙ বলে, দাজু, রক্সি আনতে বলব, না তুম্বা?

রক্সি ও তুম্বা দুই সিকিমী মদ। রক্সি ঘাসের বীজ, কমলালেবুর রস পচিয়ে পরে চোলাই করে তৈরি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি সিকিমের দেশী মদ।

তুম্বা মাদকতাপূর্ণ পানীয় হলেও এর মাদকতা অনেক কম। সাধারণত ঘাসের বীজ থেঁতো করে পচানো ও ফারমেণ্টেড করা হয়। সেই ফারমেণ্টেড ঘাসের বীজ বাঁশের খোলে ভর্তি করে তার মধ্যে ফুটন্ত জল ঢেলে দেওয়া হয়। বাঁশের খোলের মধ্যে একটা কঞ্চি ডুবিয়ে আস্তে আস্তে চুষতে হয়। খুবই মৃদু ধরনের মাদকতা পূর্ণ পানীয় তুম্বা স্থানীয় জলবায়ু অনুযায়ী স্বাস্থ্যপ্রদ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারী ও হজম শক্তির সহায়ক। কোনো অতিথি-অভ্যাগত এলে এরা চা না দিয়ে তুম্বাপূর্ণ বাঁশের খোল এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়ন করে। পয়সার বিনিময়েও তুম্বা মেলে। একবারের পানীয়ের মোটামুটি দাম পঞ্চাশ পয়সা। অন্তত পক্ষে দুই তিনটি তুম্বা পান করলে মোটামুটি নেশা হয়।

সিকিমে মদ্য পান আদৌ নিন্দনীয় নয়। তাই নারী পুরুষ নির্বিশেষে একসঙ্গে বসে তুম্বা পান করে। তুম্বার স্বাদ কিছুটা অম্ল স্বাদযুক্ত, ঝাঁজালো, একটু গন্ধযুক্ত। অনভ্যস্তদের কাছে এ গন্ধ অত্যন্ত

খারাপ লাগবে। তুম্বার সঙ্গে ভুট্টা ভাজা, ডিম ভাজা ইত্যাদি খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে।

পেমা কিছু সময়ের মধ্যেই আমাদের সামনে বাঁশের খোল, কঞ্চি আর ফুটন্ত জলের কেটলি নামিয়ে দেয়। বাঁশের খোলের মধ্যে ফারমেণ্টেড ঘাসের বীজ থেঁতলানো। পেমা কেটলি থেকে ফুটন্ত জল ঢেলে কঞ্চি দিয়ে বেশ করে নাড়িয়ে এক এক করে এগিয়ে দেয় আমার ও লোবসাঙের দিকে। আমাদের সামনেই একটা পাত্রে এনে দেয় তেল মাখানো ভুট্টা ভাজা ও কাঁচা লঙ্কা। দিশী মদের সঙ্গে যেমন আনুসঙ্গিক খাবার উপকরণ থাকে, অনেকটা সেই রকম। আতিথেয়তার মান রাখবার জন্য আর কতকটা লোবসাঙকে তুষ্ট করবার জন্য প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে তুম্বা পান করি। বাইরে তখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বেশ শীতল হাওয়া। একটা ঠাণ্ডার আমেজ চারধারে। লোবসাঙের ঘরে দেখি গুটিকয়েক বাচ্চা ছেলে প্রায় অর্ধনগ্ন। শীতে তারা কাতর, অদূরেই রান্নার স্থানে একটি টিনের পাত্রে কাঠের আগুন রাখা হয়েছে। তার চারপাশে আরও জনকয়েক ছেলেমেয়ে। ঠাণ্ডায় তাদের নাক দিয়ে জল ঝরছে। লোবসাঙের চোখদুটি ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। লোবসাঙ বেশ ভরাট গলায় বলতে শুরু করে ইয়ক্সামের কাহিনী।

লোবসাঙ বলে, দাজু, ইয়ক্সাম পবিত্র স্থান। সিকিমের রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের জন্মস্থান। শুনেছি ডুপকা সম্প্রদায়ের তিনজন লামা, খাদেম পা সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য নাকি তিব্বত ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন নতুন ঘরের সন্ধানে। তারা গুরু রিম্পোচের ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম অনুযায়ী এই দেশের দিকে এসেছিলেন বিভিন্ন দিক দিয়ে। তারপর তুষারময় গিরিপথ দুর্গম গিরিশিরা পেরিয়ে এসে মিলিত হয়েছিলেন ইয়ক্সামে। সিকিমে ধর্ম ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস মাত্র সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি।

লোবসাঙ জানায়, লাহ্বছেন ছেম্বুর সিকিমে উপস্থিতির পর

থেকেই গুরু সিকিমের ধর্ম প্রতিষ্ঠার। সে সময় তিব্বতে লামাতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মধ্য এসিয়ায়।

ইয়ক্‌সামে লাহ্বছেন ছেম্বু মিলিত হয়েছিলেন রিগজিন ছেম্বু ও শেম্পা ছেম্বুর সঙ্গে। লাহ্বছেন ছেম্বু বলেছিলেন গুরু রিম্পোচের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। তাঁদের এই সম্মেলনের কথাও লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা গুরু রিম্পোচে সেই সুদূর অতীতে। সেদিন নরবুগাঙে আজকের মতো দীর্ঘ চোর্তেন গড়ে ওঠে নি। লোকালয় থেকে একটু দূরে পাইন আর দেওদার গাছের ঘন ছায়ায় সন্ধ্যারদীপালোকে লাহ্বছেন ছেম্বু সেদিন বলেছিলেন হয়তো, বন্ধুগণ, আমরা বহুদূর থেকে দুর্গম গিরিশিখর আর তুষারময় রাজ্য পেরিয়ে এসে মিলিত হয়েছি গুরু রিম্পোচের ইচ্ছানুযায়ী। আমাদের এই মিলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের এই মিলনের উদ্দেশ্য এই স্বপ্নময় দেশে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ও ধর্ম সংস্থাপন। এদেশের মানুষ রোগ-শোক জরা-মৃত্যুর নির্যাতনে নির্যাতিত। তাঁদের মহামুক্তির জন্য নির্দেশিত পথ আমাদের দেখাতে হবে। তাদের কাছে এনে দিতে হবে অমৃতময় স্বর্গের সন্ধান। আমরা গুরু রিম্পোচের নির্দেশ অনুযায়ী এদেশের পূর্ণতা সাধন করব। কিন্তু বন্ধুগণ, সে এক বিরাট দায়িত্ব, দুর্বহভার। এদেশকে গুরুর ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তোলার ভার আমাদের মধ্য থেকেই কাউকে নিতে হবে।

লাহ্বছেন ছেম্বুর বক্তব্য শুনে রিগজিন ছেম্বু বালছিলেন—বন্ধুগণ, আমি প্রখ্যাত নাগদা পা সম্প্রদায়ের লামা। আমার ধমনীতে বইছে রাজরক্ত। কারণ আমি তিব্বতের শাসনকর্তা নাগদা পা নামগিয়ালের বংশধর। এই রাজ্যের রাজা হবার যোগ্যতা আমার আছে। এদেশকে গুরুর ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তোলবার দুরূহ ভার আমি গ্রহণ করতে পারি।

রিগজিন ছেম্বুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন লাহ্বছেন ছেম্বু। তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুবার আগেই শেম্পা বলেছিলেন—বন্ধুগণ, আমিও রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। সুতরাং রাজা হবার

যোগ্যতা আমারও রয়েছে। তোমরা আমাকে এ রাজ্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠার দুরূহ ভারও অর্পণ করতে পার।

এদের দুজনের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনবার পর লাহ্বছেন ছেম্বু বলেছিলেন ধীর কণ্ঠে—বন্ধুগণ, তোমরা এই রাজ্যে রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দুরূহ দায়িত্ব নিতে চাও, এ সত্যি আনন্দের কথা। কিন্তু গুরু রিম্পোচের ভবিষ্যদ্বাণীতে, তাঁর ইচ্ছা কিন্তু অন্য প্রকার। তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, চারদিক থেকে চারজন জ্ঞানী লামা কোনো একদিন একসঙ্গে এসে মিলিত হবে এখানে। এই চারজনের মিলনের ও মতৈক্যের ফলে স্থাপিত হবে রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র।

লাহ্বছেন ছেম্বু বলেছিলেন—আমরা তিনজন লামা মিলিত হয়েছি তিনদিক থেকে। কিন্তু পূর্বদিক থেকে এখন পর্যন্ত আসেন নি কেউ। গুরু রিম্পোচের ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিষ্কার লিপিবদ্ধ আছে ফুণ্টসগ নামে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কথা। পূর্ব তিব্বতের পরাক্রমশালী খাম বংশের বংশধর তিনি। তাঁর বাসস্থান হওয়া উচিত পূর্বদিকে। গুরু রিম্পোচের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আমাদের প্রধান কর্তব্য পূর্বদিকে দূত পাঠিয়ে ফুণ্টসগের অনুসন্ধান করা। সেখানে তাঁর সন্ধান পেলে সাদরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা ইয়ক্‌সামে।

লাহ্বছেন ছেম্বুর প্রস্তাব মেনে নেন রিগজিন ও শেম্পা ছেম্বু। দুজন দূতকে পাঠানো হয় পূর্ব সিকিমে ফুণ্টসগের সন্ধানে। দীর্ঘপথ আর চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে দূত দুজন অবশেষে উপস্থিত হয়েছিল গ্যাঙটকের সন্নিকটে একটি গ্রামে। সেখানে তারা একজন সুদর্শন পুরুষকে দুগ্ধ দোহন করতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। নিকটে উপস্থিত হয়ে তারা অত্যন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল পরিচয়। দুগ্ধ দোহনকারী দূত দুজনকে ইঙ্গিতে উপবেশন করতে অনুরোধ করেন। দুগ্ধদোহন সমাপ্ত হতেই তিনি দূত দুজনকে আপ্যায়িত করেছিলেন দুই পাত্র দুগ্ধ পান করতে দিয়ে। দুগ্ধ পানে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হবার পর সুদর্শন পুরুষ বলেছিলেন—আমার নাম ফুণ্টসগ।

দূত দুজন অভিবাদন করে ফুন্টসগকে প্রখ্যাত লামা লাহ্বছেন ছেম্বুর বার্তা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন ইয়ক্সামে আসবার জন্য। ফুন্টসগ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দূত দুজনের সঙ্গেই নিজ আবাসস্থল পরিত্যাগ করে দীর্ঘ পদযাত্রার পর ইয়ক্সামে হাজির হয়েছিলেন। ইয়ক্সামে সেদিন এক মহা আনন্দের দিন। লাহ্বছেন ছেম্বু ও অপর দুজন লামা ফুন্টসগকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসেছিলেন নরবুগাঙ। চারদিক থেকে চারজন লামার উপস্থিতির সেই পরম পবিত্র মুহূর্তে, লাহ্বছেন ছেম্বু গুরু রিম্পোচের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলেছিলেন সবাইকে। তদনুসারে, ফুন্টসগকে নিকটস্থ কাতক পোখরীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়ে রাজকীয় পোষাকে বিভূষিত করে বসানো হয়েছিল প্রস্তর নির্মিত বেদীর ওপর। অভিষেকের জন্য তাঁকে পরানো হয়েছিল বর্ণাঢ্য রাজকীয় পোষাক। ধর্মগ্রন্থপাঠ করার পর, শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সম্পাদিত হয়েছিল অভিষেক ক্রিয়া। ফুন্টসগকে লাহ্বছেন ছেম্বু তাঁর নিজের শিরোনাম নামগিয়াল নামে ভূষিত করেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁকে ভূষিত করা হয়েছিল চোগিয়াল বা ধর্মরাজ নামে। ফুন্টসগের বয়স তখন আটত্রিশ বৎসর, সেই বৎসরই তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন লামা রূপে। সনটি ছিল ১৬৪১ সন।

সিকিমের প্রথম চোগিয়াল, ফুন্টসগ নামগিয়াল। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাঙটকের সন্নিকটে। রূপকথায় হারিয়ে যাওয়া রাজপুত্রের মতো তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে বসবাস করতেন সেখানে। তাঁকে অন্বেষণ করে নিয়ে এসে বসানো হয়েছিল ইয়ক্সামে বেদীর ওপরে। সমগ্র সিকিমের রাজতন্ত্রের ধারক ও বাহক হিসাবে প্রায় ঊনত্রিশ বৎসর রাজত্ব করে ১৮৭০ সনে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই সিকিমে লামাতন্ত্রের

প্রচার শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধমঠ ও মন্দির স্থাপনের প্রয়াস চলে। তাঁর দেহাবসানের পর সিকিমের প্রথম বৌদ্ধমঠ ও মন্দির স্থাপিত হয় সাঙাছোলিঙে। তার কয়েক বৎসর পরেই বৌদ্ধমঠ স্থাপিত হয় ডুবদিতে, পরে স্থাপিত হয় সিকিমের বৃহত্তম মঠ ও বৌদ্ধ মন্দির পেমিওঙচিতে। এমনি করেই গুরু রিম্পোচের স্বপ্নের দেশে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গুরু রিম্পোচের প্রকৃত নাম পণ্ডিত পদ্মসম্ভব। প্রখ্যাত অভিযাত্রী Maj. Waddell-এর ধারণা, পণ্ডিত পদ্মসম্ভব আদৌ সিকিমে আসেন নি। তিনি ১৮৮৮ সন ও ১৮৯৮ সনে এই অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন, সেই সময় তাঁর গাইড ছিল সিকিমী অভিযাত্রী কিন্‌থুপ। Waddell পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের সিকিম ভ্রমণের কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারে নি। তিনি লিখেছেন—

"The Lamas and laity of Sikkim and Tibet implicitly believe that St. Padma Samvaba, the Founder of Lamaism, visited Sikkim during his journeys in Tibet and its western border lands ; and although he left no convent and erected no buildings, he is said to have hid away in caves many holy books for the use of posterity, and to·have personally consecrated every sacred spot in Sikkim.

The authorities for such beliefs are however, merely the accounts given in the works of the patron saint of Sikkim Lhatsun Chembo, and the fictitious "Hidden revelations" of the tertons asserted that the Guru visited Sikkim a hundred times. Sikkim seems to have been unknown to Tibetans previous to the later half of the 16th. century AD. and Lhatsun's own account of his attempts to enter Sikkim testify to the prevailing ignorance in regard to it, owing to its almost impenetrable mountain and icy barrier.

And the Tan-Yek-Ser-Ten, which gives the fullest account of St. Padma's wanderings and considered the most reliable authority seems to make no mention of Sikkim".

"সিকিম ও তিব্বতের লামা ও তাঁদের অনুগামীদের বদ্ধমূল ধারণা, লামাতন্ত্রের প্রবর্তক পণ্ডিত পদ্মসম্ভব তিব্বতে ও তার পশ্চিম সীমান্তে পর্যটনকালে সিকিম পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি সিকিমে কোনো মঠ বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেননি। সেখানে বিভিন্ন গুহায় অবস্থানকালে প্রাচীন পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ রেখেছিলেন ভাবীকালের মানুষদের জন্য। তিনি সিকিমের প্রতিটি পবিত্র স্থানে বিস্তৃতভাবে ভ্রমণ করেছিলেন।

এই বিশ্বাসের একমাত্র নির্ভরশীল তথ্যের সন্ধান মেলে লাহ্বছেন ছেম্বুর লিখিত বিবরণের মধ্যে। এ ছাড়াও গুপ্ত ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের শতাধিকবার সিকিম ভ্রমণের উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বার্ধ পর্যন্ত তিব্বতীয়দের কাছে সিকিম সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। লাহ্বছেন ছেম্বুর সিকিমে প্রবেশের চেষ্টা সিকিম সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতারই পরিচায়ক। তাঁর বিবরণে উল্লেখ আছে যে—সিকিমের তুষারাবৃত পর্বতমালা, বরফের প্রাচীর প্রবেশের পথে বিরাট বাধা।

তান ইয়েক সারতেন পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের ভ্রমণের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেছেন। এই বিবরণকে অত্যন্ত নির্ভরশীল তথ্য হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এতে কিন্তু কোথাও সিকিমের কোনো উল্লেখ নেই।"

ওয়াডেল সাহেবের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার দায়দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের। তবে এ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য স্মরণ রাখা উচিত হবে। সিকিমের ইতিহাস সৃষ্ট হয়েছে সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকে। কারণ লাহ্বছেন ছেম্বু সেই সময়েই প্রবেশ করেছিলেন সিকিমে তিব্বতের পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে। গুরু পদ্মসম্ভব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে গিয়েছিলেন তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে। তিব্বতে যাবার জন্য তাঁকে নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে যেতে হয়েছিল। ওয়াডেল সাহেবের মতে লাহ্বছেন ছেম্বুর সিকিমে আসার পূর্ব পর্যন্ত তিব্বতীয়রা সিকিম সম্পর্কে জানত না। লাহ্বছেন তাহলে কোন্ তথ্যের সাহায্যে সিকিমের পথে এসেছিলেন, বিশেষ করে তুষারাবৃত

বিপদসঙ্কুল পথ পেরিয়ে? খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্বের সিকিম সম্পর্কে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় নি, সে ক্ষেত্রে পদ্মসম্ভবের যাত্রা পথের সঠিক বিবরণ না থাকাই সম্ভব। এই প্রসঙ্গে গ্যাঙটকে নামগিয়াল ইনস্টিট্যুট অব টিবেটোলজির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে ১৯৫৭ সলের ১০ই ফেব্রুয়ারী এক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত দালাই লামা বলেছেন, Sikkim known as "Bay yul Demo jong" or the "hidden valley of rice" has been a country where the Great Guru Padma Samvaba had sojourned and is hence highly sanctified, a glorious fact, which has found an honourable place in the history of the Dhamma.

এই প্রসঙ্গে সিকিমের বর্তমান চেগিয়ালের ভাষণের অংশও উল্লেখযোগ্য—

Many are the sacred places of Sikkim that bear witness, to this day, to the sojourn of the blessed Padma Samvaba, messenger and carrier of the faith from its birth place in India to the remotest vastness of Tibet.

এগার

ইতিহাস এদেশে নীরব। ঐতিহাসিকও কেউ ছিলেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা তখনকার দিনেও ঘটত। সে ঘটনার স্রোত কঠিন পাথরে অবরুদ্ধ, নয়তো বা বনানীর ঘনান্ধকারে হারিয়ে গেছে। এদেশের পাহাড় তাই কথা বলে। অনেক কথা, রূপকথার মতোই রহস্যময়।

সিকিমের রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র স্থাপনের কাহিনী বুঝি পাহাড়ের গায়ে অদৃশ্য শিলালিপি। এই শিলালিপির হাতছানিতে যাঁরা এসেছিলেন প্রলুব্ধ হয়ে, তাদের সংগৃহীত তথ্যই সিকিমের অতীত ঘটনার ওপর আলোকপাত করেছে।

সিকিমের রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র স্থাপনের প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে তিব্বতের রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। তিব্বতের প্রচালিত ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ থেকেই সুদূর অতীতে প্রচারিত হয়েছিল তিব্বতে।

বুদ্ধদেবের তিরোধানের সামান্য পরেই, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। ফলস্বরূপ শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তাঁদের বলা হত মহাস্থবির ও মহাসাঙ্ঘিক। মহাস্থবির বা থেরবাদীদের মতে বুদ্ধ সর্বাগ্রে, তার পর ধর্ম ও সর্বশেষে সঙ্ঘ। কিন্তু মহাসাঙ্ঘিকদের মতে ধর্মই প্রধান, তার পরে বুদ্ধ এবং সর্বশেষে সঙ্ঘ। বৌদ্ধগণ অবশ্য ধর্মকে নারীরূপে কল্পনা করতেন। খ্রীষ্টীয় দুই শতকের গোড়ার দিকে মহাসাঙ্ঘিক দলের একাংশ নিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগার্জুন গঠন করেছিলেন মহাযান সম্প্রদায়। এই মহাযান সম্প্রদায়ের মতবাদ মূলত দার্শনিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঠিক একই সময়ে অপর একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, যার নাম ছিল হীনযান। এই দুই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদে নানা বিভেদ থাকলেও, লক্ষণীয় পার্থক্য মূলতত্ত্বে। হীনযান সম্প্রদায়ের নিজের মুক্তিই ছিল মুখ্য। কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নেই। জগৎ-সংসারের মুক্তিই মুখ্য। জগৎ সংসার যতক্ষণ বন্ধন অবস্থায় বিদ্যমান, তখন নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা তাদের মুক্তির প্রয়াসই মহাযানীদের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাযান সম্প্রদায়ের উপাস্য প্রজ্ঞা (ধর্ম), উপায় (বুদ্ধ), বোধিসত্ত্ব (সঙ্ঘ)। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে উপাস্য ত্রিদেব যথাক্রমে—তারা, নিত্যবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বরূপে কল্পিত হতে শুরু করে। বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার প্রারম্ভিক ভূমিকা বোধহয় এখান থেকেই। ভগবান বুদ্ধ নিজে মূর্তি-পূজার বিরোধী ছিলেন। হীনযানে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, কুবের ও বসুধারার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গরাজ্য ও দেবদেবীর কল্পনা করা হত। মহাযানে কিন্তু

মূর্তিপূজার প্রাথমিক পর্যায় ভগবান বুদ্ধের ব্যবহৃত বস্তু ও প্রতীকের মূর্তি প্রচলিত হতে শুরু করে। এই সময় ভগবান বুদ্ধের পাগড়ি, পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ, ধর্মচক্র প্রভৃতি চিহ্ন পাথরে খোদাই দেখা যায়। বুদ্ধগয়া, সাঁচি, ভারুত ও অমরাবতীর শিল্পই প্রাধান্য অর্জন করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত এই প্রতীক খোদিত হত।

প্রথম শতকেও ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ও জীবনচিত্রের বহু চিত্রও কিন্তু ক্ষোদিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত কোথাও বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হয় নি।

মহাযানীদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রবর্তক হিসাবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অশ্বঘোষের উল্লেখ অনেকেই করেন। ভগবান বুদ্ধের মূর্তির প্রচলন সম্ভবত ভারতের বাইরেই প্রথম হয়েছিল। এদিক দিয়ে গান্ধার শিল্পের পর মথুরা ভাস্কর্যের উন্নতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় গুপ্ত রাজাদের পরবর্তীকালের মূর্তিগুলি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। এগুলির সঙ্গে হীনযানের মূর্তিগুলির সাদৃশ্য নেই।

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের জন্য তদানীন্তন হিন্দুধর্মের ভাবধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব মূলত দায়ী। এই সময় ভারতের বিভিন্ন অংশে হিন্দু ধর্মের তান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার লাভ করেছিল। মহাযান সম্প্রদায়ের অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই ভাবধারার রহস্যময়তার মধ্যে যেন আত্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেতে চাইলেন। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষাংশে উড়িষ্যার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা ইন্দ্রভূতির পুত্র পদ্মসম্ভব ও কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা, জামাতা শান্তরক্ষিত মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটালেন। এই সম্প্রদায় মূলত মহাযান সম্প্রদায় হলেও তান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণের জন্য বজ্রযান সম্প্রদায় বলে অভিহিত হতে থাকল। বজ্রযানীদের উপাস্য—পদ্ম, বজ্র ও বোধিসত্ত্ব। কারও কারও মতে বৌদ্ধসন্ন্যাসী আর্য ও অসঙ্গ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক মতবাদের প্রচলন করেছিলেন।

বজ্রযান মতবাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হচ্ছে "শূন্য"। সৃষ্টির আদি ও অকৃত্রিম কার্যকারণ একমাত্র শূন্য। এই শূন্যের অর্থ সৎ, চিদ্ ও আনন্দ। শূন্য সদ্ অর্থে অস্তিত্বময়, চিদ্ অর্থে চেতনাময় ও আনন্দ অর্থে আনন্দময়। শূন্য সাধনমার্গের পথে নির্বিকার অবস্থা থেকে ঘনীভূত হয়ে শব্দরূপে বিরাজ করে। শব্দ ঘনীভূত হয়ে দেবতারূপ পরিগ্রহ করে। সাধনমার্গের সর্বশেষ স্তরের কথা এটি। বজ্রযানীদের আদিগ্রন্থ গুহ্যসমাজ গ্রন্থে সাধনমার্গের বিবর্তনের একটি সমৃদ্ধ চিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। তদনুযায়ী কায়বাক্চিত্ত বজ্রের ধ্যান ধারণায় স্থিত হয়ে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে। সমাধির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শব্দ উত্থিত হচ্ছে। এই ধ্বনিসমূহ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি ধারণ করছে।

জগতের কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে শূন্য আপনাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছে। এই ভাগগুলি স্কন্ধ নামে পরিচিত। এই পঞ্চস্কন্ধের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের পঞ্চতত্ত্বর সাদৃশ্য রয়েছে। পঞ্চস্কন্ধের নাম—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এর সঙ্গে পৃথ্বীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও শূন্যতত্ত্ব এই পঞ্চ তত্ত্বের স্থিতি যেমন অনাদিকাল থেকে, অনুরূপ পঞ্চস্কন্ধের অবস্থান, স্বভাব, বৈশিষ্ট্য শূন্যাত্মক। কর্মাবেশে এই পঞ্চস্কন্ধ কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে জীবত্ব প্রাপ্ত হয়।

বজ্রযানে শূন্যকেই বলা হয়েছে বজ্র। শূন্য বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অগ্রাহী ও অবিনশ্বর। এই শূন্য তাই বজ্রনামে অভিহিত। যে মার্গে বিচরণ করলে শূন্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় তার নাম বজ্রযান।

দেবদেবীর দর্শন সাধনমার্গের উচ্চতম অবস্থা। সেই অবস্থা প্রাপ্ত না হলে দেবদেবীর রূপ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি হয় না। তাই বজ্রাযানীদের দেবদেবী দর্শন ও তন্নিমিত্ত সাধনা এক বিশেষত্ব। সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে হিন্দু যোগশাস্ত্রে বর্ণিত সাধনার

পর্যায়ক্রম অগ্রগতির সঙ্গে বস্তুত কোনো প্রভেদই নেই। বজ্রযানীদের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রিয়াকাণ্ডের শুরুতেই শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি, পবিত্রতা, দেবতা দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ, জগৎ-সংসার শূন্যময় বলে সতত ভাবনা, বিশ্ব চরাচরের হিত চিন্তায় করুণার্দ্র হওয়ার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। এই সাধনপ্রণালী সম্পর্কে অনেক রচনা থেকে জানা যায়, পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের যোগ সাধনার প্রতিটি প্রক্রিয়াই অনুসরণ করা হয়েছে। যোগশাস্ত্রের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম থেকে সমাধি পর্যন্ত যোগের প্রতিটি অঙ্গই কঠোরভাবে পালন করা হয়ে থাকে। বজ্রযানের সাধন প্রক্রিয়ায় শরীর শুদ্ধি, মন্ত্রজপ, ধ্যান ও সমাধি সবই আছে। যোগ-শাস্ত্রে সমাধি অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলন সাধিত হয়। বজ্রযানীদের ভাষায় জীবাত্মা-বোধিচিত্ত, পরমাত্মাশূন্য বা বজ্র বা আদিবুদ্ধ। সাধক ধ্যান, জপ, সাধনের উচ্চস্তরে পৌঁছে গেলে তার বোধিচিত্তের সঙ্গে শূন্যের বা আদিবুদ্ধের মিলন সাধিত হয়। শূন্যের সঙ্গে মিলনের ফলে ক্রমশ পাঁচপ্রকার নিমিত্তের দর্শন হয়ে থাকে। এই নিমিত্ত প্রথমে চিত্তাকাশে মরীচিকা দর্শন, বিদ্যুতের মতো আলোকচ্ছটা, চতুর্থ পর্যায়ে দীপালোকের ন্যায় দৃশ্য, পঞ্চম ও শেষ পর্যায়ে সতত আলোক, যেন আলোকসমুদ্রে অবগাহন। এর পরেই ধ্যানমার্গে আসে পূর্ণ সমাধি, সাধক তখন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন।

বজ্রযান মতবাদের উৎপত্তি স্থান নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। তিব্বতীদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী তন্ত্রের উৎপত্তি স্থান উড্ডিয়ানে। এই উড্ডিয়ানের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়েও নানা মত। সাধনমালায় উড্ডিয়ান, কামাখ্যা, শিরিহট্ট ও পূর্ণগিরি এই চারটি স্থানকে তন্ত্রের পীঠস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চারটি স্থান বজ্রযোগিনী পূজার জন্য বিখ্যাত ছিল। খুব সম্ভব এই চারটি পীঠস্থানে বজ্রযোগিনীর একটি করে মন্দিরও ছিল। কামাখ্যা আসামে

অবস্থিত। শিরিহট্ট বর্তমানকালের শ্রীহট্ট। পূর্ণগিরি আসামস্থিত পুণ্য তীর্থের সমপর্যায় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই চারিটি পীঠস্থানের প্রধান উড্ডিয়ানের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি। খুব সম্ভব এই নামটি লুপ্ত হয়ে গেছে কালক্রমে। কিন্তু বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী নামে গ্রাম আজও রয়েছে। বজ্রযোগিনীর মন্দির বা পূজার প্রাধান্য এই গ্রামে ছিল বলেই সম্ভবত এই নামকরণ। বজ্রযোগিনী গ্রামের সঙ্গে উড্ডিয়ানের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল হয়তো। বজ্রযোগিনী মন্দির স্থাপনের পূর্বে গ্রামের অন্য কোনো নাম ছিল। কে জানে সে নাম উড্ডিয়ান কি না।

পূর্ববঙ্গ ও আসামই ছিল তন্ত্রের পীঠস্থান। এই স্থানগুলিতে তান্ত্রিক বজ্রযানের উৎপত্তি বলে পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহে (বিহার ও উড়িষ্যা) বজ্রযান মতবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, সারনাথ, ওদন্তপুরী, জগদ্দল প্রভৃতি স্থানের বিদ্যাপীঠ-গুলিতে বজ্রযান মতবাদ ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হত। বৌদ্ধতন্ত্র সাহিত্য "গুহ্যসমাজতন্ত্রে" বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর সাধনার বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অসঙ্গ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে এই পুস্তক রচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বসুবন্ধু, দীগনাগ ও ধর্মকৃতি প্রভৃতি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। লামা তারানাথের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল অনেক পূর্বে! হিউ এন সাঙের ভারত ভ্রমণের সময় ভারতে মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিক মতবাদ অনুপ্রবেশ শুরু করেছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বজ্রযানী মতবাদের প্রসার লাভ করেছিল সারা ভারতে। বৌদ্ধধর্মের দেবতা ও তার শক্তিরূপিণী দেবী, ভূতপ্রেত, অপদেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য, এবং এই অপদেবতার প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাধনার দ্বারা অলৌকিক শক্তি অর্জন ক্রমশ প্রচলিত হতে শুরু করেছিল। মন্ত্রজপ, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ তখন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করছিল সন্ন্যাসীদের মধ্যে।

পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণের সময় ভারতবর্ষ থেকে অনেক প্রাচীন পুঁথি ও মূর্তি নিয়ে অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীই নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ফলে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ভারতের সমতল ভূমি থেকে আশ্রয় নিয়েছিল হিমালয়ের গহন কন্দরে।

তিব্বতে বজ্রযান বৌদ্ধ মতবাদের প্রচলন নিয়ে চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিব্বতে বজ্রযান মতবাদের প্রসার ঘটেছিল ৭৪০ থেকে ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তিব্বতের শাসনকর্তার নাম ছিল থ্রি স্রঙ্ ডত্স্যুন। তিনি ছিলেন চীনের বংশোদ্ভব রাজকুমার। তাঁর মাতা ছিলেন নিষ্ঠাবতী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁর আদেশে থ্রি স্রঙ্ ডত্স্যুন বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান ভারতবর্ষে এসেছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ এবং সংস্কৃত ও পালি ভাষায় প্রকাশিত ধর্মগ্রন্থ ভাষান্তরিত করবার জন্য।

সেই সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত পদ্মসম্ভব ছিলেন যোগাচার্য। তিনি তাঁর তান্ত্রিক ক্ষমতা ও যোগবিভূতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিব্বতের শাসনকর্তা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শান্তরক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়েছিলেন যে তিনি তিব্বতে বৌদ্ধমঠ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই ভূমিকম্পে তার নির্মীয়মাণ মঠ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। থ্রিস্রঙ্ ডত্স্যুনের বিশ্বাস কোনো অপদেবতা তাঁর এই মহৎকার্যে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করছে। অপদেবতাদের প্রভাব বিনষ্ট করার উপায় জানার জন্য শান্তরক্ষিতের কাছে উপদেশ চাইলে আর বৌদ্ধমঠের জন্য প্রখ্যাত সন্ন্যাসীকে তিব্বতে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শান্তরক্ষিত উল্লেখ করেন পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের নাম। তিব্বতের সম্রাট নালন্দায় উপস্থিত হয়ে পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। পদ্মসম্ভব সম্রাটের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন সানন্দে। অতঃপর তিনি সম্রাটের সঙ্গেই নেপালের কাঠমুণ্ডু থেকে কিয়েরঙ্ গিরিপথ দিয়ে তিব্বতের সামিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।

তিনি তাঁর যোগবিভূতির দ্বারা সমস্ত অপদেবতাদের প্রভাব বিনষ্ট করে সামিয়েতে ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মঠ থেকেই প্রচার হতে থাকে বজ্রযান মতবাদ। এই মতবাদে বিশ্বাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা লামা নামে পরিচিত হন। তিব্বতে পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের নাম হয় গুরু রিম্পোচে।

পণ্ডিত পদ্মসম্ভব সম্পর্কে বিদেশী গ্রন্থকারগণ নানা তথ্য পরিবেশন করে এক বিতর্কমূলক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। প্রখ্যাত অভিযাত্রী ওয়াডেল (L. A. Waddell)-এর মতে, গুরু পদ্মসম্ভব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উদীয়ান বলে কোনো একটি রাজ্যের অধিবাসী। সেই রাজ্য হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশে দক্ষিণে কোনো এক পার্বত্য অঞ্চল। সেখানে তান্ত্রিক মতবাদ প্রচলিত ছিল। গুরু পদ্মসম্ভবের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কেও তাঁর সংগৃহীত কাহিনী বেশ চিত্তাকর্ষক। কথিত আছে উদীয়ানের রাজার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে যখন সমস্ত রাজ্য শোকমগ্ন, তখন রাজ্যের প্রজাবৃন্দ ভগবান অমিতাভের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতে থাকে। ফলে উদীয়ানের রাজা গভীর রাতে স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে তিনি নিজেকে মহান ও স্বর্ণ নির্মিত বজ্রধারণকারী রূপে দেখেন। তাঁর দেহে ছিল জ্যোতির ছটা। এই স্বপ্নদর্শনে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু কাউকেই এই স্বপ্নের কথা জানান না। প্রত্যুষে রাজপুরোহিত তাঁর কাছে এসে জানান যে তিনি ধনকোশা হ্রদের ওপারে আকাশে এক উজ্জ্বল আলো দর্শন করেছেন। রাজা দ্রুতগতিতে যান ধনকোশা হ্রদের তীরে। নৌকোয় আরোহণ করে হ্রদের ভেতরে দেখেন একটি বৃহৎ পদ্মফুলের ওপরে এক দিব্যকান্তি বালক। তিনি মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বালক উত্তর দেন, “আমি মহান শাক্যমুনির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এখানে এসেছি। সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি বলেছিলেন দ্বাদশ শত বৎসর পরে উদীয়ানের উত্তর-পূর্বে কোশা নামে পবিত্র হ্রদে আমার চাইতেও বিখ্যাত এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন।

তিনিই হবেন আমার তান্ত্রিক মতবাদের যোগাচার্য, আমার মতবাদ সর্বজনের কাছে পৌঁছে দেবেন।”

ওয়াডেল সাহেব বলেছেন, এই কাহিনী তিব্বতে প্রচলিত। তিনি তাঁর গ্রন্থ The Buddhism of Tibet-এ উল্লেখ করেছেন।

উদীয়ান স্থানটি কোথায়, এ নিয়ে নানা মতবিরোধ রয়েছে। ওয়াডেল বর্ণিত উদীয়ান যদি গজনীতে হয়, তাহলে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কতটা ছিল সে সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সেখানে তান্ত্রিক মতবাদের বহুল প্রচলন ছিল এ তথ্যের সত্যতা নেই। সে যুগে তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতে কামাখ্যা, শিরিহট্ট, পূর্ণগিরি ও উড্ডিয়ানে। এই চারিটি স্থানের মধ্যে উড্ডিয়ানকে বর্তমান পণ্ডিত ও তথ্যবিদ্‌গণ ঢাকার বজ্রযোগিনী গ্রাম বলে মনে করেন। সেখানে সপ্তম শতকে কোনো রাজবংশ ছিল না বা পদ্মসম্ভব বলে কারও জন্ম হয় নি। বরং উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতির পুত্র পদ্মসম্ভবের তন্ত্রসাধনার জন্য ও যোগবিভূতি লাভের আশায় তন্ত্রসাধনার এই পীঠস্থানে আসবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভারতীয় তথ্যবিদ্‌দের তথ্য থেকে এ ধারণাই মনে আসে যে ইন্দ্রভূতির পুত্র পদ্মসম্ভব ও গুরু রিম্পোচে একই ব্যক্তি। সিকিমে দালাই লামা তাঁর ভাষণেও পদ্মসম্ভবের জন্মভূমি ভারতবর্ষ বলে উল্লখ করেছেন।

বারো

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে। ইয়ক্‌সামের সকাল, ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাই। মনের দুর্বলতা কেটে যায় রঙীন তাঁবুর গায়ে রোদের ঝলক দেখে। বর্ষণমুখর ইয়ক্‌সামের কেমন এক বিরস চিত্র দুদিন

ধরে দেখেছি। সারা আকাশে মেঘের ঘন আস্তরণ, আর মাটির বুকে কুয়াশার চাদর বিছানো। অবিশ্রান্ত বর্ষণ, ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা। পাথর ছড়ানো ঢালু রাস্তার বুকের ওপর দিয়ে কলকল করে বয়ে চলে বৃষ্টির জল। সবাই দুঃখী, ঘরের মধ্যে বন্দী সিকিমীদের অলস দিন কাটে ঢিমে তালে। মেয়েরা অবশ্য সে সুযোগ পায় না। তারা একাধারে জননী, অন্যদিকে জায়া ও ভগ্নী। সংসারের অন্ধকার কোণে আলো জ্বালিয়ে তোলার দায়দায়িত্ব তো তাদেরই সব চাইতে বেশি। ঘরের কোণে মোষগুলো সারা গায়ে কাদা মেখে চোখ বুজে রোমন্থন করে চলে। এই বর্ষণমুখর দিনগুলিতে সব চাইতে সুখী বোধহয় জোঁকের দল। বৃষ্টির জলে তারা সতেজ ও তৎপর হয়ে ছেঁকে ধরে পথচারীকে। কাদা মাখা মোষের গায়ে রক্তের ছোপ সর্বত্র। জোঁকের দল ওখানে মহোৎসব চালায়।

সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চিত্রটি মুছে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার দুচোখ ভরে দেখি নীল আকাশ, তারই উত্তর-পশ্চিম কোণে উঁকি দেওয়া তুষারমণ্ডিত কাব্রু গিরিশিখর। গাছগুলো সতেজ, বাতাসে এক অদ্ভুত সজীবতার গন্ধ। তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ি মগ আর টুথব্রাস নিয়ে। অন্যান্য সবাইএর মতো বেড টী, বিশেষ করে মুখ না ধুয়ে আমি বরদাস্ত করতে পারি না। রান্নার স্থানে ব্যস্ততা, একটু পরেই জলখাবার দেওয়ার সময় হবে। রান্নার স্থানে পাচক পাশাঙ্‌কে নিয়ে নানা মন্তব্য শুনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ছোট ছোট রোগা টিঙ্‌টিঙে চেহারা। মুখটায় সব সময়ই কুইনিন গোলা খাওয়ার ভঙ্গী; শুনি অনেকগুলো পর্বত অভিযানে বিদেশীদের সঙ্গে সে গিয়েছিল হিমালয়ে। পর্বত অভিযানে সব চাইতে আরামদায়ক স্থান কিচেন। সব স্থানে যখন ভীষণ ঠাণ্ডা তখন কিচেনের স্থানটি গরম। এছাড়া কিচেনে যখন-তখন গরম পানীয় মেলে। এই একচ্ছত্র কর্তৃত্বের ভারপ্রাপ্ত পাশাঙ্‌ কিন্তু তার ক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। পাশাঙ্‌ স্বল্পবাক্‌, ভীরু ও নার্ভাস, তবে বোকা নয়। পর্বতারোহণ শিক্ষার্থীদের

মালপত্রবাহী পোর্টারদের মধ্যে যে কজন শেরপানী ছিল, পাশাঙের গৃহিণী তাদের মধ্যে অন্যতমা। মাঝে মাঝে দেখতাম পাশাঙ্‌গৃহিণী এসে দাঁড়াতো কিচেনের সামনে। পাশাঙের কুইনিন গেলা মুখের ভাব পাল্‌টে যেত সঙ্গে সঙ্গে। ছোট ছোট চোখ ছুটো আরও ছোট হয়ে জ্বলজ্বল করতো খুশীর জোয়ারে। পাশাঙ্‌কে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাতে দেখতাম। তারপর নীরবে ভাব বিনিময়, মোটা-মুটি সরবে ছুর্বোধ্য ভাষায় বাক্যালাপ, একটু হাসি, সলজ্জ ভঙ্গী। তারপর লক্ষ্য করতাম, এনামেলের মগভর্তি সোনালী চা যেন কোন্‌ অদৃশ্য মন্ত্রবলে এগিয়ে আসত কিচেনের ভেতর থেকে। পাশাঙ্‌ কিন্তু নেপথ্যে।

সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গীতে বসে পড়ত পাশাঙ্‌গৃহিণী কিচেনের সামনে পাথরের ওপরে। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, আর একটা মগ হাতে পাশাঙের আবির্ভাব। মগের ধূমায়িত চা তখন পি· সি. সরকারের ওয়াটার অফ ইণ্ডিয়া, কিছুতেই শেষ হতে চায় না। পাশাঙ্‌ আর তার গৃহিণীর বাক্যালাপের স্রোতের মুখে অনেক কর্তব্যের জগদ্দল পাথরও ভেসে যেত।

আমাকে মাঝে মাঝে নেহাত বেরসিকের মতো হাজির হতে হয়েছে সেখানে। আমার আবির্ভবে প্রথম প্রথম পাশাঙ্‌গৃহিণী রণে ভঙ্গ দিত। তার ফরসা মুখ তখন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত। চোখে মুখে ফুটে উঠত অর্থ পূর্ণ হাসি। পরে অবশ্য আমার উপস্থিতি আর তেমন চাঞ্চল্যকর মনে হত না ওদের।

টাশীডিঙের পর ইয়ক্‌সামের পথে প্রচণ্ড বর্ষণের মধ্যে আমাকে আরও ছু-একজনের সঙ্গে পেছনে থাকতে হয়েছিল পোর্টার ও শেরপানীদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্য।

পাশাঙ্‌গৃহিণীকে দেখেছি, চড়াই-উৎরাই আর ভাঙাচোরা পথ। এলোমেলো বিক্ষিপ্ত পাথরের মাঝখানে পথ চলতে চলতে তার বোঝার ভারে নুব্জদেহ আরও ছুমড়ে যেত। অপেক্ষাকৃত ভাল জায়গায়

এসে কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে বসে পড়ত। অন্যান্য শেরপানীদের সঙ্গে সমতালে চলতে না পেরে যেন বিমর্ষ। জেঁাকের আক্রমণের ফলে রক্তের ধারা ফরসা নিটোল পায়ের অনাবৃত অংশ দিয়ে পড়ত গড়িয়ে। আমাকেও দাঁড়াতে হত। পাশাঙ্‌-গৃহিণীর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি পড়তেই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। ওর দেহে মাতৃত্বের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। পাশাঙ্‌-গৃহিণী অন্তসত্ত্বা। হঠাৎ আমার দুচোখের সামনে বাঙলার মেয়েদের চিত্র ভেসে উঠেছিল। বাঙলায় অন্তসত্ত্বা মেয়েদের কত যত্ন, কত সাবধানতা, ডাক্তার, ওষুধ। তাদের রক্ত শূন্যতা, গর্ভপাত, নানা জটিল উপসর্গ লেগেই থাকে। কিন্তু পাহাড়ের কোলে লালিতা এই সব মেয়েদের কি অসাধারণ মনোবল, সাংঘাতিক দুঃসাহস। অবাক হয়ে যাই। কোনো কথাই যেন আর পারি না ভাবতে।

পাশাঙ্‌কে বলেছিলাম, দেখ, বউকে এ অবস্থায় পাহাড়ে মাল বইতে নিয়ে এসেছ কেন ?

চা পানরত পাশাঙ্‌ সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গীতে বসে থাকা গৃহিণীর দিকে তাকাত পিটপিট করে। হেসে আর ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলত, সাহেব, ছেলে হলে খাওয়াবো কি ? দুজনের এই রোজগার, ছেলেকে মানুষ করতে হবে। এই মাল বওয়া আর রান্নার কাজ কখনও নয়। ইস্কুলে দেব দার্জিলিঙে, বিদ্বান হবে তোমাদের মতো। বড় বড় নোকরি করবে, তখন আমাদের আর এ দুঃখ থাকবে না সাহেব। পাশাঙ্‌ বউয়ের দিকে মুখ করে তাকাত।

পাশাঙ্‌-গৃহিণী শুধু হাসত। কখনও নিঃশব্দে, কখনও বা খিলখিল করে উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ত পাহাড়ী ঝরনার মতো।

জলখাবারের পর্ব সমাপ্ত হতেই লোবসাঙ এসে যায়

চল দাজু, ইয়ক্‌সামে অনেক কিছু দেখবার আছে।

লোবসাঙের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। বাঁশঝাড় আর বিশাল আকৃতি ডুমুর গাছের তলা দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। এবড়ো-খেবড়ো পাথর বিছানো মোটামুটি চওড়া রাস্তা। দুপাশে কখনও বা নিচু জমিতে সবুজ শস্য, কখনও বাড়ি। বাড়ি বলতে দু-তিনখানা ঘর স্লেট পাথর দিয়ে ছাওয়া। নাসপাতি গাছ, আরু ফল, আরও নাম না জানা বড় গাছ জুড়ে রয়েছে স্কোয়াস গাছ। একফালি বাগানে লাউ-কুমড়ো শসা আর বরবটি ঝুলছে মাচানের উপরে। তলা দিয়ে মুরগী গুলো দলবেঁধে ঘোরাঘুরি করে। মাঝে মাঝে দেখি কমলা লেবু গাছ। গাছভর্তি কাঁচা কমলালেবুর ফাঁকে লালরঙের পাকা লেবু-গুলো দূর থেকে অপরূপ দেখায়। কিছু দূর যাবার পরেই রাস্তা বেঁকে যায় পশ্চিম দিকে। রাস্তার দুধারে পাথর সাজিয়ে উঁচু করে গাঁথা প্রাচীর। মাঝে মাঝে ভাঙাচোরা পুরোনো চোর্তেন। লোবসাঙের নির্দেশ মতো পথিমধ্যে চোর্তেনগুলিকে ডানদিকে রেখে এগিয়ে চলি। পাইন, দেওদার আর বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে আবছা কুয়াশার মাঝে সাদা ধবধবে বিশাল চোর্তেন ধীরে ধীরে যেন এগিয়ে আসে। হাঁটতে হাঁটতে বলছিল লোবসাঙ, প্রখ্যাত লামা লাহ্বছেন ছেম্বু বাকিম থেকে প্রাগচ্যু পেরিয়ে এসেছিলেন ইয়ক্সামের এই স্থানে। এই স্থানের নাম নরবুগাঙ্। এই নরবুগাঙেই অপর দুজন লামা রিগজিন ছেম্বু ও শেম্পা ছেম্বু এসে মিলিত হন লাহ্বছেন ছেম্বুর সঙ্গে।

লোবসাঙের সঙ্গে আরও এগিয়ে যাই। নরবুগাঙের বিশাল চোর্তেনের সামনে হাজির হই, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তিন শ' বৎসর পূর্বের এই প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের দিকে। পাইন, দেওদার আর ওক জাতীয় গাছে ঘেরা এই বিশাল চোর্তেনটির উচ্চতা চল্লিশ ফুট। এত উচ্চ চোর্তেন সিকিমের আর কোথাও নেই। চোর্তেনটি, আগাগোড়া ধবধবে সাদা রঙ করা। তার কাছেই রয়েছে কতগুলি প্রার্থনা পতাকা। নানা ছবি আঁকানো রয়েছে ওতে।

টাশীডিঙের ওপরে আর ঘুমের বৌদ্ধমন্দিরেও দেখেছি এমনি প্রার্থনা পতাকা।

লোবসাঙের কাছে শুনি, মোট চার রকমের প্রার্থনা পতাকার উল্লেখ আছে শাস্ত্রে। প্রার্থনা পতাকাকে বলা হয় ডা চো বা লুঙ্‌টা। বিভিন্ন অমঙ্গলকারী প্রেতাত্মাদের তুষ্টি বিধানের জন্য যাকিছু প্রক্রিয়া রয়েছে, তার মধ্যে পর্বতের উচ্চ তুষারাবৃত অংশে, কোনো গিরিপথে, বৌদ্ধমন্দির বা মঠের প্রবেশ মুখে প্রার্থনা পতাকায় বাণী লিপিবদ্ধ করে স্থাপন করা হয়ে থাকে। এই পতাকা স্থাপনের উদ্দেশ্য সৌভাগ্য প্রার্থনা বা সৌভাগ্য লাভের ইচ্ছা পতাকা মারফত বাতাসে পৌঁছে দেওয়া। এই জন্যই প্রার্থনা পতাকার নাম ডা চো বা সৌভাগ্যের জন্য। লুঙটা অর্থ বায়ু অশ্ব। যে অশ্ব কোনো মানুষের সৌভাগ্যের ইচ্ছা বাতাসে বয়ে নিয়ে যে কোনো দিকে পৌঁছে দেয়।

চার প্রকার লুঙটা বা ডা চো—পরিবেশ, ইচ্ছা ও প্রার্থনা অনুযায়ী এই পতাকার আকৃতি ও রঙ নির্ভর করে।

প্রথম : লুঙটা—এই পতাকা বর্গাকৃতি। একদিক চার থেকে ছয় ইঞ্চি। পতাকার কেন্দ্রস্থলে থাকবে অশ্বমূর্তি। অশ্বের পৃষ্ঠে মণি ও নরবু। এই পতাকা বাসগৃহের চালে টাঙানো থাকে। পতাকায় লিপিবদ্ধ মন্ত্রাদি—

ওম্ বাগেশ্বরী হুম্ (বাগীশ্বর মঞ্জুশ্রীর মন্ত্র) পতাকায় ব্যাঘ্র মূর্তি অঙ্কিত থাকবে আর লিপিবদ্ধ থাকবে—

ওম্ মণি পদ্মে হুম্ (অবলোকিতর মন্ত্র)

ওম্ বজ্রপানি হুম্ (বজ্র পানির মন্ত্র)

ওম্ বজ্রসত্ত্ব হুম্ (বজ্রসত্ত্বের মন্ত্র)

ওম্ অমরহ্নিদ মেবন্তীয় স্বাহা (অমিত যুগের মন্ত্র)

এ ছাড়াও লেখা থাকবে এই মন্ত্রগুলির ক্রিয়া হউক (কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম, জন্মের সন তারিখ ইত্যাদি) এবং

……মঙ্গল হউক দেহের (রোগ থেকে রক্ষা করুক)

বাক্যের (সর্বত্র সিদ্ধি হউক)

মনের (সর্ব ইচ্ছা পূরণ হউক)

গরুড় বর্ষের অধিপতি, ড্রাগণ এবং বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি হোক।

মঙ্গলকারী দেবতা :

মঞ্জুশ্রী—জ্ঞানদাতা।

অবলোকিত—নরক ও যে কোনো ভয় থেকে রক্ষাকারী।

বজ্রপানি—দুর্ঘটনা, দৈহিক আঘাত থেকে রক্ষাকর্তা।

বজ্রসত্ত্ব—আত্মাকে পবিত্রকারী ও পাপমুক্তকারী।

অমিতযুগ—দীর্ঘজীবন দানকারী।

দ্বিতীয় : চেপন

এই প্রার্থনা পতাকা আয়তাকার। দৈর্ঘ্যে আট থেকে দশ ইঞ্চি। এই পতাকা গাছের শীর্ষে, সেতুর ওপরে, পাহাড়ের শীর্ষদেশে, গিরিপথে স্থাপন করা হয়। লুঙটায় যা কিছু অঙ্কিত ও লিপিবদ্ধ থাকে, চেপনেও ঠিক তাই থাকে। এই পতাকার শেষাংশে শুধু থাকে…সমস্ত সংগৃহীত ক্ষমতাবৃদ্ধি হউক, পতাকা স্থাপনকারীর সৌভাগ্য, বয়সও আয়ু বৃদ্ধি হউক, চন্দ্রকলা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়ে যেমন পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হয় ঠিক তেমনিভাবেই সবকিছু বৃদ্ধি হউক।

এই পতাকা স্থাপন করা হয় মাসের তৃতীয় দিনে, পাহাড়ের শীর্ষে। সেদিন সুগন্ধি দ্রব্য পোড়ানো হয়। শুদ্ধাচারে সেখানে পুষ্প, শস্য, মদ্য, মাংস সা-ডাঙ্ নামে মর্ত্যের দৈত্যকে নিবেদন করা হয়। এই সব দ্রব্যগুলি পাহাড়ের শীর্ষ থেকে চারধারে ছড়িয়ে দিয়ে আহ্বান করা হয় দৈত্যকে গ্রহণ করবার জন্য।

তৃতীয় : গিয়াল ৎসেন-সে মো

এই প্রার্থনা পতাকা জয়লাভের জন্য স্থাপন করা হয়ে থাকে। এর ভেতরের অঙ্কিত চিত্র ও মন্ত্র লুঙটায় যা কিছু আছে এতেও হুবহু এক। এই পতাকা শুধু যে স্থাপনকারীর ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে তা নয়। এতে ধনসম্পদ, জীবন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ

ধন বৃদ্ধি, আয়ু বৃদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধি।

চতুর্থ : প্লাঙ্ পো স্টব্ গিয়াস্

এটি বিশাল ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রার্থনা পতাকা। এই পতাকা সাধারণত বাসগৃহের ওপরে স্থাপন করা হয়। এর ভেতরে কেন্দ্রস্থলে আড়াআড়িভাবে বজ্র, গরুড়, ময়ুর মণিরত্নখচিত হস্তী মণিরত্নখচিত অশ্ব, প্রত্যেকটি আটটি পাপড়িযুক্ত পদ্মের মধ্যে অঙ্কিত থাকে।

নরবুগাঙের প্রার্থনা পতাকাগুলোর মধ্যে চাররকম পতাকাই দেখিয়ে দেয় লোবসাঙ। এই পতাকাগুলি চোর্তেন প্রদক্ষিণান্তে কোনো কোনো দর্শনার্থী স্থাপন করে যায়। এজন্য সবক্ষেত্রে যে প্রার্থনা পতাকার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে লাগানো হয়, দেখে কিন্তু একথা মনে হবে না। বজ্রযানতন্ত্রে প্রার্থনা পতাকার উল্লেখ আছে কিনা জানা নেই। লোবসাঙের কাছে শুনি, লামাতন্ত্র বস্তুত বজ্রযান মতবাদ ও প্রাচীন লেপচাদের মধ্যে প্রচলিত অনেক সংস্কারের সংমিশ্রণ। কারণ অন্যান্য পাহাড়ী মানুষদের মতো প্রাচীনকালে লেপচাদের বিশেষ কোনো ধর্ম ছিল না। কিন্তু তারা প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল, প্রেতাত্মা সাধারণত দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর প্রেতাত্মাদের কাজ মানুষের সর্বপ্রকারে সাহায্য করা, উপকার করা ও বিপদ থেকে মুক্ত করা, অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচানো।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেতাত্মা কাজ মানুষের সর্বপ্রকারে ক্ষতিসাধন করা ও নানা উপায়ে অমঙ্গল ডেকে আনা।

লেপচা মঙ্গলকামী প্রেতাত্মাদের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করত না। কারণ এই প্রেতাত্মাদের কাজই মঙ্গলসাধন করা। তাই এদের পুজো করা বা নানা প্রক্রিয়ায় তুষ্টিবিধান করার প্রয়োজন নেই কিছুই। লেপচারা সর্বক্ষণ তটস্থ থাকত অমঙ্গলকারী প্রেতাত্মাদের ভয়ে। যারা তুষারাবৃত পর্বতে বাস করে। সময়ে অসময়ে তুষার ঝড়, তুষার-পাত ঘটায়। ধস নামিয়ে নানারূপ দুর্দৈব ঘটিয়ে সবার সমূহবিপদ

আনে ডেকে। লেপচারা তাই তাদের তুষ্টিবিধানের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। প্রার্থনা পতাকাও হয়তো বা এমন একটি প্রক্রিয়া। সিকিমের প্রাচীন গ্রন্থে, সিকিমের চতুঃসীমা বর্ণনা প্রসঙ্গে চতুর্দিক রক্ষাকারী প্রেতাত্মার কথা বলা হয়েছে। সেই বই অনুসারে এই পবিত্র দেশের উত্তরে ঘিরে রেখেছ, মন থাঙ্‌লা পর্বত আর সেই পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে কিটিং নামে মঙ্গলকামী প্রেতাত্মা উত্তরদিক রক্ষা করছে।

পূর্বদিকে অবস্থিত পর্বতের নাম ইটাস গনস পর্বত। সেখানে বসবাসকারী মঙ্গলকামী প্রেতাত্মার নাম মা-গন ইচাম। এই প্রেতাত্মা পূর্বদিক রক্ষা করছে। সিকিম দেশটার দক্ষিণদিকে রয়েছে নাগশভতি পর্বত। সেখানে রয়েছে মঙ্গলকামী প্রেতাত্মা ব্রাল ইয়াক্‌ই ইহুদ্‌। পশ্চিমদিকের পর্বতের নাম ইতিমার চ্ছদ্‌টেন পর্বত। সেখানে রয়েছে ভয়ঙ্করী প্রেতিনী মাম্‌স। এছাড়াও উত্তরদিকে অবস্থিত পর্বতের নাম দস্‌দ ইনগা পর্বত। এই পর্বতে বসবাসকারী মঙ্গলকামী প্রেতাত্মার নাম ক্রা মান, জেমান। এই প্রেতাত্মা উত্তর দিকটা পাহারা দেয়।

দুচোখ ভরে দেখি নরবুগাঙের চল্লিশ ফুট উচ্চ চোর্তেনটিকে। এই চোর্তেনের পরেই উচ্চ চোর্তেন আছে টাশীডিঙে। তার উচ্চতা ত্রিশ ফুট। নরবুগাঙের চোর্তেনের সামনেই রয়েছে পনের ফুট দীর্ঘ ও চার ফুট প্রশস্ত একটি পাথরের বেদী। বেদীর পেছনেই এক অদ্ভুত মোচাকৃতি স্তূপ, যায় উচ্চতা প্রায় আট ফুট। পাথরের তৈরি ফাঁপা এই স্তূপটির সব সমেত তিনটি ধাপ। নিচের ধাপে রয়েছে দরজা বা প্রবেশ মুখ। ওপরের দুইটি ধাপে দুইটি নির্গমন মুখ রয়েছে। এই এই স্তূপটির নাম সঙ্‌বুম। প্রকৃতপক্ষে সঙ্‌বুম সুগন্ধিদ্রব্য ও গাছের পাতা পুড়িয়ে সুগন্ধি ধোঁয়া সৃষ্টি করার একটি বিশাল চুল্লী বিশেষ। মন্দির বা বিগ্রহের সামনে যেমন ধূপ-ধুনা ও সুগন্ধি দ্রব্য পোড়ানো

ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লামাতন্ত্রে মন্দির ও চোর্তেনের সামনেও ঠিক তেমনি সুগন্ধি দ্রব্য পোড়ানোর নির্দেশ আছে। নরবুগাঙের চোর্তেন যেমন বিশাল তেমনি বিশাল তার পূজার আয়োজন। সঙ্‌বুমের সর্বনিম্ন স্তরের প্রবেশ মুখ দিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য ও গাছের পাতা ঢুকিয়ে দিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। এই প্রজ্বলিত সুগন্ধিদ্রব্য থেকে উত্থিত ধোঁয়া ওপরের নির্গমন পথ দিয়ে নির্গত হয়ে আকাশ-বাতাস আমোদিত করে। সিকিমের সর্বত্রই অসংখ্য চোর্তেন আছে কিন্তু এমন সঙ্‌বুম এক ইয়ক্‌সামের নরবুগাঙ ছাড়া আর কোথায়ও নেই। এই ধরনের সঙ্‌বুম সাধারণত দেখা যায় তিব্বতের চোর্তেনগুলির সামনে। লোবসাঙ আমাকে পাথরের একটি আসনের সামনে নিয়ে পাথরের ওপরে পদচিহ্ন দেখিয়ে জানায় এই পদচিহ্ন প্রখ্যাত লামা লাহ্বছেন ছেম্বুর। চোর্তেনের সন্নিকটে একটি পাষাণ বেদীর ওপরে ফুন্টসগের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। অভিষেকের পূর্বে ফুন্টসগকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সুদৃশ্য সরোবরের নিকট। লোবসাঙ নরবুগাঙ থেকে আমাকে নিয়ে আসে পথের কাছেই প্রায় বৃত্তাকার সরোবরের ধারে।

লোবসাঙ বলে, এই সরোবরের নাম কাতক পোখরী। এর জল অত্যন্ত পবিত্র। ফুন্টসগকে এরই পবিত্র জলে অবগাহন করিয়ে, রাজকীয় পোষাক পরিধান করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য।

কাতক পোখরীর স্বচ্ছ জলের দিকে তাকিয়ে দেখি। কালের আবর্তনে জলাশয় অগভীর হয়েছে, কিনারে অযত্নে জন্মেছে নানা জলজ উদ্ভিদ। স্থির জলে কাব্রু শিখরের ছায়া পড়ে। জলাশয়ের উত্তর-পূর্বদিকের গিরিশিরার ওপরে নাকি কোনো এক সময় রিগজিন ছেম্বু বাস করেছিলেন। রিগজিন ছেম্বুর অন্য নাম কাতক লামা। তাঁর নাম অনুসারেই সরোবরের নাম হয়েছে কাতক পোখরী।

গল্পের গন্ধে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠি। লোবসাঙ জানায়, দাজু, সারা সিকিমের পাথরের আনাচে-কানাচে গল্প। এদেশের পাথর

কথা বলে। ঝরনা, নদী, তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ সবাই যেন কথা বলবার জন্য উন্মুখ। এককালে এই সরোবরের জল ছিল পরম পবিত্র। কাতক পোখরীর জল বর্ষায় বৃদ্ধি পায়। তখন সরোবরের গভীরতা দশ থেকে বারো ফুট। সরোবরের ব্যাস প্রায় ২৪০ ফুট। কাতক পোখরীর তীরে দেখা যায় অনেক চোর্তেনের ভগ্নাবশেষ। নানা ঝোপ ঝাড়ে ঘেরা কাতক পোখরীর একদিকে বড় বড় পাথর পড়ে থাকতে দেখা যায়।

উচ্চতা অনুযায়ী ইয়ক্‌সামে শীতের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশী, কারণ সম্ভবত গ্রামটি তুষার সীমার সন্নিকটে। বর্ষার প্রারম্ভেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়। ইয়ক্‌সামের বুকে জমা মাটি পাথর যেন নরম হয়ে যায়। তখন মাটির বুকে সবুজের ঘন প্রলেপ পড়ে। ফলভারে নুব্জ নাসপাতি গাছ আরও নত হয়। কমলালেবুর গায়ে লাল রঙের ছোপ লাগে। বহুদূর থেকে দেখি আর দুচোখ যেন জুড়িয়ে যায় বিচিত্র রঙের সমাবেশে। ফলের বাহারের পরেই চোখ পড়ে চেরীফুলে। সমস্ত গাছের কোথাও সবুজ পাতার নামগন্ধ মাত্র নেই, পরিবর্তে হাল্‌কা বেগুনী রঙের ফুল। ইয়ক্‌সামে দুবার বসন্ত আসে, বর্ষায় আর শীতের প্রাক্কালে। দুবার প্রকৃতিদেবী রঙীন সাজে সজ্জিতা হয়ে প্রলুব্ধ করে পথচারীকে। তখন যদি কেউ শহরের কোলাহলে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে চান, পথচলার উদগ্র বাসনা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কেউ, ইয়ক্‌সাম তখন তাদের দুহাত বাড়িয়ে ডাকবে।

তেরো

আমরা এসে গিয়েছি!

লোবসাঙের কথায় তাকিয়ে দেখি সামনের দিকে।

দাজু, এর নাম ডুবদি।

কপালের ঘাম মুছে ফেলি। ঘন বনছায়ার তলা দিয়ে ক্রমাগত চড়াই ভেঙে, হাত পা' থেকে চট চটে জোঁক ছাড়াতে ছাড়াতে দেখি নীল আকাশ। দেখি বনভূমি পেরিয়েছি, উঠে গিয়েছি গিরিশিরার শীর্ষে। এবার বেশ কিছুটা সমতল স্থান। সেই সমস্ত স্থানটি জুড়ে ডুবদির বৌদ্ধ বিহার। পাওহুনরী গিরিশিরার শীর্ষদেশে স্বল্প পরিসর স্থানটি নির্বাচিত হয়েছিল বৌদ্ধ বিহারের জন্য। পাইন, দেওদার আর ওক গাছে ছাওয়া গিরিগাত্র। মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়, বড় বড় আকৃতির জলপাইয়ের গাছ। আর এই গভীর বনের সমস্ত স্থানটি জুড়ে দুষ্প্রাপ্য অর্কিড গাছ। গভীর বন, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝরনার ক্ষীণধারায় বনের তলদেশ শীতল ও স্যাঁতসেঁতে। পাথরের গায়ে অসংখ্য জোঁক।

ইয়ক্‌সাম থেকে ডুবদির উচ্চতা হাজার খানেক ফুট। দূরত্ব প্রায় মাইল দুয়েক। গিরিশিরার শীর্ষে পৌঁছবার আগে চড়াই সব চাইতে বেশী। ডুবদির মঠ স্থাপিত হয়েছিল ১৭০১ সনে। ফুন্টসগ নামগিয়ালের রাজ্যভার গ্রহণের পরেই তাকে লামা ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল। নতুন ঘরের নতুন শাসনব্যবস্থা, নতুন মানুষদের মধ্যে ধর্ম প্রচার, সব রকম কাজের দায়দায়িত্ব পড়েছিল তাঁরই ওপরে। তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন নিশ্চয়ই। তাই হয়তো তাঁর পক্ষে ধর্মপ্রচারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজই করে যেতে হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে সিকিমের কোথাও কোনো মঠ মন্দির স্থাপিত হতে পারে নি। ফুন্টসগের দেহত্যাগের পর তাঁর পুত্র তেনস্যুঙ নামগিয়াল রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন ১৬৭০ সনে। তিনি সিকিমের দ্বিতীয় চোগিয়াল। পিতার অবর্তমানে তিনিই তাঁর অসম্পূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ করেন ১৬৯৭ সনে কুলাইত গিরিশিরার ওপরে সাঙাছোলিঙ মঠ স্থাপন করে। এইটিই সিকিমের স্থাপিত প্রথম মঠ। এই বৌদ্ধ মঠে পঁচিশজন বৌদ্ধ লামা বাস করতেন। তাঁরা সেখানে লোক

চক্ষুর অন্তরালে ধ্যানধারণা নিয়ে কাল কাটাতেন। তেনস্থ্যঙ নামগিয়ালের সময় সিকিমের দ্বিতীয় বৌদ্ধ মঠ ডুবদি স্থাপিত হওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। ১৭০০ সনে তেনস্থ্যঙ নামগিয়ালের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মৃত্যু তাঁকে অকালে ছিনিয়ে নিয়ে যায় মর্তভূমি থেকে। ডুবদির মঠ নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়া দেখা তাঁর ভাগ্যে আর ঘটে ওঠে না। তেনস্থ্যঙ নামগিয়ালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চাকডর নামগিয়াল সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭০০ সনে। ১৭০১ সনে ডুবদির বৌদ্ধ মঠ নির্মিত হয়। পওহুঙরী গিরিশিরার ওপরে স্বল্প পরিসর স্থানে বেশ অনেকটা অংশ পাথর দিয়ে বাঁধানো। এই স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট বেদীর ওপরে পাশাপাশি নির্মিত রয়েছে দুইটি বৌদ্ধ মন্দির। মন্দির দুটোর অভ্যন্তর ভাগ বহু বর্ণে ও নানা চিত্রে চিত্রিত। কিন্তু মন্দিরের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক স্থানে জীর্ণ দশা। অভ্যন্তর ভাগে চিত্রিত ও রঙীন চিত্রগুলি বিবর্ণ হয়ে গেছে কালের প্রভাবে। প্রতিটি মন্দিরই দোতলা, ওপর তলায় বাস করেন লামারা। মন্দিরে সবসুদ্ধ ত্রিশজন লামার বাসোপযোগী স্থান রয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে গোপন কুঠরী রয়েছে। সেখানে নির্জনে বসে যোগসাধনা করেন লামার দল।

ডুবদি শব্দের অর্থ—সন্ন্যাসীদের নিভৃত স্থান। সিকিমে লামা ধর্ম স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে খুব সম্ভব বজ্রযানীদের তন্ত্রোক্ত যোগচর্চার উপযোগী স্থানের অনুসন্ধান ও যথোপযুক্ত মঠ স্থাপন একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। যোগচর্চার জন্য সিকিমের প্রথম মঠ সাঙাছোলিঙ, অর্থ গুপ্তবিদ্যার স্থল।

ডুবদির মন্দিরের মুখ্য মূর্তি গুরু পদ্মসম্ভবের বা গুরু রিম্পোচের। গুরু রিম্পোচে পদ্মপাপড়ির সামনে উপবিষ্ট। শিরোদেশে পদ্মপাপড়ির আকৃতি বিশেষ শিরাবরণ। তাঁর দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বাম হস্তে রক্তপূর্ণ নরকপাল। বাম স্কন্ধে হেলান দেওয়া ত্রিশূল তার অগ্রভাগে বিদ্ধ নরমুণ্ড। গুরু রিম্পোচের মূর্তি ছাড়াও, মন্দিরে রয়েছে সিকিম সভ্যতা,

রাজতন্ত্র ও লামাতন্ত্রের জনক লাহ্বছেন ছেম্বুর মূর্তি। লাহ্বছেন ছেম্বু চিতা বাঘের চামড়ার আসনে উপবিষ্ট। তাঁর পা নিচে ঝোলানো, সমস্ত দেহ প্রায় নগ্ন। সেজন্য তার নাম হেরুকপা। লাহ্বছেন ছেম্বুর দেহের বর্ণ ঘণ নীল, শিরে নরকপালের শিরাবরণ। বাম হস্তে রক্তপূর্ণ নরকপাল, বাম স্কন্ধে ত্রিশূল।' ত্রিশূলের ডগায় বিদ্ধ নরমুণ্ড। দক্ষিণ হস্তে জ্ঞান দানের মুদ্রা। অনেকেরই ধারণা তিনি ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ভীম মিত্রের প্রতিমূর্তি। বৌদ্ধ দেবসঙ্ঘে হেরুক নামে অতি শক্তিশালী দেবতা রয়েছেন। তার রূপ ও দেহবর্ণনায় লাহ্বছেন ছেম্বুর সঙ্গে রয়েছে বিশেষ সাদৃশ্য। অবশ্য হেরুকের বিভিন্ন মূর্তি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সেই সব মূর্তির মধ্যে কোনোটি দ্বিভূজ, কোনোটি বা চতুর্ভুজ, কোনোটি বা ষোড়শভুজ হেরুকের মূর্তিও নাকি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু মূল মূর্তিটি দ্বিভুজ।

দ্বিভুজ মূর্তিতে হেরুকের দেহবর্ণ গাঢ় নীল, ভীষণ দর্শন। তাঁর মুখমণ্ডল ক্রোধাবেশে উদ্ভাসিত। দ্রংষ্টকরাল, চক্ষু বহিরাগত ও আরক্ত। কেশরাশি লেলিহান অগ্নিশিখার মতো উর্ধ্বে উত্থিত। শবের ওপরে তাঁর বামপদ বিন্যস্ত, দক্ষিণ পদ স্থাপিত বাম উরুতে। বাম হস্তে রক্তপূর্ণ নরকপাল, বাম স্কন্ধে খট্টাঙ্গ, তার উধর্ব অংশ পতাকার মতো উড্ডীয়মান। এইরূপ মূর্তি নাকি সংরক্ষিত আছে ঢাকার মিউজিয়ামে। মাঞ্চুরিয়া, নেপাল ও তিব্বতে হেরুকের মূর্তি পাওয়া গেছে। লাহ্বছেন ছেম্বুর উপাস্য দেবতাও ছিল হেরুক। ডুবদির মন্দিরে রয়েছে রিগজিন ছেম্বু ও শেম্পা ছেম্বুর মূর্তি। এ ছাড়াও আছে সিকিমের প্রথম চোগিয়াল ফুণ্টসগ নামগিয়ালের মূর্তি। ফুণ্টসগের অভিষেকের সময় ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদও সযত্নে রক্ষিত আছে সেখানে। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেখি ষোড়শ শতকের ধর্মগ্রন্থ। এই ধর্মগ্রন্থ ফুণ্টসগের অভিষেকের সময় পাঠ করা হয়েছিল।

লোবসাঙের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সমস্ত স্থানটি দেখে নিই। ডুবদির উচ্চতা ৬৬০০ ফুট। দার্জিলিঙের সমান উঁচু নয়। তবু তুষার

সীমানার সন্নিকটে বলেই হয়তো এখানকার শীত প্রবল। শীতকালে মন্দির প্রাঙ্গণে পাঁচ ফুটের মতো বরফ জমে। মন্দির প্রাঙ্গণে দেখি জনকয়েক বৃদ্ধ লামা, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ পুরোনো। গলায় প্রবালের মালা। এই মালাই তাঁরা জপ করেন। আমাদের উপস্থিতির জন্য খুশী হয়ে লামাদের একজন কিছু শুকনো আখরোট দিয়ে আপ্যায়ন করেন। আমাদের আগ্রহ লক্ষ্য করে তাঁরা সঙ্গে নিয়ে দেখান সবকিছু। মন্দির সংলগ্ন কক্ষে লামাদের খাদ্যভাণ্ডার। শীতের সময় যখন বরফে পথ বন্ধ হয়ে ইয়ক্‌সামের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, সে সময় নিচ থেকে খাদ্যসম্ভার আসতে পারে না মঠে। লামারা তাই শীতের জন্য মজুত করে রাখেন ইয়াকের শুকনো মাংস, ইয়াকের দুধের শুকনো পনীর, চাল, আটা, আলু ও শুকনো ফল।

সিকিমের বৌদ্ধ মন্দিরের দেবমূর্তি ও মুখ্য লামাকে শ্রদ্ধা জানাবার রীতি হিন্দুমন্দিরে দেবদেবী মূর্তির সামনে প্রণাম করার মতোই। মূর্তি প্রণামের পর, আমরা যেমন প্রধান পুরোহিত বা সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করি, সিকিমীরাও অনুরূপ লামাদের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে, লামারা হয় শিরোদেশে হস্ত স্থাপন করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন অথবা তাঁর হস্তস্থিত বজ্র ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করেন। মুখ্য লামার পরিচালনায় মন্দিরে প্রার্থনা ও উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। লামারা সবসময়ের জন্যই মালা জপ করেন। এই মালাও বিভিন্ন দ্রব্যে তৈরি। মালার উপাদান নির্ভর করে উপাস্য দেবতার ওপরে। এদিক দিয়েও হিন্দু তন্ত্রের পরিপূর্ণ নির্দেশ মেনে চলা হয়। লামাদের কাছে কিছু কিছু দেবদেবীর নাম ও বীজ মন্ত্রের কথা শুনে বিস্মিত হই। এই মন্ত্রের ভাষা ও রচনাশৈলীতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে বৌদ্ধ তন্ত্র বস্তুত তন্ত্রশাস্ত্র থেকেই উদ্ভূত।

লামাদের কাছ থেকে সংগৃহীত দেবদেবীর নাম ও বীজমন্ত্র—

সিকিমী নাম	সংস্কৃত নাম	বীজমন্ত্র
দোরজে ঝিক্ চে	যম	ওম্ যমান্তক হুম্ ফট্
চা-না-দোরজে	বজ্রপানি	ওম্ বজ্রপানি হুম্ ফট্
		ওম্ বজ্রসন্দ মহারক্ষণ হুম্
তাম্ দিন	হয়গ্রীব	ওম্ পদ্ম তক্রীদ্ হুম্ ফট্
চে রে সি অথবা		ওম্ মনি পদ্মে হুম্
থুক্ জে-ছেন্বু	অবলোকিত	
দোলমা জাঙখু	তারা	ওম্ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা
দোল কর	সিতা তারা	ওম্ তারে তুত্তারে নময়ে জোর পানি সন্যিয়ানা পুষ্পিতা কুরু স্বাহা
দোরজে ফাক্‌মো	বজ্রবরাহী	ওম্ সর্ব বুদ্ধ দক্ষিণী হুম্ ফট্
ওজার চেন মা	মারীচি	ওম্ মারীত্স্ত্যে নমো স্বাহা
গনপো নাগপো	কলানাথ	ওম্ শ্রী মহাকাল হুম্ ফট্ রক্ষ
	কুবের	স্বাহা
নাম্‌সে		ওম্ বৈশ্রামনয়ে স্বাহা
সাম্ভালা	জাম্ভালা	ওম্ সাম্ভালা সলেন্দ্রয়ে স্বাহা
সেঙগেদা	সিংহনাদ	ওম্ হ্রীং সিংহনাদ হুম্ ফট্
যামযাঙ্	মঞ্জু ঘোষ	ওম্ আরাপাৎ সানাধি
ডেমচক	সম্ভর	ওম্ হ্রীং হা হা হুম্ হুম্ ফট্
পদ্ম যুগ্‌মে	পদ্মসম্ভব	ওম্ বজ্রগুরু পদ্ম সিদ্ধি হুম্

জপমালার উপকরণ

নরকপালের অস্থিরমালা অর্থাৎ মহাশঙ্খের মালা এই মন্ত্র জপ করতে হয়। তন্ত্রে নরকপাল অস্থির মালাকে বলা হয়েছে মহাশঙ্খের মালা।

রুদ্রাক্ষ মালা (বোধিত্‌সে)

"

রক্তচন্দনের মালা অথবা প্রবালের মালা।

শঙ্খের মালা অথবা কোন মণি মুক্তার মালা।

বোধিত্‌সের মালা।

বোধিত্‌সের মালা।

বোধিত্‌সের মালা।

বোধিত্‌সের মালা।

বোধিত্‌সের মালা।

নাগফণীর মালা।

নাগফণীর মালা।

শঙ্খের মালা বা মণি মুক্তার মালা

হলদে রঙের মালা (অশ্বত্থ কাঠের)

বোধিত্‌সের মালা

প্রবাল বা বোধিত্‌সের মালা

হলদে রঙের মালা—গেলুক পা সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই মালার দানাগুলি অশ্বত্থ গাছের হলদে কাঠ থেকে তৈরি করা হয়ে থাকে।

বোধিত্‌সে—নিয়াঙ্‌মা পা সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহৃত এইমালা। মালার দানাগুলি খয়েরী রঙে একরকম বীজ। এই বীজের গাছগুলি জন্মে নিম্ন হিমালয়ে। এগুলি রুদ্রাক্ষ নামেও পরিচিত।

শ্বেতবর্ণের মালা—শঙ্খের মালা, বর্ণহীন কাচ বা পাথরের বা স্ফটিকের দানা।

চন্দনের মালা—রক্তচন্দন গাছের কাঠ থেকে দানা তৈরি করা হয়ে থাকে।

প্রবালের মালা—প্রবাল, বেশ মূল্যবান বলে অনেক ক্ষেত্রে লাল বর্ণের কাচের মালা ব্যবহার করা হয়।

নরকরোটির মালা—চাক্‌তির মতো মানুষের মাথার খুলির হাড় থেকে বানানো মালা।

হস্তী পাথর—হাতির পাকস্থলীতে একরকম পাথর জন্মে সেই পাথরের মালা।

নাগফণী—কালরঙের চকচকে বীজ। এই গাছগুলি হিমালয়ে জন্মে; সিকিমীরা একে বলে লুঙথাঙ্‌।

এছাড়া সাপের হাড় দিয়েও মালা বানানো হয়ে থাকে। অবাধ্য দেবতার রূপ ও রঙের ওপরে অনেক ক্ষেত্রে মালার দানা ও তার রঙ নির্ভর করে।

অবলোকিতের বীজমন্ত্র "ওম্‌ মণিপদ্মে হুম্‌" এর এক বিশেষ অর্থ দেখা যায় লামা তন্ত্রে।

তদনুযায়ী—ওম্‌		পুনর্জন্ম হলেও দেবত্ব প্রাপ্তি		বর্ণ স্বর্গীয় শ্বেতবর্ণ
	ম	পুনর্জন্মে	অসুরত্ব প্রাপ্তি	গাঢ়নীল বর্ণ
	নি	”	নরত্ব প্রাপ্তি	হল্‌দে বর্ণ

পদ্	পুনর্জন্মে	পশু জন্ম	সবুজ বর্ণ
মে	”	প্রেত জন্ম	রক্ত বর্ণ
হুম্	”	নরকের অধিবাসী	কৃষ্ণ বর্ণ

বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর বিশাল পরিবার। মহাপণ্ডিত অভয়াকর গুপ্তের মতে বজ্রযানে দেবদেবীর সংখ্যা নির্ণয় দুঃসাধ্য। অগণিত ভক্তচিত্তের ধ্যানধারণার আবেগে অসীম শূন্য তত্ত্বের সঙ্গে সজ্ঘাতে জল বুদবুদের ন্যায় অনন্ত দেবদেবীরূপ পরিগ্রহ করেছে। বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র গুহ্য সমাজতন্ত্র, নিস্পন্ন যোগাবলী, সাধন মালা, অদ্বয় বজ্রসংগ্রহ পুস্তকে বৌদ্ধ দেবদেবীর বর্ণনা ও সাধনপ্রণালী বিশদ-ভাবে আলোচিত হয়েছে। গুহ্য সমাজতন্ত্র বজ্রযান তন্ত্রের প্রাচীন পুঁথি। এই পুস্তক রচনায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অসঙ্গের হাত আছে বলে অনুমান। অসঙ্গ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু গুহ্য সমাজতন্ত্র গ্রন্থের রচয়িতার কোনো নাম নেই। কারণ হিসাবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ধারণা, এই পুস্তকের সব কিছুই ভগবদ্ বচন। অসঙ্গ শুধু পুস্তক খানিতে সেই বচন লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অসঙ্গের ভাই বিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিশ্ববন্ধু বৌদ্ধ জগতে খুবই সুপরিচিত নাম। লামা তারানাথ নামে তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের ধারণা বৌদ্ধ তন্ত্র সুদূর অতীতকালেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই তন্ত্রশাস্ত্র লুপ্ত ছিল প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পর্যন্ত। সেই সময় তন্ত্র সাধনা অত্যন্ত গুহ্য বলে গোপনে গুরুশিষ্য পরাম্পরায় প্রচলিত ছিল।

বাঙলাদেশের পালরাজাদের সময়ে সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা এই তন্ত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল, আর সেই শ্রীবৃদ্ধি বর্তমান ছিল দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণে অনেক মঠ, অনেক বিদ্যাপীঠ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অনেক তথ্যসংবলিত প্রাথমিক গ্রন্থ বিনষ্ট হয়। তার পরই বজ্রযান মতবাদ নিস্প্রভ হয়ে মিলিয়ে যেতে শুরু করে

ভারতে বজ্রযান মতবাদের যখন শৈশব ও কৈশোর অবস্থা, তখন এই মতবাদ দুর্লঙ্ঘ হিমালয় অতিক্রম করে যায় নেপাল ও তিব্বতে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে এই মতবাদের বিলুপ্তি ঘটলেও হিমালয়ের তুষারশীতল প্রদেশে সযত্নে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত হতে থাকে।

বজ্রযান দেবসঙের আদি দেবতা—আদিবুদ্ধ। সৃষ্টি স্থিতির কার্য কারণ আদিবুদ্ধ। সর্বব্যাপী, সর্বশক্তির আধার আদি বুদ্ধই বজ্র। তাই আদিবুদ্ধ যখন দেবমূর্তিতে কল্পিত, তখন তিনি বজ্রধর নামে কমলের ওপরে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকেন। তার হস্তদ্বয় বক্ষোপরে বজ্র হুঙ্কার মুদ্রায় সজ্জিত। তাঁর দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বাম হস্তে ঘণ্টা, পরিধানে বিচিত্র বস্ত্রসজ্জা, সর্ব অলঙ্কারে ভূষিত। তাঁর শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা। কোথাও বজ্রধর প্রজ্ঞাপারমিতার যুগলমূর্তি দেখা যায়। সেখানে প্রজ্ঞাপারমিতার দক্ষিণ হস্তে কপাল, বাম হস্তে কর্ত্রি। বজ্রধরের একক মূর্তি ও দেখা যায়। একক মূর্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, শূন্য মূর্তি, অদ্বয় মূর্তি। কিন্তু বজ্রধর যখন আপনি শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে অধিষ্ঠিত তখন তার আধ্যাত্মিক অর্থ—করুণা মূর্তি বা দ্বয় মূর্তি। একক মূর্তি—পরমাত্মা; দ্বয় মূর্তি—জীবাত্মা। জীবাত্মার সর্বশেষ পরিণতি পরমাত্মায় লীন হওয়া।

আদিবুদ্ধ থেকে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের উদ্ভব। এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘ সিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। এক একটি ধ্যানীবুদ্ধ আবার এক একটি কুলের দেবতা। বজ্রযানে এই কুলপদ্ধতি এক মৌলিক তন্ত্র। পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তির আধার ও পাঁচটি কুল—দ্বেষ, মোহ, রাগ, চিন্তামণি ও সময় নামেও উল্লিখিত রয়েছে আদিতন্ত্র-গুহ্য সমাজতন্ত্রে। পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ সকলেই ধ্যানাসনে সমাধি অবস্থায় উপবিষ্ট, আসনের নিচে কমল। একটি মুখ ও দ্বিভুজ, নেত্র ধ্যান স্তিমিত ও অর্ধনিমীলিত। পরিধানে তিনটি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড। সকলেই নিরলঙ্কার।

অক্ষোভ্য—দেহের বর্ণ নীল, মুদ্রা ভূমিস্পর্শ, প্রতীক বজ্র, বাহন দুইটি হস্তী। দ্বেষকুল অমিতাভ, দেহবর্ণ লাল, মুদ্রা-সমাধি, প্রতীক পদ্ম, বাহন দুইটি ময়ূর। রাগকুল অমোঘ সিদ্ধি, দেহবর্ণ সবুজ, মুদ্রা অভয়, প্রতীক বিশ্ববজ্র, বাহন দুইটি গরুড়। সময় কুল বৈরোচন, দেহবর্ণ সাদা, মুদ্রা ধর্মচক্র বা বোধ্যঙ্গী মুদ্রা, প্রতীক চক্র, বাহন দুইটি ভীষণাকৃতি সর্প। মোহকুল রত্নসম্ভব, দেহবর্ণ পীত, মুদ্রা বরমুদ্রা, প্রতীক-রত্ন, বাহন দুইটি সিংহ।

চিন্তামণিকুল পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধের পাঁচটি শক্তি রয়েছে। তাঁরা রূপলাবণ্যবতী, চন্দ্রের উপরে ললিতাসনে উপবিষ্টা। বর্ণ ও বাহন নিজ নিজ ধ্যানী বুদ্ধের অনুরূপ। একমুখ ও দ্বিভুজা। দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা, বাম হস্ত বক্ষোপরে ন্যস্ত। তাঁরা সকলেই স্বীয় ধ্যানী বুদ্ধের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি মস্তকে ধারণ করেন। তাঁদের দুই হস্তে পদ্মের ডাঁটি, সে ডাঁটি থেকে উত্থিত পদ্মদ্বয়ে স্বীয় ধ্যানী বুদ্ধের প্রতীক মূর্তি থাকে।

অক্ষোভ্যের শক্তি মামকী, অমিতাভের শক্তি পাণ্ডারা, অমোঘসিদ্ধির শক্তি তারা, বৈরোচনের শক্তি লোচনা, রত্নসম্ভবের শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরী।

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চ বোধিসত্ত্ব মূর্তি রয়েছে। মস্তকে ক্ষুদ্র ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি ধারণ করে তাঁরা নিজ পরিচয় প্রদান করেন। বোধিসত্ত্ব মূর্তি হয় দণ্ডায়মান, নয়তো ললিতাসনে উপবিষ্ট। তাঁরা রাজোচিত বেশভূষা ও অলঙ্কারে ভূষিত। ধ্যানী বুদ্ধের শক্তি তাঁদের মাতৃস্বরূপা। অক্ষোভ্যের বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি, অমিতাভের বোধিসত্ত্ব চক্রপাণি, অমোঘসিদ্ধির বোধিসত্ত্ব বিশ্বপাণি। বৈরোচনের বোধিসত্ত্ব সামন্তভদ্র ও রত্নসম্ভবের বোধিসত্ত্ব রত্নপাণি নামে পরিচিত। বোধি শব্দের অর্থ বোধি জগৎ কারণ, অনাদি ও অনন্ত শূন্যের জ্ঞান, সত্ত্ব অর্থ সার বা মূল। বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি স্থিতির কার্য কারণ জ্ঞান ও অনন্ত শূন্যের জ্ঞান ও সার তত্ত্বই বোধিসত্ত্ব মূর্তির কল্পিত রূপ।

অভয়াকর গুপ্তের নিষ্পন্ন যোগাবলী গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের তিনটি মূর্তির কথা বলা হয়েছে, তবে বোধিসত্ত্ব মূর্তির সংখ্যা সর্বসমেত ষোলটি। এই ষোলটি মূর্তির পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধের কুলসম্ভূত।

সামন্তভদ্র—বৈরোচন ধ্যানী বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব রূপে কল্পিত হলে তাঁর দেহবর্ণ সাদা, রত্নসম্ভবকুলের হলদে, অক্ষোভ্য-কুলের হলে নীল।

অক্ষয়মতি— দেহবর্ণ পীত, রত্নসম্ভব কুলের দ্যোতক।

ক্ষিতিগর্ভ— দেহবর্ণ পীত কখনও বা সবুজ। পীত হলে রত্ন সম্ভব ও হরিদ্বর্ণ হলে অমোঘসিদ্ধিকুলের বোধিসত্ত্ব।

আকাশ গর্ভ—দেহবর্ণ হরিৎ, অমোঘসিদ্ধির দ্যোতক।

গগনগঞ্জ—দেহবর্ণ হলদে অথবা লাল। পীতবর্ণ রত্নসম্ভবও, লাল বর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।

রত্নপাণি—দেহবর্ণ সবুজ অমোঘসিদ্ধির দ্যোতক।

সাগর মতি—দেহবর্ণ শ্বেত, বৈরোচন ধ্যানিবুদ্ধের দ্যোতক।

বজ্র গর্ভ দেহবর্ণ নীল বা নীলাভ শ্বেত। অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

অবলোকিতেশ্বর—দেহবর্ণ শ্বেত। দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা, বাম হস্তে পদ্ম। বজ্রযান দেবসঙ্ঘে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী দেবতা। এই দেবতার ১০৮টি মূর্তি কল্পিত হয়েছিল। ইনিও অমিতাভ কুলের। কিন্তু শ্বেতবর্ণ দেহ বৈরোচনের দ্যোতক।

মহাস্থাম প্রাপ্ত —দেহবর্ণ শ্বেত। বৈরোচনের দ্যোতক।

চন্দ্রপ্রভ—দেহবর্ণ শ্বেত। বৈরোচনের দ্যোতক।

জালিনী প্রভ—দেহবর্ণ লাল সূর্যের ন্যায়। অমিতাভের দ্যোতক।

অমিতপ্রভ—দেহবর্ণ কখনও সাদা কখনও লাল। সাদা রঙ বৈরোচনের, লাল রঙ অমিতাভের।

প্রতিভানকূট—দেহবর্ণ—সবুজ, হলদে বা কখনো লাল। সবুজ অমোঘসিদ্ধির, হলদে রত্নসম্ভবের, লাল অমিতাভের।

সর্বশোকতমো নির্ঘাতমতি—দেহবর্ণ হলদে বা লাল। হলদে রঙ রত্নসম্ভবের, লালরঙ অমিতাভের।

সর্বনিবরণ বিষ্কম্ভী—দেহবর্ণ কখন সাদা, কখনো নীল। সাদা বৈরোচনের, নীল অক্ষোভ্যের।

মৈত্রেয়—দেহবর্ণ পীত। রত্নসম্ভব কুলের।

মঞ্জুশ্রী—বজ্রযান দেবমণ্ডলের আলোকিতেশ্বরের মতো মঞ্জুশ্রী ও মহাশক্তিশালী জনপ্রিয় দেবতা। দেহবর্ণ পীত, রত্নসম্ভবের দ্যোতক। ইহার বক্ষস্থলে প্রজ্ঞাপারমিতা।

গন্ধহস্তি—দেহবর্ণ শ্যাম, আমোঘসিদ্ধির দ্যোতক।

জ্ঞানকেতু—দেহবর্ণ পীত, কখনও বা নীল। পীতবর্ণ—রত্ন সম্ভবের, নীলবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

ভদ্রপাল—দেহবর্ণ কখনও শ্বেত, কখনও বা রক্তবর্ণ। শ্বেতবর্ণ বৈরোচনের, রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।

সর্বা পাঞ্জহ—দেহবর্ণ শ্বেত। অমিতাভের দ্যোতক।

অমোঘদর্শী—দেহবর্ণ পীত। রত্নসম্ভব কুলের।

সুরঙ্গম—দেহবর্ণ শ্বেত বৈরোচনের দ্যোতক।

বজ্রপাণি—দেহবর্ণ শ্বেত, বৈরোচনের দ্যোতক।

অভয়াকর গুপ্তের—নিষ্পন্ন যোগাবলীতেবোধিসত্ত্ব মণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী মৈত্রেয়, অমোঘদর্শী,সর্বপাঞ্জহ, সর্বশোক তমোনির্ঘাতমতি, পূর্বদিকে স্থিত নীলবর্ণের অক্ষোভ্য কুলের বোধিসত্ত্ব।

গন্ধহস্তি, সুরঙ্গম, গগনগঞ্জ ও জ্ঞানকেতু দক্ষিণদিক স্থিত পীতবর্ণের রত্নসম্ভব কুলের। অমিতপ্রভ, চন্দ্রপ্রভ, ভদ্রপাল ও জালিনীপ্রভ পশ্চিমদিকস্থিত, রক্তবর্ণ অমিতাভের সমানরূপ ধারণ করেন।

বজ্রগর্ভ, অক্ষয়মতি, প্রতিভানকূট ও সামন্তভদ্র উত্তরদিকস্থিত হরিদ্বর্ণ অমোঘসিদ্ধির দ্যোতক।

মঞ্জুশ্রী—বৌদ্ধ তন্ত্রে দেবদেবীর মধ্যে মঞ্জুশ্রীর স্থান অতি উচ্চে।

মঞ্জুশ্রী—পরাবিদ্যা ও পরাজ্ঞানের দেবতা। তাঁর দক্ষিণ করে উদ্যত অসি, বাম করে হৃদপ্রদেশে স্থাপিত প্রজ্ঞা-পারমিতা পুস্তক। অসি হস্তে তিনি সকলপ্রকার অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা ছেদন করে পূর্ণ জ্ঞান ও পরাপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করেন

তন্ত্রশাস্ত্র সাধনমালায় তিনি অনেক রূপ ও বর্ণে কল্পিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে বাক্ বা বজ্ররাগ মঞ্জুশ্রী, ধর্মধাতু বাগীশ্বর, মঞ্জুঘোষ, সিদ্ধৈকবীর, বজ্রানন্দ, নামসঙ্গীতি মঞ্জুশ্রী, বাগীশ্বর, মঞ্জুবর, মঞ্জুবজ্র, মঞ্জুকুমার অরপচন, স্থির চক্র ও বাদিরাট্। এর মধ্যে মঞ্জুঘোষ ও বাগীশ্বর মূর্তি সর্বাধিক প্রচলিত।

অবলোকিতেশ্বর—অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধ দেবসঙ্ঘে করুণাময়। জগতের দুঃখ দর্শনে অভিভূত তিনি স্বোপার্জিত নির্বাণ বা মোক্ষ প্ররিত্যাগপূর্বক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যতদিন সকল জীব দুঃখ মুক্ত হতে না পারবে, ততদিন তিনি নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করতে ইচ্ছুক নন। সেজন্য তিনি ভক্তদের মনোমতো রূপ পরিগ্রহ করে জীবকে দুঃখ থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করবেন। অবলোকিতেশ্বরের আদর্শ—মহাযান তন্ত্রের মুলকথা। এই দিব্য ত্যাগের বাণী অবলো-কিতেশ্বর প্রচার করেছিলেন। সবস্দ্ধ ১০৮টি অবলোকিতে-শ্বরের মূর্তি কল্পিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রচলিত নামগুলো দেওয়া হল। অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র ষড়ক্ষরী…ওম্ মণি পদ্মে হুম্।

ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর—সিংহনাদ, খসপর্ণ, লোকনাথ, হালাহল, পদ্মনর্তেশ্বর, হরি হরি হরি বাহনোদ্ভব, ত্রৈলোক্যবশঙ্কর, রক্ত লোকেশ্বর, মায়াজালক্রম, নীলকণ্ঠ, সুগতি সন্দর্শন, প্রেত সন্তপিত, সুখাবতী, বজ্রধর্ম।

অমিতাভ কুল—অমিতাভ কুলের প্রধান দেবতা অবলোকিতেশ্বর ছাড়া ও রয়েছে মহাবল, শপ্তশতিক হয়গ্রীব, কুরু কুল্মার, ভৃকুটি, মহাসিতবতী।

অক্ষোভ্যকুল—চণ্ডরোষণ, হেরুক, বুদ্ধকপাল, সম্বর, সপ্তাক্ষর, মহামায়া, হয়গ্রীব, যমারি, জম্ভল, বিঘ্নান্তক, বজ্রহুঙ্কার, ভূতডামর, বজ্রজ্বালান লার্ক ত্রৈলোক্যবিজয়, পরমাশ্ব, যোগাম্বর, কালচক্র।

অক্ষোভ্যকুলের দেবী—মহাচীন তারা, জাঙ্গুলী, একজটা, পর্ণ শবরী, প্রজ্ঞাপারমিতা, বজ্রচর্চিকা, মহামন্ত্রানুসারিণী, মহা-প্রত্যঙ্গিরা, বসুধারা, নৈরাত্মা, জ্ঞানডাকিনী, বজ্রবিদারণী।

বৈরোচন কুল—নাম সঙ্গীতি, মারিচী, উষ্ণীষ বিজয়া, সিতা তপত্রা অপরাজিতা, মহাসহাস্র প্রমর্দিনী, বজ্রবারাহী। চুন্দা, গ্রহমার্তৃকা।

রত্নসম্ভবকুল—জম্ভল, উচ্ছুষ্ম জম্ভল। বজ্রতারা, বসুধারা, মহাপ্রতি সরা, অপরাজিতা, বজ্রযোগিনী, প্রসন্নতারা।

অমোঘসিদ্ধিকুল—বজ্রামৃত, খদিরবরণী তারা, মহাশ্রীতারা, বশ্যতারা, ষড়ভুজ সিততারা, ধনদতারা, সিততারা, পর্ণশর্বরী, মহামায়ূরী, বজ্রশৃঙ্খলা, বজ্রগান্ধারী।

এই সব দেবদেবীর মধ্যে সিকিমের বিভিন্ন মন্দিরে—অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুঘোষ, মারিচী, হয়গ্রীব, বজ্রবারাহী নামগুলি সুপরিচিত। বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞাপারমিতা একটি ধর্মগ্রন্থ। শূন্যবাদের গ্রন্থ—অষ্ট সহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা ও বিজ্ঞানবাদের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি সহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। মহাযান মতবাদীদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতা।

কথিত আছে মহাযান মতবাদের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগার্জুন এই গ্রন্থ নাগলোক থেকে উদ্ধার করেছিলেন জগতের দুঃখ দুর্দশা গ্রস্থ মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্য। পরে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তককে

বজ্রযানে দেবী রূপে কল্পিত হয়েছিল। প্রজ্ঞাপারমিতা একমুখী, দ্বিভুজা, হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক। শিরে অক্ষোভ্যের ক্ষুদ্র মূর্তি।

আরও কয়েকটি দেবদেবী মূর্তির বর্ণনা বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লিখিত রয়েছে। তার মধ্যে সিকিমে প্রচলিত মূর্তিগুলির নাম—

মঞ্জু ঘোষ সিকিমী নাম জামইয়াঙ্ : মঞ্জুঘোষ বস্তুত মঞ্জুশ্রী মূর্তি একমুখ, দ্বিভুজ, সর্বালঙ্কার ভূষিত। ইনি সিংহের ওপরে উপবিষ্ট, হস্তদ্বয়ে ধর্ম চক্রমুদ্রা। বামপার্শ্বে একটি পদ্ম। দক্ষিণে সুধনকুমার, বামে যমান্তিক মূর্তি দণ্ডায়মান।

হয়গ্রীব—সিকিমী নাম তাম্‌দিন : হয়গ্রীব ভীষণ দর্শন। দংষ্ট্রকরাল বদন, আভরণ সর্প ও নরাস্থি নির্মিত। ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, কেশরাশি অগ্নিশিখার মতো ঊর্ধ্বে উত্থিত। হয়গ্রীবের দেহ রক্তবর্ণ মুখ তিনটি, হাত আটটি। তিনি ললিতাসনে দণ্ডায়মান। তাঁর মুখ্য মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। দক্ষিণ মুখ নীল, বাম মুখ শ্বেত বর্ণের। দেবতার চারিটি দক্ষিণ হস্তে বজ্র, দণ্ড, করণ মুদ্রা ও উদ্যত শর। চারিটি বাম হস্তের একটিতে তর্জনীমুদ্রা, দ্বিতীয়টি স্ববক্ষে স্থাপিত, তৃতীয় হস্তে পদ্ম, চতুর্থে ধনু ধৃত। হয়গ্রীব অক্ষোভ্য কুলের।

বজ্রপাণি—সিকিমী নাম—চা-না দোরজে : বজ্রপাণি শ্বেত মূর্তিতে কল্পিত। এক মুখ ও দ্বিভূজ। দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বাম হস্তে বরমুদ্রা। বজ্রপাণি বৈরোচন কুলের দেবতা।

তারা—সিকিমী নাম দোলমা জাঙ্খু: বজ্রযানীদের দেবদেবীর মধ্যে তারা নাম অনেক স্ত্রী দেবতার। তারা দেবী মানবগণকে সর্ববিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করেন। তারার দেহবর্ণ এক একটি ধ্যানী বুদ্ধের অনুরূপ বলে, তারা পঞ্চবর্ণের। শুক্লতারা, হরিৎ তারা, পীত তারা, নীল তারা ও রক্ত তারা। শুক্লাতারা, হরিৎ তারা, এক মুখ ও দ্বি ভুজা, দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা, বাম হস্তে উৎপল। পীত তারা নীল তারা ও রক্ত তারা একাধিক মুখ ও বহু ভুজা, অনেক ক্ষেত্রেই ভয়ঙ্কর দর্শনা।

বজ্রবারাহী—সিকিমী নাম দোরজে ফাকমো: বজ্রবারাহী হেরুক দেবের অগ্রমহিষী বলে বর্ণিত হয়েছেন। ইনি দিগবসনা একমুখ বিশিষ্টা দ্বিভুজা। ইনি শবের ওপরে অর্ধ পর্যঙ্কাশনে নৃত্যরতা। দক্ষিণ হস্তে উদ্যত কর্ত্রি, বাম হস্তে বক্ষোপরে রক্তপূর্ণ নরকপাল ধৃত। স্কন্ধ থেকে ভীষণাকৃতি খট্টাঙ্গ প্রলম্বিত। দেবীর মুখমণ্ডল ভীষণাকৃতি ও ক্রোধব্যঞ্জক। মাথার পার্শ্বদেশ থেকে একটি বরাহ মুখ বহির্গত হয়েছে বলেই দেবীর নাম বজ্রবারাহী।

মারিচী—সিকিমী নাম ওজার চেনমো: মারিচী বৌদ্ধতন্ত্রে সূর্যের অধীশ্বরী দেবী। মারিচী সপ্তশূকর বাহিত রথারূঢ়া দেবী ত্রিমুখা, অষ্টভুজা। প্রথম মুখটি পীতবর্ণ ও শৃঙ্গার রসের দ্যোতক, বামমুখ নীলবর্ণ, শূকর মুখের ন্যায় বিকৃত, বীররসব্যঞ্জক, দংষ্ট্রকরাল ও লোলজিহ্ব। দক্ষিণ মুখ ঘন রক্ত বর্ণ ও শান্তরসের দ্যোতক রথের বাহন সাতটি শূকরের তলদেশে ভয়দর্শন রাহু। দেবী দুই হস্তে সূর্য চন্দ্র ভক্ষণরতা। দেবীর প্রধান হস্তদ্বয়ে সূচী ও সূত্র। তিনি দুষ্টসত্ত্বের মুখ সেলাই করেন। দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে অঙ্কুশ ও পাশ, তৃতীয় হস্তদ্বয়ে ধনু ও বাণ, চতুর্থ হস্তদ্বয়ে বজ্র ও অশোকপল্লব ধারণ করেন।

কুবের—সিকিমী নাম নামসে: উত্তর দিকের অধিপতি, পীতবর্ণ, এক মুখ ও দ্বিভুজ। ইনি নরবাহন দুই হাতে গদা ও অঙ্কুশ ধারণ করেন। ইনি রত্নসম্ভবের দ্যোতক।

যম—সিকিমী নাম দোরজে ঝিক চে: দক্ষিণ দিকের অধিপতি, নীলবর্ণ, একমুখ দ্বিভুজ। বাহন মহিষ এক হাতে যমদণ্ড, অপর হাতে যমদণ্ড ও শূল। ইনি অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

বজ্রযানের দেবসঙ্ঘের এই মূর্তিগুলি সিকিমের বিভিন্ন মন্দিরেই রয়েছে। সব শুদ্ধ পয়ত্রিশটি বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির। এই মঠ ও মন্দিরগুলির পরিবেশ ও নির্মাণ কৌশল, কারু কার্য প্রায় একই রকমের। তবে মন্দিরের আভ্যন্তরীণ শিল্পকলা, ও চিত্রকলার নৈপুণ্য

সবক্ষেত্রে সমান নয়। মন্দিরের উপযুক্ত পরিবেশ, দরজা, জানালা, অভ্যন্তরে স্থাপিত মূর্তি, বেদী ও বেদী সজ্জায় মূলতঃ তফাত খুব সামান্যই। তার কারণ, সম্ভবত সবগুলিই নির্মিত হয়েছিল শাস্ত্র-সম্মতভাবে।

বৌদ্ধধর্মে প্রকৃতপক্ষে মূর্তি স্থাপনের মতো মন্দির স্থাপনের কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তনের যুগে বজ্রযানী সম্প্রদায় মন্দির প্রতিষ্ঠা, মন্দিরে মূর্তি স্থাপন সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ হয়েছিলেন।

মন্দির নির্মাণ, বৌদ্ধ মঠ স্থাপন, মন্দিরের অঙ্গসজ্জা, অভ্যন্তরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বৌদ্ধতন্ত্রের নির্দেশ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে পেমিওংচি বৌদ্ধ মন্দিরে। সিকিমের নয়াবাজার থেকে জীপে লেগসিপ, হয়ে গেইজিঙ। গেইজিঙ থেকে প্রায় ছয়মাইল হাঁটাপথ, পেমিওংচির কাছেই সুদৃশ্য চোর্তেন আর মেণ্ডঙ, তার পর প্রশস্ত উপত্যকার মতো। সেখানে প্রচীন বৌদ্ধ মন্দির পেমিওংচি। টাশীডিঙ থেকে ও পেমিওংচি যাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে খাড়া উৎরাই ভেঙে পৌঁছতে হয় র‍্যাথঙ নদীর তটভূমিতে। নদীর ওপরকার সেতু পেরিয়ে আবার চড়াই ভেঙে উঠতে হয় পেমিওংচির শিখর দেশে। ইয়কৃসাম থেকেও পেমিওংচি যাবার পথটি ওমোটামুটি টাশীডিঙের মতো কষ্টসাধ্য। লোবসাঙ আমাকে পেমিওংচি নিয়ে গিয়েছিল। এত বড় একটা বৌদ্ধ মন্দির দর্শন হবে না, সে কেমন কথা। কিন্তু খেসারতও কম দিতে হয় নি। কারণ যাত্রীরা সাধারণত গেইজিঙ হয়ে পেমিওংচি আসেন, সেখান থেকে নেমে আসেন ইয়কৃসামে। পথের কষ্ট লাঘব হয়। ইয়কৃসামের উচ্চতা ৫৬০০ফুট, অন্যদিকে পেমিওংচি উচ্চতা ৭০৮৩ফুট। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পেমিওংচি পৌঁছলে কিন্তু মনে হবে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। পেমিওংচির মন্দির ও মঠ স্থাপিত হয়েছিল ১৭০৫ সনে সিকিমের তৃতীয় চোগিয়াল চাডোর নামগিয়ালেয় সময়। এই

মন্দির ও মঠটি সিকিমের বৃহত্তম বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ। এখানে ১০৮ জন লামা বাস করেন। পেমিওঙচির উচ্চতা—দার্জিলিঙের সমান, সিকিমের টেনডঙ গিরিশিখর ও পেমিওঙচির সমান উচ্চতাবিশিষ্ট। টেনডঙ সম্পর্কে কথিত আছে, মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত পৃথিবী যখন জলমগ্ন হয়েছিল, তখন এই পাহাড়টির শীর্ষে নৌকা বাধা হয়েছিল ভগবানের নির্দেশে। এই নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল মানুষ, নানা জীবজন্তু। এই কাহিনীর সঙ্গে মৎস্যপুরাণের কাহিনী, বাইবেলে নোয়ার জাহাজের কাহিনীর বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।

পেমিওঙচির মন্দির সিকিমের তৃতীয় প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের অবস্থান ও পরিবেশ টাশীডিঙের মন্দিরের অনুরূপ। তবে টাশীডিঙের দুগাঙ মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের চাইতেও পেমিওঙচির মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ আরও বিচিত্রবর্ণে ও ছবিতে চিত্রিত। বিশেষ করে কড়ি বরগাগুলো নানা চিত্রে চিত্রিত। ছাতের গায়ে বিশাল আকার পদ্ম অঙ্কিত। দেওয়ালে আঁকানো লামাদের ছবি। মন্দিরের মুখ্য মূর্তি শাক্যসিংহের। শাক্যসিংহ নীল রেশমী চন্দ্রাতপের নিচে আসনে উপবিষ্ট। পাশেই পূর্বতন রাজার মূর্তি। রাজার মাথায় রাজমুকুট। পেমিওঙচি শব্দের অর্থ 'অপরূপ নিখুঁত পদ্ম'। পেমিওঙচি সিকিমের প্রাচীন রাজধানী ছিল। একে বলা হত সিকিম দবরার। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে কয়েক ফুট নিচে রাজপ্রাসাদ ও তার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। নেপাল যুদ্ধের সময় রাজা এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে ছিলেন। তখন গুর্খা সৈন্যদল যথেচ্ছ পেমিওঙচি, টাশীডিঙ ও সাঙা-ছোলিঙের মন্দির লুণ্ঠন করেছিল। সেই সময় পেমিওঙচির পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত ছিল সিকিমের প্রাচীন তথ্যসংবলিত ইতিহাস। পুরু তিব্বতের তৈরি লম্বা কাগজে লেখা ছিল। কাগজ কালো রঙ করা ছিল যাতে পোকায় বিনষ্ট না করে। ঐ কালো রঙের কাগজে হলদে বা সোনালী রঙের লেখা ছিল। গুর্খা সৈন্যদল এই কাগজগুলো দিয়ে যথেচ্ছভাবে ছাউনি তৈরি করেছিল। পুস্তকের প্রতিটি খণ্ডে ছিল

কয়েকশ' করে পাতা। বৈদেশিক আক্রমণে এই মূল্যবান তথ্য বিনষ্ট হওয়ায় সিকিমের অনেক রহস্যই অনাবিষ্কৃত হয়ে থাকবে। টাশীডিঙের মতো পেমিওঙ্‌চিতেও চৈত্য ও মেণ্ডঙ আছে। এই মেণ্ডঙ প্রায় দশ ফুট উচ্চ, ছয় থেকে আটফুট দীর্ঘ ও প্রস্থ। সমস্তটাই স্লেট পাথর সাজিয়ে চতুর্ভুজাকার স্তূপে পরিণত করা। এর চারপাশে অবলোকিতে-শ্বরের মন্ত্র ওম্‌ মণিপদ্মে হুম্‌ খোদাই করা। পেমিওঙচির দুই মাইল পশ্চিমে একই গিরিশিরার ওপরে অবস্থিত সিকিমের সব চাইতে প্রাচীন মন্দির সাঙা ছোলিঙ। এই বৌদ্ধবিহারে মোট পঁচিশ জন লামা বাস করেন।

চৌদ্দ

হাঁটতে হাঁটতে লোবসাঙের সঙ্গে এগিয়ে চলি নরবুগাঙের পথ ধরে।

আরু গাছের ছায়ায় ছাওয়া পথ, দুধারে টুকরো টুকরো পাথর সাজিয়ে পাঁচিল তুলে দেওয়া। কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ আমায় হাতছানি দিয়ে যেন নিয়ে আসে সিকিমের রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্মৃতি বিজড়িত স্থানের দিকে। এ পথ ভুলবার উপায় নেই, বেশ দূর থেকেই নজরে পড়বে বিশাল শ্বেতশুভ্র চোর্তেন। তার শীর্ষ দেশ সরু হয়ে যেন পাইন আর দেওদার গাছের ডগা ছুঁই ছুঁই করছে। অনেকগুলো প্রার্থনা পতাকা, পুরাতন ও নতুন সব মিলিয়ে বুঝি সংখ্যাতীত প্রার্থনার ভাষা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। প্রার্থনা পতাকায় লিপিবদ্ধ লেখা ঝড় বৃষ্টি, আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রচণ্ড দাপটে ধুয়ে মুছে যেতে বসেছে। তবু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি ওগুলোর দিকে। বিস্ময় বোধ করি বার বার ভাবতে ভাবতে,

কত জনমানসের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এই পতাকায়। যাঁরা হয়তো দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করেছেন, প্রার্থনা করেছেন সাফল্য লাভের, তাঁরা অনেকেই বুঝি পৃথিবীর আলো বাতাসের এক্তিয়ার ছাড়িয়ে চলে গেছেন মৃত্যুর অজানা অন্ধকারে চিরদিনের মতো হারিয়ে। প্রার্থনার জগতে যাঁরা সব বাধা বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তাঁরা হয়তো ভাবতেই পারে নি মৃত্যুর অসীম ক্ষমতার কাছে পরাভব স্বীকার করতে হবে তাঁদের। প্রার্থনা পতাকাগুলো তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ হয়ে রয়েছে আজও।

বৃদ্ধ এক লামাকে উপবিষ্ট দেখে লোবসাঙ আমাকে নিয়ে এগিয়ে যায় তাঁর কাছে। নির্বিকার বৃদ্ধ লামা, পাথরের মতো যেন স্থির ও অচঞ্চল। আমাকে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখেন নীরবে। তাঁর বয়স মনে হয় সত্তরের কাছাকাছি। বার্ধ্যকে জর্জরিত দেহ, ছোট ছোট চোখ দুটো কোঁচকানো গালের চামড়ার খাঁজে লুকিয়ে থেকেও যেন জ্বলজ্বল করে। হাতে তাঁর দীর্ঘ প্রবালের মালা, বিড়বিড় করে মন্ত্র জপ করেন সর্বক্ষণের জন্য। লামার দিকে তাকাতেই আমার দুচোখে জেগে ওঠে অদম্য কৌতূহল। লোবসাঙ আমার পরিচয় দিতেই লামা ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করেন, কি জন্য এসেছ এদেশে?

তাই তো, থম্‌কে যাই মুহূর্তের জন্য। এদেশে কেন এসেছি? না এসে বোধ হয় আর কোনো উপায় ছিল না তাই। আমাকে নিরুত্তর দেখে লামা হাসেন। নিঃশব্দ তাঁর হাসি। হাসলে দন্তবিহীন মাড়ীর কিয়দংশ পড়ে বেরিয়ে, কপালের কোঁচকানো চামড়া আরও কুঁচকে যায়। লামা বলেন, কি দেখতে এসেছ?

আমি যেন এক ত্রিকালজ্ঞের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, যিনি এই স্বপ্নরাজ্যের পাহাড় পর্বত আর মাটি পাথরের কথা শুনেছেন দীর্ঘকাল ধরে। যাঁর মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত আছে বিচিত্র গাছপালা ভরা গভীর অরণ্য তুষারাবৃত গিরিপথ আর কাকচক্ষু সরোবরের

গভীর রহস্যের চাবিকাঠি। কেমন যেন আনমনা হয়ে যাই। নীল আকাশ মেঘশূন্য, তবু একটানা ঝড়ো হাওয়ায় প্রার্থনা পতাকা-গুলো উড়তে থাকে। নরবুগাঙের বিশাল চোর্তেনের ওপরে কয়েকটা নাম না জানা পাখি উড়ে বেড়ায়। ঐ তো সেই পাষাণবেদী, ঐখানেই কি ফুন্টসগ নামগিয়ালকে বসিয়ে লাহ্বছেন ছেম্বু বলেছিলেন, হে সিকিমের প্রথম চোগিয়াল, এই সোনার দেশ বে উইল ডেমোজঙ, "শস্য সম্ভারে পরিপূর্ণ উপত্যকা"র প্রথম প্রতিভূ, তুমি এদেশের পাহাড় পর্বত, নদী সরোবরে থুকজে ছেম্বুর অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে দাও।

হঠাৎ যেন লামার কণ্ঠ শুনে বাস্তবে ফিরে আসি। লামা বলেন—এই দেশ দেখতে এসেছ? কি দেখবে, এ দেশের? মাটি, পাথর, সরোবর, গাছপালা? না মানুষ, যারা পাহাড়ের বুকে জন্মেছে। বড় হয়েছে পাহাড়ের ধূলি মাটি মেখে?

লোবসাঙ আমাকে ইঙ্গিতে জানায়, লামা খুবই বিজ্ঞ। না বললেও চলত, কারণ কথা বলবার রীতি দেখেই অনুমান করছিলাম। আমি তাই নীরবে তাকিয়ে থাকি লামার মুখের দিকে। লামা বলেন, তোমার দেশ থেকেই গুরু পদ্মসম্ভব এসেছিলেন এদেশে। তুমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তিনি তোমাকে এ দেশে নিয়ে এসেছেন।

আমি বিনীতভাবে বলি—আমি সমতলের মানুষ, দুর্গম পথ পেরিয়ে এসেছি এদেশ দেখতে। লামা বোধহয় খুশী হন আমার বিনীতভাবের জন্য। বিশেষ করে লোবসাঙ যখন লামাকে জানায় যে সিকিমের লামা, বৌদ্ধ বিহার ও বিভিন্ন পবিত্র স্থান সম্পর্কে আমার বিপুল আগ্রহ। বৃদ্ধ লামার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে, লোবসাঙের সাহায্যে আলাপ জমে ওঠে। তাঁর কাছেই শুনি, কাতক পোখরীর যে পবিত্র জলে অবগাহন করিয়ে ফুন্টসগের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল, সে জল এখন আর পবিত্র নেই। কালের আবর্তনে, সংস্কারসাধনের অভাবে, আর

সরোবরের জল যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের জন্যই হয়তো অপবিত্র হয়েছে সরোবর। সে জলে এখন মোষগুলো দলবেঁধে গা ডুবিয়ে থাকে। তটভূমিতে ঝোপঝাড়, শেওলা আর ভেকের দল। এ জল আর তাই কোনো উৎসব বা উপাসনার কাজে ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে খেচুপেড়ি সরোবরের জল অত্যন্ত পবিত্র।

খেচুপেড়ি ইয়ক্সাম থেকে সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে। পাহাড়ী চড়াই উৎরাই পথ, তাই পথ চলা বেশ কষ্টসাধ্য। সেখানে আছে সুদৃশ্য কাকচক্ষু সরোবর, আর প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। অবশ্য অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারের তুলনায় খেচুপেড়ির মন্দির আয়তনে ক্ষুদ্র। ইয়ক্সাম থেকে পশ্চিমদিকে চলে গিয়েছে পাকদণ্ডী রাস্তা। সে পথ নেমে গিয়েছে র‍্যাথঙ নদীর তটভূমি পর্যন্ত। র‍্যাথঙ নদীর তটভূমির উচ্চতা প্রায় ৩৭৯০ ফুট, মোট উৎরাই ১৮১০ ফুট। র‍্যাথঙ নদীর ওপারে উত্তুঙ্গ চড়াই। বেশ প্রশস্ত পায়ে চলা পথ ওক, পাইন আর দেওদার গাছের ছায়ায় ছায়ায় মাইলের পর মাইল শুধু চড়াই। মাইল কয়েক যাবার পরই প্রথম ছোট্ট গ্রাম লুঙশ্চুঙ্। মাত্র গুটি কয়েক ঘর। সেই ঘরের একই নির্মাণ পদ্ধতি। ঘরগুলি স্লেট-পাথরের ছাওয়া। আঙ্গিনার সামনে স্বল্প পরিসর স্থানে শাকসবজি, বাড়ি সংলগ্ন কমলালেবুর গাছ, কাঁচা পাকা কমলালেবুর বিচিত্র বর্ণ বহুদূর থেকে নিপুণ শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো মনে হয়। লুঙশ্চুঙ্ ছাড়িয়ে আরও প্রায় মাইল দুয়েক যাবার পর আরও একটি ছোট্ট গ্রাম নাম লুথাঙ্। এই গ্রামগুলোর ঠিক উল্টো দিকেই ইয়ক্সাম। লুথাঙ্ গ্রাম থেকে প্রায় হাজার খানেক ফুট চড়াই ভেঙে পৌঁছতে হয় খেচুপেড়ি গিরিশিরায়। পাইন, দেওদার আর রোডোডেনড্রন গাছে ছাওয়া গভীর জঙ্গল, মাঝে মাঝে বাঁশঝাড়। এই জঙ্গলের মধ্যেই বেশ কিছুটা পরিষ্কার স্থানে টলটলে জলের সরোবর। জলের ধারের ভিজে মাটি কাদা, সেই কাদার ওপরে সবুজ শেওলা আর জলজ উদ্ভিদ্। খেচুপেড়ি সরোবর থেকে কোনো

ধারা বেরিয়ে যায় নি। যে জন্য বর্ষণের সময় জলের উচ্চতা বেড়ে যায়, কুল ছাপিয়ে জলের সীমা অনেক উঁচুতে ওঠে। বর্ষার পর জল শুকিয়ে যেতে শুরু করে, যার জন্য সরোবরের যে অংশ থেকে জল নেমে যায়, সে অংশ কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। তটভূমির চারপাশে উঁচু শক্ত মাটিতে রোডোডেনড্রনের বিচিত্র ফুল ফুটে এক স্বর্গীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করে। লাল আর গোলাপী রঙের রোডোডেনড্রনই বেশী।

খেচুপেড়ি সরোবরের উচ্চতা ৬০৪০ ফুট। চারপাশে গভীর জঙ্গল, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, ঠাণ্ডা তাই বেশি।

প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী স্থানীয় লামা এসে একটুকরো গাছের ছালে জুনিপারে শুকনো পাতা ও গন্ধদ্রব্য রেখে ওতে অগ্নি সংযোগ করে সরোবরের জলে ভাসিয়ে দেবেন ছাল। জলে ভাসমান ছালের ওপর থেকে সুগন্ধি ধোঁয়া উঠতে থাকবে। লামা তখন নির্জন সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে পাহাড়, নদী, ঝরনা ও সরোবরের বসবাসকারী সমস্ত অপদেবতাদের তুষ্টিবিধানের জন্য মন্ত্র পাঠ করবেন উচ্চৈস্বরে। মন্ত্রটির ভাষা সংস্কৃত বা পালি নয়। স্থানীয় লেপচা ও তিব্বতীয় ভাষার সংমিশ্রণ :

"কাঞ্চিনজিঙ্গা, পেমিকাছুপ
নে-চে তাঙ্‌লা, ছুবশা তেম্বার
জুভিঙ্গা পেম্‌সুন্‌ সারকিয়েম
ছি শ্বজে কুব্‌রা, কাঞ্চিন টঙ্‌"

মন্ত্রের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও কাব্রু গিরিশিখরের উল্লেখ রয়েছে বেশ বোঝা যায়। এই মন্ত্র ও অপদেবতা তুষ্ট করবার পদ্ধতি, সিকিমে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রবর্তনের আগে থেকেই প্রচলিত। বজ্রযান মতবাদ, লেপচাদের প্রাচীন সংস্কারমুক্ত করতে পারে নি, বরং বজ্রযান মতবাদের মধ্যেই লেপচাদের স্তবস্তুতির পদ্ধতি, অপদেবতাদের তুষ্ট করবার রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করেছে। ধর্ম যে দেশকালপাত্র উপযোগী হয়ে ওঠে, সিকিমের বজ্রযান মতবাদ তার বোধহয় সব চাইতে বড় উদাহরণ।

সরোবর থেকে প্রায় পাঁচশ' ফুট চড়াই ভাঙবার পরে গিরিশিরার ওপরে অপ্রশস্ত স্থানে খেচুপেড়ির বৌদ্ধ মন্দির। পশ্চিম-উত্তরে পাইন আর দেওদারের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তুষার শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তার সভাসদবর্গ। খেচুপেড়ি শব্দের অর্থ 'পবিত্র স্বর্গধামে পৌঁছবার উপযোগী গিরিশিখর'। নামকরণের তাৎপর্য জানি না। মন্দিরের সামনেই মহামহিমান্বিত সম্রাট কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তার বিশাল পারিষদ যেন এক অপরূপ পরিবেশ রচনা করেছে। স্বর্গীয় পরিবেশ নিশ্চয়ই। খেচুপেড়ি সরোবরে তীরে দাঁড়িয়ে লামারা দেবতা তুষ্টির জন্য যে মন্ত্র পাঠ করেন—তার মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও কাব্রুর নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই মন্ত্র রচয়িতা সন্ন্যাসী কাঞ্চনজঙ্ঘা ও কাব্রুর বিশালতা, খেচুপেড়ির মন্দিরের স্থান থেকে উপলব্ধি করেছিলেন নিশ্চয়ই।

খেচুপেড়ির মন্দির স্থাপিত হয়েছে আনুমানিক ১৭৪০ সনে। মন্দিরের গঠন বৈচিত্র্য, সিকিমের অন্যান্য মন্দিরের মতোই। এই বৌদ্ধ মঠে এগারোজন লামা বসবাস করে থাকেন। খেচুপেড়ি মঠের উচ্চতা ৬৪৮৫ ফুট, শীতে প্রবল তুষারপাত হয় কখনও। তখন কাঞ্চনজঙ্ঘার বুক থেকে ছুটে আসে তীব্র হিমেল হাওয়া, আর গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার। লামারা সেই সর্বশক্তিমান কাঞ্চনজঙ্ঘার রুদ্রমূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকেন মুগ্ধ বিস্ময়ে। খেচুপেড়ির বৌদ্ধ বিহারের দূরত্ব আনুমানিক তের চৌদ্দ মাইল। উৎরাই আর চড়াই মিলে সমস্ত পথটাকে সহজসাধ্য বলা চলে না। তবে মাঝে মাঝে বিশ্রামযোগ্য ছোট গ্রাম রয়েছে। যার জন্য দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি দূর হয়। খেচুপেড়ি থেকে শুধু উৎরাই, পথ যেন নেমে গেছে হুড়মুড় করে দক্ষিণদিকে প্রায় হাজারখানেক ফুট। সেখানে তেওলিঙ নামে ছোট জলধারা, জলধারা পেরিয়ে সামান্য দূরেই তেওলিঙ গ্রাম। গ্রামের উচ্চতা ৫২২৭ ফুট। বেশ ছোটখাটো সুদৃশ্য গ্রাম। খেচুপেড়ি থেকে দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। তেওলিঙ থেকে

আরও মাইল দুয়েক এগিয়ে একই উচ্চতায় মল্লিগ্রাম। মল্লি-গ্রামে খেচুপেড়ির মতোই রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। সেই বৌদ্ধ বিহারে পনের জন লামা বসবাস করেন। মল্লি বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়েছিল ১৭৪০ সনে। মনে হয় খেচুপেড়ি ও মল্লির বৌদ্ধ বিহার প্রায় নির্মিত হয়েছিল একই সময়ে। মল্লি বৌদ্ধ বিহার থেকে পথ নেমে গিয়েছে আরও দুহাজার ফুট নিচে রুঙবী নদীর তটভূমিতে। সেখানকার উচ্চতা ৩৩০০ ফুট। রুঙবী নদী পশ্চিমে সিকিম নেপাল সীমান্তে উৎপন্ন হয়ে ইয়ক্সামের দক্ষিণে র‍্যাথঙ নদীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে। নদী পেরিয়ে পথ উঠে গেছে গিরিশিরার কোল বেয়ে। শুধু চড়াই আর চড়াই, মোট ৩৫০০ ফুট চড়াই ভেঙে পৌঁছতে হয় চঙ্পঙ্ গ্রামে। সেখান থেকে সাঙাছোলিঙ সামান্য একটু দূরে। চঙপঙ গ্রাম পেরিয়ে এগিয়ে যেতেই নজরে পড়বে পুরানো চোর্তেন মাঝে মাঝে বাঁশঝাড় আর রোডোডেনড্রনের সমারোহ। ভিজে পাথর আর গাছের গুঁড়ির গায়ে অজস্র জোঁক।

সাঙাছোলিঙের প্রধান মন্দির বেশ বড় ও দ্বিতল। মন্দিরসংলগ্ন রয়েছে আরও ছোট ছোট মন্দির। লামাদের বসবাসের উপযোগী বাসস্থানও আছে। সিকিমের সব চাইতে প্রাচীন ও প্রথম এই বৌদ্ধ মঠটি নির্মিত হয়েছিল ১৬৯৭ সনে। সেখানে তখন পঁচিশজন লামার বসবাসোপযোগী বাসস্থান ছিল। পরবর্তীকালে পুরোনো মন্দির-গুলো ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলে আবার সংস্কারসাধন করা হয়। সিকিমের বৌদ্ধ মন্দিরগুলোর প্রধান লামা পূর্বে তিব্বত থেকে নিযুক্ত হতেন। তাঁদের কিন্তু অবতার পুরুষ বলে মনে করা হত না। দালাই লামা নির্বাচনের মতো স্বপ্ন দেখে কোনো শিশুকে খুঁজে বার করে লামা পদে অধিষ্ঠিত করার কোনো নজিরও নেই।

সিকিমের সর্বত্র পঁয়ত্রিশটি বৌদ্ধ মঠ রয়েছে ছড়ানো। সেই বৌদ্ধ মঠে ৯২৫ জন লামার বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। পরে, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হাজারের ওপরে হয়। পঁয়ত্রিশটি মঠের মধ্যে চারিটি

মঠ প্রাচীন বলে সর্বত্র পূজিত হয়ে থাকে। এই মঠগুলি—

মঠের নাম	নির্মাণকাল	বসবাসকারী লামার সংখ্যা
সাঙাছোলিঙ	১৬৯৭ সন	২৫
ডুবদি	১৭০১ সন	৩০
পেমিওঙচি	১৭০৫ সন	১০৮
টাশীডিঙ	১৭১৫ সন	২০

প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে এই মঠগুলি সিকিমীদের মনে এক শ্রদ্ধা ভক্তির আসন নিয়ে রয়েছে। সিকিমের সবচাইতে বৃহৎ বৌদ্ধমঠ পেমিওঙচি। বৃহত্তম মঠ হিসাবে এটি সিকিমের অন্যান্য মঠগুলির ওপর অনেক ক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করত। সিকিমের সমস্ত বৌদ্ধ বিহারের লামাদের প্রধান বসবাস করেন এখানে। তার পরে অন্যান্য মঠের লামা ও সাধারণ লামার স্থান। বৌদ্ধ বিহারের অনেক স্থানেই সন্ন্যাসিনীও আছেন। অধিকাংশ লামাই নির্জনে সাধনভজন করে সময় অতিবাহিত করেন। নিম্নস্তরের লামারা বাগানের পরিচর্যা ও অনেক ক্ষেত্রে বৌদ্ধ বিহারের অধীনস্থ শস্যক্ষেত্রে চাষাবাদও করে থাকেন।

লামাদের জীবন সম্পর্কে আমার কৌতূহল বেড়ে যায়। দালাই লামার পোতালা প্রসাদের নির্জন কক্ষে একাকী জীবনযাপনের কাহিনী পড়েছি। শুনেছি, সিকিমের ডুবদি বৌদ্ধ বিহারের প্রধান লামা সংসারী মানুষের সুখদুঃখ আশা-নিরাশার কথা শুনেছি, সংসারজীবন সম্পর্কে অবাঞ্ছিত কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। পরে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি লামা ধর্মের কঠোর নিয়মভঙ্গ করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংযমী জীবন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মহাপাপ করেছেন। তিনি অন্যান্য লামাদের আহ্বান করে তাই নিজের পাপ সম্পর্কে ব্যক্ত করে প্রায়শ্চিত্ত শুরু করেন। প্রায়শ্চিত্তের বিধান নিজের জন্য স্থির করেন নিজেই। বিধান অনুযায়ী দীর্ঘ আটবৎসর নির্জন কক্ষে নির্জন বাস। এই আটবৎসর তিনি কারও মুখ দর্শন করবেন

না। নির্জন কক্ষে রুদ্ধ দ্বারে কঠোর সংযমের ভেতর দিয়ে দিন অতিবাহিত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে, কঠোর শাস্তি, ধৈর্য ও তিতিক্ষার চরম পরীক্ষা।

সিকিমের বৌদ্ধ মন্দিরগুলির নাম 'লা-খাঙ্' অর্থাৎ ঈশ্বরের আবাসস্থল। কিন্তু যেহেতু মন্দিরের অভ্যন্তরে লামারা দলবদ্ধভাবে প্রার্থনার জন্য হাজির হন, সেই জন্য মন্দিরের অপর নাম ডু-খাঙ্ বা প্রার্থনার ঘর। এ ছাড়া মন্দিরে শিক্ষার্থী লামারা আসেন বলে মন্দিরের আরও একটি নাম আছে—ৎস্যুগ লাগ্ খাঙ্ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই তিনটি নামের মধ্যে লা-খাঙ্ নামটিই বিশেষভাবে প্রচলিত। বিশেষ করে মন্দিরের নিচের তলার ঘরটিকেই লা-খাঙ্ বলা হয়ে থাকে।

মন্দিরের অবস্থান, মন্দির স্থাপনের আদর্শ স্থান কি হবে, সে নির্দেশও থাকে শাস্ত্রগ্রন্থে। মন্দিরের উপযুক্ত স্থান কোনো গিরিশিরার শীর্ষে বিস্তৃত অংশে। মন্দিরের সামনে হ্রদ, ঝরনা বা জলপ্রপাত স্থান মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে। মন্দিরের পূর্বদিকটা উন্মুক্ত থাকা চাই, যাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গেই, সূর্যের সোনালী রশ্মি এসে উদ্ভাসিত করতে পারে মন্দির গাত্র। মন্দিরের প্রধান দরজা থাকা উচিত পূর্বদিকে, অথবা দক্ষিণদিকে, কিংবা দক্ষিণ-পূর্বে।

পাহাড়ের পাথরের পিছনে
ছোট্ট হ্রদ বা ঝরনার সামনে

মন্দিরের অঙ্গিনায় প্রবেশ মুখেই থাকা উচিত প্রার্থনা পতাকা, চোর্তেন ও মেণ্ডঙ। মন্দিরের সামনে নদী থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে নদী যেন দৃশ্যমান না হয়, নদীর কলধ্বনি যেন না শোনা যায়।

মন্দিরের বহিঃদিকটায় বেশ মাঝারি ধরনের চওড়া পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা সমস্ত মন্দিরের চারপাশে ঘিরে থাকবে, যাতে তীর্থযাত্রীরা সুন্দর ও স্বচ্ছন্দভাবে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে পারেন। পথের ওপরে গাছের ছায়া থাকলে নিশ্চয়ই ভাল।

মন্দিরের গোড়ার দিকটা মোটামুটি হবে বর্গাকার। পাথরের দেওয়ালগুলি সাদা রঙকরা উচিত। মন্দিরের ছাউনি বা চালের অনেক অংশই বেরিয়ে থাকবে চারধারে। ছাউনির এই বেরিয়ে থাকা অংশ যাতে ঝড়ে উড়ে না যায়, সে জন্য চারকোনা দড়ি দিয়ে শক্ত করে মাটিতে পোঁতা খুঁটির সঙ্গে থাকবে টেনে বাঁধা। মন্দিরের শীর্ষদেশে থাকবে দুটি বা একটি ঘণ্টার মতো আকৃতিবিশিষ্ট। এই অংশটি তামা দিয়ে নির্মিত, একে বলা হয়, জে রে। প্রকৃতপক্ষে মন্দির দোচালা টিনের ঘরের মতো। এই চালের শিরার মতো অংশে থাকবে একটি ঘণ্টার মতো আকৃতিবিশিষ্ট ছোট গম্বুজ। একে বলা হয় গিয়ালৎসেন। এই অংশটি ছত্রের মতো, যাকে মনে করা হয় জয়ের ও সৌভাগ্যের প্রতীক। মন্দির সাধারণত দোতলা হয়। এই দোতলায় উঠবার জন্য বাইরের দিক থেকে থাকে মই লাগানো। মন্দিরের সম্মুখভাগে থাকবে কাঠের ব্যালকনি। সেই ব্যালকনির কড়িকাঠ বাঁকানো। মন্দিরের দরজা নানা রঙেরও চিত্রে সজ্জিত থাকবে। সেখানে প্রবেশের জন্য বিশেষ আচরণ-বিধি প্রচলিত আছে। তীর্থযাত্রী বা দর্শক অভ্যন্তরে এমনভাবে প্রবেশ করবে যাতে তাঁর ডান হাতের দিকে দেওয়াল থাকে। ঠিক এমনি করে তীর্থযাত্রী বা দর্শককে মন্দির প্রদক্ষিণও করতে হয়।

ব্যালকনির দরজায় বজ্রযানী শাস্ত্রের অনেক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাযুক্ত চিত্র থাকবে অঙ্কিত, অভ্যন্তরেও থাকবে অনেক শাস্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা ছবিতে প্রকাশ করা। যেমন পেমিওঙচির ব্যালকনির দরজায় সাতটি মূল্যবান চিত্র-চক্র, শ্বেতহস্তী, উড়ন্ত অশ্ব, মণি, সৈন্যাধক্ষ্য, সচিব ও রমণী বুদ্ধমূর্তির পাদদেশে অঙ্কিত রয়েছে।

পথের সীমানায় প্রায় তিন ফুট উচ্চে অনেক ক্ষেত্রে মন্দির গাত্রে প্রার্থনা চক্র স্থাপিত থাকে। তীর্থযাত্রী ও দর্শকরা পরিক্রমার সময় এই চক্রগুলি দ্রুত ঘুরিয়ে দিয়ে এগুতে থাকে। সিকিমে মন্দির পরিক্রমার সঙ্গে ভারতের হিন্দু মন্দির পরিক্রমার হুবহু মিল

রয়েছে। তবে হিন্দু মন্দিরে পরিক্রমার শেষে মন্দিরের সম্মুখভাগে ঝুলিয়ে রাখা ঘণ্টা বাজায় তীর্থযাত্রীরা। প্রধান দরজা দিয়ে প্রবেশের সময় কয়েক ধাপ সোপান পেরুতে হয়। এই সোপানশ্রেণীর পরে অন্দরে প্রবেশ মুখে ইয়াকের লোম দিয়ে বানানো বিশাল পর্দা থাকে টাঙানো। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ মুখে তোরণ দ্বারে বিশালাকৃতি ভয়াবহ মূর্তি স্থাপন করা হয়। এই মূর্তিগুলির মধ্যে থাকে স্থানীয় অঞ্চলের দৈত্যের মূর্তি। দৈত্যগুলির কার্যকলাপও অত্যন্ত খারাপ। এই মূর্তিগুলির মধ্যে পুরুষ মূর্তির দেহের বর্ণ লাল।

পেমিওঙচির মন্দিরে এই দৈত্যের মূর্তি রয়েছে। তার মুখমণ্ডল কপিশ বর্ণ। দৈত্যটি শ্বেতহস্তীর ওপরে উপবিষ্ট। তার নাম গিয়াল্‌পো শাক্‌দেন। এই গিয়ালপো শাক্‌দেন সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে।

কথিত আছে, গিয়ালপো শাকদেন্ পূর্বে পাঞ্চেন সদ্‌নাম গ্রাক্‌স্ পা নামে একজন শিক্ষিত লামা ছিলেন। কোনো এক সময়ে কঠোর জীবনযাপনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি নাকি যথেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। এই অপরাধে তাঁকে লামা পদ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। পরে তাঁর জীবন অত্যন্ত দুঃখ দুর্দশায় অতিবাহিত হয়েছিল। মৃত্যুর পরে এই লামার আত্মা প্রেতরূপ পরিগ্রহ করেন। প্রেতরূপ পরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অত্যন্ত হিংস্ররূপ ধারণ করে বিচরণ করতে থাকেন যথেচ্ছভাবে। যাঁরা তাঁর পুজো করতেন না, তাঁদের প্রতি অত্যন্ত হিংস্র হয়ে কঠোর শাস্তি দেন। তাঁরা হয় কঠিন ব্যাধি কবলিত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন, অথবা দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন শোচনীয়ভাবে। এছাড়াও তোরণ দ্বারের উভয় দিকে এক জোড়া নিকৃষ্ট ধরনের প্রেতাত্মা অবস্থান করে। তাদের দেহের বর্ণ লাল, অথবা গাঢ় নীল ও কালো রঙ মিশ্রিত। তাদের নাম কা কাঙ্‌বা শেন্ মারন্‌ক। এই প্রেতাত্মা শত্রুকে হত্যা করে। দরজার গায়ে অনেক

স্থানে বারোজন পরীর মূর্তি অঙ্কিত থাকে। এই পরীরা রোগের বীজ বপনরতা। এরা সবাই প্রধান প্রেতাত্মার অধীনস্থ।

মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ মুখে ফ্রেস্কোতে অঙ্কিত থাকে চারটি রাজমূর্তি। তাঁরা সমস্ত বিশ্বকে চারদিকের বর্হিজগতের প্রেতযোনির হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন। যথোপযুক্ত অস্ত্র সজ্জায় তাঁরা সজ্জিত। দুজন করে দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন তাঁরা। এই চারজন রাজমূর্তির নাম—

ইউল-খর-স্রিঙ্	সংস্কৃতে-ধৃতরাষ্ট্র।		শ্বেতবর্ণের এই দিকপাল, পূর্বদিক রক্ষাকারী গন্ধর্বরাজ।
ফাগ্‌কি-পো	"	বিরুধক	হলুদ বর্ণের এই দিকপাল দক্ষিণদিক রক্ষাকারী কুম্ভদাস রাজা।
জেমি জাঙ্	"	বীরুপাক্ষ	রক্তবর্ণ এই দিকপাল, পশ্চিমদিক রক্ষাকারী নাগরাজা।
নাম্‌ থোশ্রী	"	বৈশ্রবন	সবুজবর্ণের এই দিকপাল উত্তরদিক রক্ষাকারী যক্ষরাজা।

মন্দিরের অভ্যন্তরভাগের বিশাল কক্ষে দুই সারি পিলার মন্দিরের মধ্যভাগ ও তার সমান্তরালে অপর ভাগকে আলাদা করে রাখে। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ বেদী পর্যন্ত প্রসারিত। সমস্ত অভ্যন্তর ভাগ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। দেয়ালের বাম ও দক্ষিণ অংশে লামা মূর্তি ও প্রেতের চিত্র অঙ্কিত। প্রতিটি মূর্তিই প্রমাণ সাইজের। মন্দিরের কড়ি বরগা রক্তবর্ণে রঞ্জিত। রঙের ঔজ্জ্বল্য, মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের স্বল্পালোকের জন্য ঠিক বোধগম্য হয় না।

মন্দিরে তিনটি প্রধান মূর্তি। এই মূর্তিগুলি বিশাল আকৃতি

বিশিষ্ট, সোনালী রঙে রঞ্জিত ও বেদীর ওপরে উপবিষ্ট। তিনটি মূর্তি হিন্দু শাস্ত্রের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মতোই লামা ধর্মের ত্রয়ী মূর্তি।

মধ্যবর্তী মূর্তিটি শাক্যমুনি। বামপার্শ্বে গুরু রিম্পোচে, পার্শ্বে চে-রি-সি বা অবলোকিতেশ্বর।

শাক্যমুনির দেহের বর্ণ হলুদ। মাথায় নীল রঙের কোঁকড়ানো চুল। কোনো কোনো মন্দিরে শাক্যমুনির মুখ্য শিষ্যদ্বয়, মোদ্গপুত্ত ও সারিপুত্ত শাক্যমুনির বামে বা ডানে ভিক্ষাপাত্র ও কতগুলো ছোট ছোট ঘুন্টি বাঁধা দণ্ড ধারণ করে দণ্ডায়মান। বামদিকে গুরু রিম্পোচে বা পদ্মযুগমে, পদ্মসম্ভব, বিশাল পদ্ম পাপড়ির ওপরে উপবিষ্ট। তাঁর শিরোদেশের শিরাবরণ পাপড়ির মতোই। ডান হাতে বজ্র, বাম হাতে নরকপাল। নরকপাল গাঢ় লাল রক্তপূর্ণ। বাম স্কন্ধে স্থাপিত ত্রিশূল। ত্রিশূলের শীর্ষে নরমুণ্ড গ্রথিত। গুরু রিম্পোচের সঙ্গে তাঁর সাহায্যকারিণী দুজন নারী মূর্তি তিব্বতী পরী খাদো ইয়াঙ্‌সে ৎসোগিয়াল বামপার্শ্বে রক্তপূর্ণ করোটির পাত্র ধারণ করে দণ্ডায়মান। ডান পাশে মদ্যপূর্ণ পাত্র ধারণ করে দণ্ডায়মানা লাহ্‌ছম্‌ মান্দারোম।

শাক্যমুনির ডানপাশে বজ্রযানী দেবতা অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। তার চারিটি বাহু, সামনের হাত দুটিতে প্রার্থনার ভঙ্গী। ওপরের ডানহাতে স্ফটিকের মালা, ওপরের বাম হাতে পদ্মফুল। তাঁর দেহের বর্ণ সাদা।

এ ছাড়াও থাকবে, দোর্জে ফাক্‌মো বা বজ্রবারাহীর মূর্তি

দোলমা	তারার মূর্তি
চাকদর	বজ্রপাণি
জামইয়াঙ	মঞ্জু ঘোষ
চেরি শি	অবলোকিতেশ্বর

দোর্জে ফাক্‌মো বা বজ্রবারাহী, বজ্রযানী তন্ত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী দেবী। তন্ত্র গ্রন্থে বজ্রবারাহীকে হেরুকদেবের অগ্রমহিষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বজ্রবারাহী, দিগ্‌বসনা দ্বিভুজা। ইনি শবের ওপরে

নৃত্যপরা। দেবীর ডান হাতে তরোয়াল, বাম হাতে রক্তপূর্ণনরকপাল। দেবী অত্যন্ত ভয়ঙ্করী মূর্তিতে বিরাজমানা। দেবীর মাথার পার্শ্বদেশ থেকে একটি বরাহমুখ বহির্গত হয়। তিব্বতীয় ভাষায় বজ্রবরাহীর নাম দোর্জে ফাক্‌মো।

দোল্‌মা বা দোলমাজাঙ্খু-বা তারা, তারা বৌদ্ধতন্ত্রে অন্যতমা শক্তিরূপে বর্ণিত হয়েছে।

টাশীডিঙের মন্দিরে যে চক্রটি রয়েছে, সেই চক্রের অন্তর্নিহিত অর্থই আবার মন্দির গাত্রে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হয়েছে। এই চক্রটির নাম সি-পা-ঈ খোলো বা স্থিতি চক্র।

এ ছাড়াও রয়েছে দ্বাদশ নিদান ও তিনটি মৌলিক পাপের অদ্ভুত চিত্রাবলী। এই বিচিত্রবর্ণের চিত্র ও তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সিকিমের বৌদ্ধতন্ত্রের অপরূপ দার্শনিক তত্ত্ব। এই দ্বাদশ নিদান ও তিনটি মৌলিক পাপ সম্পর্কে E. Arnold তাঁর The Light of Asia গ্রন্থে সুন্দরভাবে লিখেছেন।

/Three Original Sins /

Patigha-Hate

With a serpent coiled about her waist, which suck
Poisonous milk from both her hanging dugs
And with her curses mix there angry hiss.
Then followed Ruparaga-Lust of days
That sensual sin which out of greed for life
Forgets to live and lust of fame···and fiend of pride
And ignorance the dam
Of fear and wrong, Avidya, hideous hag
Whose footsteps left the midnight darker.

/.Twelve Nidanas./

Avidya-delusion. Sets those snares
Delusion breeds Sanskara, tendency
Perverse, tendency energy Vigyan (vidnan)
Whereby comes Namrupa, local form.
And name and bodiment, bringing the man

With sense naked to the sensible
A helpless mirror of all shows which pass
Accross his heart and so Vedana grows
Sense-life-false in its gladness, fell in sadness ;
But sad or glad, the mother of desire
Trishna, that thirst which makes the living drink
Deeper and deeper of the false salt waves
Where on they float, pleasures, ambitions wealth
Praise, fame or domination, conquest love,
Rich, meats and robes and fair abodes and prides
Of ancient times and lust of the days and strife
To live and sins that flow from strife, some sweet
Some bitter. Thus life's thirst quenches itself
With draughts which double thirst.

টাশীডিঙ ও পেমিওঙচির দেওয়াল চিত্রে তিনটি আদিম পাপ ও দ্বাদশ নিদানের অপরূপ চিত্রায়িত ব্যাখ্যা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। লামাতন্ত্রে পুনর্জন্মের মূল কারণ ও তার গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব এমন সহজ সুন্দরভাবে সাধারণের বোধগম্যের জন্য চিত্রায়িত করা রয়েছে। তিনটি আদিম পাপ সম্পর্কের চিত্রটিতে রয়েছে একটি শূকরী কামড়ে ধরে রয়েছে মোরগের পুচ্ছ। মোরগটি ধরে রয়েছে সর্পের পুচ্ছ আর সর্প ধরে আছে শূকরীর পুচ্ছ। এইরূপে তিনটি জীবের চিত্র চক্রাকার দেখানো হয়েছে। শাস্ত্র অনুযায়ী এই চক্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চতুষ্পার্শে অনবরত প্রদক্ষিণ করছে। আর্নল্ড সাহেব এই চক্রের দার্শনিক ব্যাখ্যাই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর The Light of Asia গ্রন্থে।

একটি সর্প শূকরীর কোমর বেষ্টন করে উভয় পার্শ্বের স্তনবৃন্ত থেকে দুগ্ধপান করছে মাঝে মাঝে। এই দুগ্ধ বিষাক্ত, শূকরীর অভিশাপ মেশানো, যার ফলে সর্পের ক্রোধের সঞ্চার হচ্ছে, আর সেই ক্রোধের প্রকাশ হচ্ছে ক্রুদ্ধ হিস্‌হিস্‌ শব্দে। তার পরই রূপরাগ, দীর্ঘ দিন বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাই জীবনধারণের লোভকে ডেকে আনে। কিন্তু লোভই দীর্ঘকাল জীবনধারণের প্রচেষ্টাকে ভুল করে

দেয়। যে জন্য পর পর আসে, খ্যাতির লোভ, খ্যাতি লাভের জন্য নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানতা, ভয়, অন্যায় করবার প্রচেষ্টা ও অবিদ্যা। এই সবকিছুর মিলিত রূপ যেন এক কুৎসিত দর্শনা বৃদ্ধা, যার পদক্ষেপে নেমে আসে মধ্যরাত্রির গাঢ় অন্ধকার।

বিশ্বসংসারের আদিম পাপ অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা থেকেই সবকিছুর জন্ম। অজ্ঞানতার অন্ধকার মানুষের সদ্ অসদ্ বিচার বুদ্ধিকে রাখে আচ্ছন্ন করে। বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ তখন অবিদ্যার প্রভাবে যা কিছু ইন্দ্রিয়সুখকর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম হয় লোভের। লোভের প্রভাবে সবকিছু লাভের জন্য মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। নিষ্ঠুর হয় তার ঈপ্সিত বস্তু লাভের আশায়। বঞ্চিত হয়ে বাধা প্রাপ্ত হতেই জন্ম হয় ক্রোধের। ক্রোধ মানুষকে অন্ধ করে, মানুষ বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আবার অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত হয়। পাপের এই তিনটি অবস্থা চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। শূকর অজ্ঞানতার প্রতীক, মোরগ লোভের আর সর্প ক্রোধের প্রতীক। এই তিনটি আদিম পাপকে যদি কেউ সাধনার দৃপ্ত তেজে উপেক্ষা করতে পারে, তাহলেই ধর্ম অর্জিত হবে। ধর্ম অর্জিত হলে আসবে প্রজ্ঞার আলো, প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত পথ থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হবে। মানুষ তখন অগ্রসর হবে মুক্তির বাঞ্ছিত ধামে।

লামাতন্ত্রে পুনর্জন্মের কারণকেই বলা হয়েছে নিদান। শাস্ত্রে দ্বাদশটি নিদানকে অপূর্ব বর্ণাঢ্য চিত্রে রূপায়িত করে অন্তর্নিহিত অর্থ পরিস্ফুট করা হয়েছে টাশীডিঙ্‌ ও পেমিওঙচির মন্দির দেওয়ালে। এই সমস্ত দেওয়াল চিত্রের উদ্দেশ্য তীর্থযাত্রী, মন্দির দর্শনার্থীদের সামনে চিত্রের মাধ্যমে ধর্মের দুরূহ তত্ত্ব সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করা। সাধারণ মানুষের মনে ধর্ম চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করবার এই অপূর্ব প্রচেষ্টা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। আর্নল্ড সাহেব ও মুগ্ধ হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। তাঁর পুস্তকে দ্বাদশ নিদানের ব্যাখ্যা চিত্তাকর্ষক।

অবিদ্যা, মায়া অসংখ্য ফাঁদ পেতে রাখে। মায়া মোহ থেকেই জন্ম লাভ করে সংস্কার। সংস্কারবদ্ধ জীব বিপথগামী হয়। বিপথে চালিত শক্তি তখন বিজ্ঞান, তারপরেই আসে নামরূপ। নামরূপ, হচ্ছে দেহ ও দেহের পরিচয়। নামরূপ থেকেই জন্ম লাভ করে সদায়তন। সদায়তন হচ্ছে শূন্যতা ও নগ্নতা সম্পর্কে জ্ঞান, এই জ্ঞানের পরবর্তী পর্যায় স্পর্শজ্ঞান। স্পর্শজ্ঞানের পরে উপলব্ধি বা অনুভূতি বা বেদনা। এই অনুভূতি যেন অসহায় দর্পণের মতো হৃদয়ের ওপরে প্রতিফলিত প্রতিটি চিত্রের প্রতিবিম্ব তুলে ধরে। বেদনা জীবনসম্পর্কে জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়, যার পরিণতি সুখ বা দুঃখ। পরিণতি সুখ বা দুঃখ যাই হোক, তারই ফলে আবির্ভূতা হয় ইচ্ছার মাতৃমূর্তি তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা কিন্তু মানুষকে বার বার পান করায় মিথ্যার বিস্বাদ লবণাক্ত জল। সে জলে ভাসমান মানুষ, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, ধনরত্ন, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, প্রেম, সম্পদ, নানা বিলাস-ব্যসনের মধ্যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে ও জীবন যুদ্ধে এই সব তিক্ত মধুর আস্বাদ ভোগ করতে চায়। এই হচ্ছে জীবন তৃষ্ণা। শুষ্কতা দিয়ে মেটাবার প্রচেষ্টায় এই তৃষ্ণা আরও দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। দেওয়াল চিত্রে চিত্রিত দ্বাদশ নিদানের প্রতিটির পরিপূর্ণ চিত্র দর্শন করে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। চিত্রের শিল্পীরা ছিলেন তিব্বতের বিভিন্ন মঠের শিল্পী। চিত্র অঙ্কনের জন্য তাঁরা বিশেষ ধরনের রঙ ও তুলি ব্যবহার করতেন। চিত্রের ব্যঞ্জনা উপেক্ষা করলেও শিল্পীর শিল্প চাতুর্য ও রঙ তুলির নৈপুণ্য মুগ্ধ করে নিঃসন্দেহে।

প্রথম চিত্রে : বৃদ্ধা পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। বৃদ্ধাকে বলা হয়েছে মারিগ পা অথবা অবিদ্যার প্রতীক। অবিদ্যা মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। ফলে সত্যিকারের পথ খুঁজে না পেয়ে ভুল পথে পরিচালিত হয়। সুখ শান্তি সকলেরই কাম্য। কিন্তু যথার্থ সুখ প্রাপ্তির জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন সে জ্ঞান অবিদ্যায় আচ্ছন্ন থাকায়, সুখের

সন্ধানে ভুল পথে হাতড়ে বেড়ায় মানুষ। ফল স্বরূপ অর্জন করে দুঃখ। এই দুঃখই মানুষের রোগ শোক জরা মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আসে।

দ্বিতীয় চিত্রে: একজন কুম্ভকার তার চক্রে মৃৎপাত্র নির্মাণরত। কুম্ভকারকে দু-চে বা সংস্কারের প্রতীক বলা হয়েছে। মানুষ কর্ম করে যায়, কিন্তু তার কর্ম কখনও নিষ্কাম নয়। পার্থিব জগতে সমস্ত কর্মের জন্য সে সার্থক ফল লাভের প্রত্যাশা করতে থাকে। এই প্রত্যাশাই তাকে কর্মের প্রেরণা যোগায় কিন্তু অজ্ঞানতার জন্য কর্ম সব ক্ষেত্রেই ভুল পথে পরিচালিত হয়। ফল স্বরূপ সে লাভ করে চিরন্তন দুঃখ।

তৃতীয় চিত্রে: একটি বাদর ফল ভক্ষণরত। ফল ভক্ষণরত বাঁদরকে বলা হয়েছে নাম-শে বা বিজ্ঞানের প্রতীক। বিজ্ঞান অর্থ সদ্ ও অসদ্ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। বাঁদর ফলাহারী। ফল দেখা মাত্র সে ভক্ষণে প্রয়াসী হয় এবং ভক্ষণ করে। অনেক ক্ষেত্রেই, সুস্বাদু ও বিস্বাদ দুই ফলই ভক্ষণ করতে হয় তাকে। ভাল মন্দ ফল সে বিচার করিতে পারে না। কারণ অজ্ঞানতা তার সদ্-অসদ্ বিচার বুদ্ধিকে রাখে আচ্ছন্ন করে। ফলস্বরূপ তাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়।

চতুর্থ চিত্রে: একজন মৃতপ্রায় মানুষের মণিবন্ধে নাড়ী পরীক্ষারত চিকিৎসক। এই চিত্রটি 'মিঙ্ যুগ্' বা নামরূপের প্রতীক। মানুষের দেহ ও তার নাম দুইই অনিত্য। চিত্রে পরিস্ফুট দৃশ্যটিতে মানুষ মৃত্যুপথযাত্রী, মৃত্যুর দ্বারদেশ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টারত চিকিৎসক। এত প্রচেষ্টা, মৃত্যুপথযাত্রীর বেঁচে থাকবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে অবশেষে মৃত্যু এসে হাজির হয়। মৃত্যুর পর দেহের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়, সেই সঙ্গে নামেরও। এ ঘটনা

নিত্য নৈমিত্তিক, মানুষের দৃষ্টির সামনেই ঘটছে। মানুষ তবু নিজের মৃত্যু আশঙ্কায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। চিরকালের জন্য বেঁচে থাকতে চায়, চায় নিজের নামকে বাঁচিয়ে রাখতে।

পঞ্চম চিত্রে : একটি শূন্য গৃহ। এই চিত্রটি বলা হয়েছে কিয়া-চে' বা সদায়তনের প্রতীক। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন, এই চিত্রে, গৃহ ও তার শূন্যতা দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ঘরের স্থূল উপাদান ইন্দ্রিয়, ঘরের মাঝে আবদ্ধ শূন্যতা, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাঝে মনের অবস্থানের মতো। একের অস্তিত্বে, অপরের প্রকাশ।

ষষ্ঠ চিত্রে : প্রেমিক ও প্রেমিকা যুগল চুম্বনরত। এই চিত্রটিকে 'রিগ্‌ পা' বা স্পর্শের প্রতীক বলে চিত্রিত হয়েছে। স্পর্শজ্ঞান লাভের মূলে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রয়োগ ইচ্ছা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রয়োগের ফল সুখানুভূতি। সুখানুভূতির ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন।

সপ্তম চিত্রে : একটি তীর মানুষের চোখে বিদ্ধ হচ্ছে। এই চিত্রটিকে বলা হয়েছে 'ৎশর ওয়া' বা বেদনা অথবা অনুভূতির প্রতীক। বেদনা বা অনুভূতি সংযোগের ফলস্বরূপ। সংযোগের ফল, আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, সবই হতে পারে। মানুষ চায় আস্বাদন। সেই আনন্দ প্রাপ্তির আশায় মানুষ অগ্রসর হয়। কিন্তু দুঃখ ও বেদনা লাভ তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ।

অষ্টম চিত্রে : একজন মানুষ মদ্য পানরত। এই চিত্রটি, 'স্র-পা' বা তৃষ্ণা অথবা লোভের প্রতীক। মানুষের চাওয়ার কোনো সীমা নেই। আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ, তার বুদ্ধি বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে। সে তখন নেশাগ্রস্তের মতো সীমাহীন লোভের শিকার হয়। মানুষের লোভ ও মোহ অনুভূতির প্রয়োগের ফলস্বরূপ।

নবম চিত্রে : একজন মানুষ তার মস্তবড় ঝাঁপিতে ফুল সংগ্রহরত। এই চিত্রটি 'লেন্-পা' বা উপাদান সংগ্রহের ইচ্ছা। আহরণের ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন। মানুষ পার্থিব বস্তু আহরণ করে তার ভাণ্ডার পূর্ণ করেও তৃপ্ত নয়। সংগ্রহের ইচ্ছা তার আরও বৃদ্ধি পায়। পার্থিব বস্তু সংগ্রহের এই যে তীব্র ইচ্ছা লোভেরই ফলস্বরূপ। লোভের যেহেতু পরিসমাপ্তি নেই, তাই লোভের ফল দুঃখ।

দশম চিত্রে : একজন গর্ভবতী মহিলা। এই চিত্রটি 'স্রেড্-পা' বা ভাবের প্রতীক। ভাব অর্থে অনন্তকালের জন্য অস্তিত্বের ধারা রক্ষার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার ফলে মানুষ জাগতিক জীবনে, ধনসম্পদ নিয়ে অমরত্ব লাভের বাসনা করে :

একাদশ চিত্রে : শিশু জন্মদাত্রী মাতা। চিত্রটি 'কিঈ-ওয়া' বা জন্মের প্রতীক। জন্ম দশম চিত্রের ফলস্বরূপ।

দ্বাদশ ও শেষ চিত্রে : মানুষের মৃতদেহ বাহিত হচ্ছে। চিত্রটি 'গা-শে' বা জরামরণের প্রতীক। মানুষের জরা ও মৃত্যু এবং জরা-মৃত্যুজনিত দুঃখ ভোগ জন্মেরই ফলস্বরূপ।

টাশীডিঙের মন্দিরে আরও অনেক আধ্যাত্মিক চিত্র আছে। তার মধ্যে কতকগুলি চিত্রে মানুষের পুনর্জন্মের ছয়টি গতি দেখানো হয়েছে। এই ছয়টি গতির আবার তিনটি ভাগ অর্থাৎ উচ্চ গতি, তির্যক্ গতি, ও নিম্ন গতি।

ছয়টি গতির	প্রথম	'লাহ্' বা সুর অর্থাৎ দেবতা	উচ্চ গতি
	দ্বিতীয়	'লাহ্-মা-ঈন্ বা অসুর	
	তৃতীয়	'মি' বা নর	
	চতুর্থ	'ডুতডো' বা পশু	তির্যক্ গতি
	পঞ্চম	'ঈ-ডাগ্' বা প্রেত	
	ষষ্ঠ	'নিয়া-ওয়া বা নরকের বাসিন্দা	নিম্ন গতি

মানুষের জন্মের গতি বা পুনর্জন্মের স্থান তার কর্ম বিচারের

পরিণতি। কর্মের ফল অনুযায়ী মানুষ উচ্চ গতি প্রাপ্ত হয়। কর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারকর্তা' পক্ষপাতশূন্যভাবে জন্মের গতি বা পুনর্জন্মের স্থান নির্দেশের কর্তা—দোরজে ঝিক্ চে বা সিন্‌জে চোগিয়াল। আমরা তাকে বলি যমরাজ বা ধর্মরাজ। ধর্মরাজের বিচারে মানুষ তার কর্মের ফল লাভ করে থাকে। ফল অনুযায়ী উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়। চির মোক্ষ লাভ করে পুনর্জন্মরহিত অবস্থায় বিরাজ করে স্বর্গধামে।

দেওয়াল চিত্রে স্বর্গকে মেরু পর্বতের শীর্ষে চিহ্নিত করা হয়েছে। পর্বতের শীর্ষে ত্রিতল প্রাসাদ। ওপর তলার অধিবাসী 'ডা-লাহ্' বা যুদ্ধ দেবতা। মধ্যম তলার অধিবাসী ব্রহ্মা। নিচতলার অধিবাসী তৃষ্ণা। স্বর্গের দেবতাদের চারপাশে দেবী, অমৃতের সরোবর, কল্পতরু, কামধেনু, পক্ষীরাজ ঘোড়া, মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার, সৌধ ও নন্দন বন বিদ্যমান।

মেরু পর্বতের পাদদেশে অসুর বা লাহ্-মা-ঈন দের রাজ্য—হলুদ রঙে চিত্রিত। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ-দেবতাদের অহরহ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অসুরেরা পরাজিত হয় ও নিহত হয়। দেবতাদের প্রধান অস্ত্র চক্র।

অসুরদের রাজ্যের পরে মনুষ্যজগৎ, নীল রঙে রঞ্জিত। মনুষ্য জগতে চির বিরাজমান রোগ, শোক বার্ধক্য জরা ও মৃত্যু।

মনুষ্য জগতের পরে জীবজগৎ, অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎ।

আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎ প্রেতলোক। প্রেতদের প্রভূত ধন-সম্পদ, মণি-মুক্তা ও খাদ্যসামগ্রী। ভোগের ইচ্ছা তাদের প্রবল, কিন্তু নেই ভোগের ক্ষমতা। তাদের বিশাল দেহ, কিন্তু মুখ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যে জন্য খাদ্যদ্রব্য যখন প্রবেশ করে তখন সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো প্রবেশ করে। ফলে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের সৃষ্টি করে। আবার তেমনি সাংঘাতিক বেদনাদায়ক ক্ষতের সৃষ্টি করে বেরিয়ে আসে দেহ থেকে। প্রেতের ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রবল কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় নেই। কোনো কোনো প্রেতের মুখে তীব্র অগ্নিশিখা। সিকিমের শাস্ত্রে নরকের একটি পরিপূর্ণ চিত্র বিদ্যমান। সে চিত্রের সঙ্গে আমাদের

পুরাণ ও কাব্যে বর্ণিত নরকের বিন্দুমাত্র অমিল নেই। তবে স্থান কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী শাস্ত্রকারগণ নরকের নির্যাতনের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। শাস্ত্রকারদের বর্ণনা অনুযায়ী নরকের আবহাওয়া অন্ধকার-ময়। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে মাত্র আটটি নরকের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু লামা শাস্ত্রে রয়েছে আটটি শীতল ও আটটি উত্তপ্ত নরকের বর্ণনা সেই সঙ্গে আর দুইটি নরকের বর্ণনা যুক্ত হয়েছে।

নরকের উচ্চতম ও উন্নত অংশে রাজা, রাজসভা ও বিচারক আছেন। এই বিচারক মৃত মানুষের বিচার করেন এবং তদনুযায়ী দেন শাস্তি। বিচারকের ডানপাশের দেবদূত পুণ্য কাজের হিসাব রাখেন ও বিচারের সময় দাখিল করেন। তিনি মৃত ব্যক্তির সদ্‌কাজগুলি গণনা করেন। তার থলের ভেতর থেকে সাদা পাথর বার করে তাই দিয়ে সংখ্যা ঠিক করেন। বিচারকের বামপাশে দণ্ডায়মান দূত তার থলে থেকে কাল পাথর বার করে মৃত ব্যক্তির পাপের হিসাব দাখিল করেন। বিচারকের সামনে নিক্তি নিয়ে ওজনরত দূত পুণ্যকাজের সংখ্যা নিরূপিত সাদা পাথরগুলো নিক্তির পাল্লার একটিতে, পাপ কার্যের হিসাব অঙ্কযুক্ত কালো পাথরগুলো অপর পাল্লায় স্থাপন করেন। পরে যেদিকে ভারী হয় বিচারক তদনুযায়ী নির্দেশ দেন। ক্রোধ বশে পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য পাপীকে নিক্ষেপ করা হয় তপ্ত নরকে, নির্বুদ্ধিতা বা অজ্ঞানতার জন্য পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য পাপীকে নিক্ষেপ করা হয় শীতল নরকে।

তপ্তনরকের আট প্রকার বর্ণনা রয়েছে।

প্রথম : য়াঙ সো বা সঞ্জীব। পুনঃপুনঃ জীবিত করা। এই নরকে পাপীর দেহকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হয়। আবার তাকে যুক্ত করে প্রাণ সঞ্চারপূর্বক পুনর্বার টুকরো করা হয়। নির্যাতন ভোগের জন্য এই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় : থি-নাগ্‌ বা কলাসূত্র। এখানে পাপীকে শোয়ানো হয়।

তারপর তার দেহে লাইন ধরে ছোট ছোট পেরেক পোঁতা হয়। উজ্জ্বল তপ্ত করাত এই রেখা ধরে দেহকে খণ্ড বিখণ্ডিত করে। এখানে আরও একটি শাস্তির প্রচলন আছে যারা গালিগালাজ করে অথবা বাজে আলোচনা করে, তাদের জিভ টেনে বার করে ধারালো গজাল দিয়ে ফালা ফালা করা হয়।

তৃতীয় : ডু-জম বা সঙ্ঘট। এখানে পাপীর দেহকে জীব জন্তুর মস্তক বিশিষ্ট পর্বত দ্বয়ের মাঝে চাপের ভেতর ফেলে পিষে চেপ্টা করা হয়। অথবা বিশাল লৌহনির্মিত পুস্তকের ভাঁজের মাঝে পাপীর দেহকে করা হয় নিষ্পেষিত। এই শাস্তি দেওয়া হয় শাস্ত্রে অবিশ্বাসী লামা বা সাধারণ নরনারীদের। অন্যদের লোহার খলে নিষ্পেষিত করা হয়।

চতুর্থ : ঙু বড্ বা রৌরব। পাপীকে সাংঘাতিক উত্তপ্ত লৌহনির্মিত ঘরে রাখা হয়। তার পর গলন্ত লোহা গলার ভেতর দিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়।

পঞ্চম : ঙু বড্ ছেন্ পো বা মহারৌরব। পাপীর দেহকে কটাহে গলন্ত লৌহ দিয়ে ভাজা হয়।

ষষ্ঠ : শেওয়া-বা তাপন। পাপীর দেহকে তপ্ত লৌহনির্মিত শিক দিয়ে গেঁথে রাখা হয়।

সপ্তম : রাব্ তা শেওয়া বা মহাতাপন। পাপীর দেহের মধ্যে তিনটি উজ্জ্বল তপ্ত বর্শা ঢুকিয়ে উত্তপ্ত পাত্রে ভাজা হয়।

অষ্টম : নরমেড্ বা অভিচি। এইটিই সবচাইতে দীর্ঘ স্থায়ী ও মারাত্মক নির্যাতন। পাপীর দেহকে লেলিহান শিখার মধ্যে রাখা হয় দীর্ঘকাল।

শীতল নরকের উল্লেখ ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের কোথাও নাই।

প্রথম-ছু বুর চেন—পাপীর দেহকে নগ্ন করে তুষার শীতল জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় যাতে সমস্ত দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় : ছু বুর দোল বা—এই সমস্ত ক্ষতস্থানগুলি জোর করে কাটা হয়, যার ফলে দগ্‌দগে ঘায়ের সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় : আ-ছু পাপীকে শীতল নরকে সর্বক্ষণের জন্য নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনের আতিশয্যে পাপীর মুখ দিয়ে আ-ছুঃ এই আর্তস্বর সমস্ত নরক জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

চতুর্থ : কীই হুঃ নরকের পরিবেশ প্রচণ্ড শীতলতম পরিবেশ। সেখানে পাপীর দেহ অবশ হয়ে যায়। জিভ অবশ হয়ে যাওয়ার ফলে শুধু 'কীই হু' এই আর্তস্বর নির্গত হয়।

পঞ্চম : সো-থান-পা ঃ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেই ক্ষত তখন নীল পদ্মের মতো দেখায়।

ষষ্ঠ : উৎপল টার গে পা ঃ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেই ক্ষত তখন নীল পদ্মের মত দেখায়।

সপ্তম : পি-মা-টার গে পা ঃ তুষার ক্ষতের মতো লাল বর্ণ হয়।

অষ্টম : পিমা-ছেন পো, টার

গে পা : পদ্মের লাল পাপড়ির মতো মাংস হাড়ের ওপর থেকে খসে পড়তে থাকে আর রক্তবর্ণ ক্ষতের মধ্যে লৌহ নির্মিত পাখি তার লৌহ নির্মিত ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে থাকে।

অপর দুইটি নরকের নাম, নী শেওয়া যেখানে অসংখ্য কীটপতঙ্গ বাস করে, নী খোরবা বা মৃত্যুধরনের নরক, সেখানে ভস্ম ও জঞ্জালের স্তূপ, পাপীরা নরক থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে বাধ্য হয়।

নরকে অবস্থানের স্থায়িত্ব নির্ভর করে পাপের পরিমাণের উপর। নরক থেকে মুক্তিলাভের সঙ্গে লামাগণ কারাগার থেকে মুক্তি লাভের তুলনা করেছেন।

নরক থেকে মুক্তির পর পুনর্জন্মের সমস্যা দেখা দেয়। তখন আবার সেই সি-পা-ঈ-খো-লো বা স্থিতিচক্র। লামাগণ এই স্থিতিচক্রের ইতিহাস সম্পর্কে বলেন, ভগবান বুদ্ধ একবার এক

মুষ্টি চাউল প্রতিটি কণার সাহায্যে দ্বাদশ নিদানের তত্ত্ব শিষ্যদের অবহিত করেছিলেন। তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী দেওয়াল চিত্র, তিব্বতের বৌদ্ধ মন্দিরে একাদশ শতকে অঙ্কিত হয়েছিল। এটি তিব্বতে প্রচলন করেছিলেন অতীশ, তিনি আর্যদেব ও অসঙ্গের শিষ্য-প্রশিষ্যের কাছ থেকে এটি লাভ করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র সিকিমীদের কাছে তাঞ্জোর ও কাঞ্জোর নামে পরিচিত। সিকিমের সমস্ত বড় বড় বৌদ্ধ মন্দিরে তাঞ্জোর ও কাঞ্জোর আছে। বিশেষ করে টাশীডিঙ ও পেমিওঙচিতে। কাঞ্জোর ও তাঞ্জোর মূলত সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ। এই অনুবাদ কর্মও সাধিত হয়েছিল ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে।

কাঞ্জোর, কাষ্ঠনির্মিত খণ্ডে লেখা শাস্ত্র। এটি তিব্বতের প্রখ্যাত বৌদ্ধ মঠ টাশীলুমপোর সন্নিকটে নারথাঙে মুদ্রিত হত। কাঞ্জোর মোট এক শত খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডে এক সহস্র পৃষ্ঠা আছে।

তাঞ্জোর দুইশত পঁচিশ বা ততোধিক খণ্ডবিশিষ্ট গ্রন্থ। এতে আছে ভারতীয় দর্শন, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা। পেমিওঙ-চিতেই তাঞ্জোরের সবকটি খণ্ড রয়েছে।

কাঞ্জোরএর তিনটি অংশ।

প্রথম ডুল ভা বা বিনয়, শৃঙ্খলা, তেরো খণ্ডে সম্পূর্ণ

দ্বিতীয় ডু বা সূত্র, বুদ্ধদেবের বাণী, ছেষট্টি খণ্ডে সম্পূর্ণ

তৃতীয় স্টারচিন বা অভিধর্ম আধ্যাত্মিক জ্ঞান, একুশটি খণ্ডে সম্পূর্ণ।

টাশীডিঙ পেমিওঙচির মন্দিরের দেওয়াল চিত্রের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছি। আমার মনে হয়েছে, হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ উপনিষদের কথা। হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত দেব-দেবীর রূপ বর্ণনা মন্ত্র, স্বর্গ নরকের বর্ণনার সঙ্গে বজ্রযানী দেবী অসংখ্য দেব-দেবীর ও ও স্বর্গ নরকের রূপকল্পের দেখি অপূর্ব সাদৃশ্য। আমি ভাবি, সিকিমের ধর্ম, সংস্কৃতি নতুন কিছু নয়। কোন এক অতীতে ভারতবর্ষের

তান্ত্রিক মতবাদের ধারা অরণ্যসঙ্কুল গিরিকান্তার পেরিয়ে বাসা বেঁধেছিল তুষারময় রাজ্যে। তান্ত্রিক মিস্টিসিজমের চমৎকারিত্বে উদ্ভাসিত হয়েছিল দুঃসাহসী, শক্তিশালী নরনারী। তারা প্রকৃতির সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করে বাস করতো প্রকৃতি বুকের মাঝেই। প্রকৃতির কোলে লালিত এই দামাল মানুষগুলোর দেহে মনে আমি দেখতে পাই আমার পূর্বপুরুষদের ভাবধারার সুস্পষ্ট চিহ্ন। সিকিম অর্থ নতুন ঘর, কিন্তু নতুন ঘরের নতুন মানুষের দেহে সেই সনাতন প্রাচীন মানুষের ভাবধারা। ইয়ক্‌সামে বসে বসে এসব ভাবনার জট ছাড়াতে আমার ভাল লেগেছে।

পনের

লোবসাঙ্‌ তার ছোট ছোট চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে থাকে সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে। আমি বলি, লোবসাঙ্‌, তোমার দেশ আমার মন কেড়ে নিয়েছে। আমি ভুলে গিয়েছি যে, আমি সমতলের মানুষ।

আত্মতৃপ্তির হাসি হাসে লোবসাঙ্‌। বেশ একটা প্রত্যয় নিয়ে যেন বলে—এখানেই তাহলে থেকে যাও দাজু। মাষ্টারী নিশ্চয়ই জুটবে, বাসস্থানও মিলবে। যদি ঘর বাঁধতে চাও, লোবসাঙ্‌ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরে পেমার সামনে। দুজনের চোখেই যেন কৌতুক নাচে।

লোবসাঙ্‌ বলে হেসে—যদি ইচ্ছে কর, ঘরনীও জুটিয়ে দেওয়া যাবে।

কথা শেষ করেই লোবসাঙ্‌ হাসে উচ্চৈস্বরে। তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে খিলখিল করে হেসে ভেঙে পড়ে পেমা। পেমাকে এর আগে হাসতে দেখি নি। শীর্ণ মুখ, আর নিরুত্তাপ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি শুধু। বাঁশের খোলের মধ্যে রাখা তুম্বায় কেটলি থেকে

গরম জল ঢালতে ঢালতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে; কঞ্চি ঢুকিয়ে বিস্বাদ তুম্বা পানরত অবস্থায় আমার মুখভঙ্গী দেখেও কোনো মন্তব্য করে নি সে। অস্পষ্ট দীপালোকে পেমাকে হাসতে বেশ ভালই দেখা যাচ্ছিল। মলিন বেশ, সলজ্জ ভঙ্গী, সমস্ত দেহে যৌবনের চিহ্ন বর্তমান।

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার এসেছে ঘনিয়ে। আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন, একটানা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে ইয়ক্‌সামের বুকে। ইয়ক্‌-সাম ত্যাগ করব শুনে লোবসাঙ্‌ নিয়ে এসেছিল তার বাড়িতে। ওর কাছেই শুনেছিলাম পেমার কথা। লোবসাঙের একমাত্র ভগ্নী, যাকে বলে আদরের ছোট বোন। ছোটবেলা থেকেই পেমা হরিণীর মতো চঞ্চলা, ঝরনার মতো উচ্ছল ও উদ্দাম। ভোরবেলায় ভেড়ার পাল নিয়ে বেরিয়েছে পেমা, আর ফিরবার নাম নেই। খুঁজতে খুঁজতে লোবসাঙ তাকে আবিষ্কার করে কাতক পোখরীর তীরে। সেখানে ভাঙা চোর্তেনের পাশে বসে নীরবে তাকিয়ে রয়েছে কাতক পোখরীর নিস্তরঙ্গ জলের দিকে। ভেড়াগুলো পাহাড়ের ঢালে চারপাশে ছড়িয়ে। পেমার হাঁটু থেকে উন্মুক্ত নিটোল ফরসা পায়ে জোঁক ধরে রয়েছে গুটিকয়েক, ভ্রূক্ষেপ নেই সে দিকে। কোনো দিন বা নরবুগাঙের পেছনে বাঁশঝাড় আর পাইনের জঙ্গলে, কোনো দিন বা ডুবদি যাবার পথে জঙ্গলের ভেতর থেকে আবিষ্কার করতে হয়েছে তাকে। কেমন এক অদ্ভুত অশান্ত প্রকৃতির মেয়ে পেমা।

ছোট বয়সেই পেমার বিয়ে হয়ে যায় টাশীডিঙের এক কিশোরের সঙ্গে, নাম নরবু। বিবাহের সেই আনন্দমুখর দিনগুলোর কথা পেমার মনে নেই। তবে তখন সে জানত না স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে, বুঝতও না। ইয়ক্‌সাম আর টাশীডিঙ্‌ কতটুকুই বা পথ, পেমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল বারবার যাতায়াতে। অল্প বয়স, ইয়ক্‌সাম ছেড়ে সে থাকতে পারত না। তাই ফাঁক পেলেই স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে আসত ইয়ক্‌সামে, নরবু অবশ্য নিয়ে যেত প্রতিবার এসে।

বছরের পর বছর কেটে যেত, পেমার মন তেমনি অশান্ত, তেমনি উচ্ছল। ভাল লাগত তার বহুদূরে ভেড়াগুলো নিয়ে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়াতে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ঝিঁঝি পোকাগুলোর একটানা চীৎকারের মধ্যে উঁচু নীচু পাথর ডিঙিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসত ঘরে ফিরে। টাশীডিঙে স্বামীগৃহে বাধা নিষেধের গণ্ডিতে তার মন হাঁপিয়ে উঠত, তাই পালিয়ে আসত ঘরে। বার বার পালিয়ে আসতে একবার বিরক্ত হয়ে আর আসে না নরবু। দিন যায়, মাস যায়; লোবসাঙ্ পেমাকে নিয়ে রেখে আসতে চায় টাশীডিঙ্। কিন্তু পেমা তখন অভিমানীর মতো বেঁকে দাঁড়ায়। ভাইয়ের সঙ্গে যাবে না সে। টাশীডিঙ থেকে নরবু তাকে নিতে আসবে, তার হাত ধরে বনছায়ার ভেতর দিয়ে যাবে অনেক কথা বলতে বলতে। দীর্ঘ দিনের জমানো কথা। পেমার মনে তখন যৌবনের রঙীন ছোঁয়া লেগেছে, সলজ্জ চাহনি, সুমিষ্ট কণ্ঠ, ঝরনার মতো উচ্ছল ও উদ্দাম।

ইয়ক্‌সামে পেমার দিন কাটে, বছর ঘুরে যায়। সকালবেলায় তার দৈনন্দিন নিত্যকর্ম, ভেড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া দূরে মাঠে, পাহাড়ের কোলে আর ভেড়ার বাচ্চা বুকে নিয়ে পাহাড়ের চড়াই ভাঙা। তার মনে দুর্জয় অভিমান, স্বামী যদি সত্যিকারের মনের মানুষ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আসবে তাকে নিয় যেতে।

প্রতীক্ষায় দিন কাটে, দেহে তার যৌবনের ঢেউ লাগে, কেমন যেন উন্মনা হয়। পদশব্দে ওঠে চমকে, ভাবে এই বুঝি আসছে নরবু। ভেড়ার পাল নিয়ে কোনো দিন বা এগিয়ে যায় টাশীডিঙের পথে অনেক দূর পর্যন্ত। যদি দৈবাৎ দেখা হয়ে যায় পথে।

একদিন লোবসাঙ্ নিজে থেকেই যায় টাশীডিঙ। তারও খুব দুঃখ হয়েছিল, পেমা না হয় ছেলেমানুষ, না বুঝে অন্যায় করেছে, নরবুর উচিত ছিল ক্ষমা করা। অনেক কথা বলবার আশা নিয়ে গিয়েছিল লোবসাঙ টাশীডিঙ, কিন্তু ফিরে আসতে হয়েছিল হতাশ হয়ে। কারণ

নরবুর সে দেখা পায় নি। নরবু গেইজিঙ্ ও পেমিওঙচিতে কিছু-কাল কাটিয়ে গিয়েছিল গ্যাঙটক্। সেখান থেকে আর ফিরে আসে নি।

আবার বিয়ে দিতে চেয়েছিল পেমাকে। কিন্তু পেমা চায় নি। কারণ, সে বিশ্বাস করে নরবু ফিরে আসবে। নিশ্চয়ই ফিরে আসবে তার কাছে। আর যতদিন না অসবে, ততদিন প্রতীক্ষা করবে পেমা, শবরীর প্রতীক্ষা। লোবসাঙ্ বলে, দাজু, তুমি কি বল, নরবু আসবে না ?

আমি পেমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, নিশ্চয়ই।

মাত্র ক'দিনের পরিচয়েই বন্ধু হয়েছিলাম লোবসাঙের। তাই শুনতে হয়েছিল তার পরিবারের কথা। অথচ এগুলো শোনবার কথা নয়। লোবসাঙ্ আমাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানেই বলেছিল। ভাবি, আর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের দিকে। এ বন্ধুত্ব হয়েছিল, আমি পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের দেশের মানুষ বলে বুঝি! হয়তো তাই! লোবসাঙের কাছেই শুনেছি, ভারতীয় সভ্যতার আলোয় আলোকিত হয়েছে সিকিম। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতীয় যোগাচার্য পণ্ডিত পদ্মসম্ভব আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন তিব্বতে তাঁর বজ্রযান সাধনতন্ত্রের বীজ উপ্ত হয়েছিল হিমালয়ের ওপারে তুষার আর পাথরে ঢাকা কঠিন জমিতে। পরবর্তীকালে অতীশ, দীপঙ্কর ও মিলারোপার জল সিঞ্চনে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পরিণত হয়েছিল মহীরুহে। যার ছত্রছায়া সারা তিব্বতে রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম-তন্ত্রের বুনিয়াদ দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল। সারা বিশ্বের চক্ষে রহস্যময় তিব্বত ছিল অষ্টম আশ্চর্যের মতো। নিষিদ্ধপুরী লাসা, মায়াপুরী পোতালা প্রাসাদ, দালাই লামা, পাঞ্চেন লামা, ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এগুলি আবার রহস্যময় রূপকথা হয়ে থাকবে লিপিবদ্ধ হয়ে।

ইয়ক্‌সামে কাতক পোখরীর সামনে বসে বসে সুদূর অতীতে ফিরে

যাই। আমি যেন বলি, ফুন্টসগ নামগিয়াল, নতুন ঘরের চোগিয়াল, তুমি কি মাত্র তিন শতাধিক বৎসর পূর্বে কোনো এক সোনা ঝরা সন্ধ্যায় ভাবতে পেরেছিলে, সমতলের মানুষ এসে দাবি করবে আমি তোমার পূর্বপুরুষদের চিনি রাজা ? তাঁরা তো আমার সমতলের দেশ থেকেই এসেছিলেন পাহাড়পর্বত ডিঙিয়ে দুর্গমের বাধাকে তুচ্ছ করে। তাঁরা ছিলেন সম্রাট, তাঁরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক পথ চলার সাধনায় সিদ্ধপথিক। সমতলে তাঁদের জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে নি বুঝি, পথ তাঁদের ডেকেছিল হাতছানি দিয়ে। পাহাড় তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিল। এ দেশের পাহাড় যে কথা বলে।

নতুন ঘরের চোগিয়াল, তুমি ছিলে তিব্বতের খাম বংশের বংশধর। কিন্তু তোমার রক্তে ছিল ভারতবর্ষের রাজার রক্ত। তুমি তো জানতে, ভারতবর্ষের যোগাচার্য পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের প্রবর্তিত বজ্রযান সাধন তত্ত্বের ঢেউ তিব্বতের মালভূমি থেকে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পেরিয়ে আসবে নতুন ঘরে। প্লাবিত করবে নতুন ঘরের গহনগিরি কন্দর! তুমি সেই সাধনতত্ত্বের আলোর বর্তিকা বয়ে নিয়ে যাবে ঘরে ঘরে।

সিকিমের কথা শুনতে শুনতে তিব্বতে আমার মন ছুটে যায়। কারণ, চোগিয়ালদের কথা জানবার আগে জানতে হয় তিব্বতের রাজাদের বিচিত্র কাহিনী। তিব্বতের প্রাচীন ইতিহাস অতীতের অন্ধকারে নিমজ্জিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের রাজাদের কাহিনীর সূত্র ধরে ইতিহাস রচিত হয়েছিল পরবর্তীকালে। তিব্বতের রাজাদের ইতিহাস তাই শুরু হয়েছিল ৬০০-৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। একথা রূপ-কথা হলেও তিব্বতীয়দের বিশ্বাস তিব্বতের প্রথম সম্রাট নাহ-থি-সাম্পো কোনো ভারতীয় নৃপতির বংশধর। এ বিশ্বাসের মূলে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য নেই, এ বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করা তাই দুঃসাধ্য। তবু এই প্রচলিত কাহিনীকে সত্য মেনেই তিব্বতীয়রা তাঁদের ইতিহাস রচনা করেছেন।

নাহ থি সাম্পো সম্পর্কে দু একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত

আছে তিব্বতে। এ কাহিনী সংগ্রহ করেছেন প্রখ্যাত পর্যটক শরৎচন্দ্র দাস।

কথিত আছে, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁর পঞ্চম সন্তানের জন্মের পরেই লক্ষ্য করলেন নবজাতক শিশুর চোখ দুটো ওলটানো, ভ্রূযুগল সবুজ রঙে রঞ্জিত, হাতের আঙুলগুলো পরস্পারের সঙ্গে যুক্ত, মুখমণ্ডলে মুক্তোর মতো ঝকঝকে দুপাটি দাঁত। এই বিচিত্র দর্শন সন্তানকে দেখে রাজা ভীত হয়েছিলেন। তাই তিনি নিজ সন্তানকে তাম্র পাত্রে স্থাপন করে ভাসিয়ে দেন পবিত্র গঙ্গায়। তাম্র পাত্রে ভাসমান এই বিচিত্র দর্শন নবজাত শিশু একজন কৃষকের নজরে পড়ে। কৃষক এই নবজাত শিশুকে বুকে তুলে ঘরে নিয়ে আসে। তার গৃহেই রাজপুত্র লালিত-পালিত হতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের দেহকান্তি বৃদ্ধি পায়। রাজকুমার বুঝতে পারেন, তাঁর জন্ম হয়েছে কোনো এক উচ্চবংশে। একদিন রাজকুমারের মনে গভীর দুঃখ হতেই তিনি তার পালনকর্তার আশ্রয় ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন নিরুদ্দেশের পথে। পথ চলতে চলতে দুর্গম হিমালয় পর্বতে আসেন। সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে চলেন দুর্গম পর্বত পেরিয়ে। তুষারপূর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করে অবশেষে তিনি হাজির হন তিব্বতের প্রাচীন শহর ৎসি থাঙের সন্নিকটে লাহ্রি গিরিশৃঙ্গে। গিরিশৃঙ্গ পেরিয়ে তিনি তিব্বতের সান থান অঞ্চলে পৌছতেই জন কয়েক তিব্বতীর সাক্ষাৎ পান। তিব্বতীয়রা এমন সুকোমল কান্তি নতুন মানুষকে দেখে তাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করে। রাজপুত্র তিব্বতী ভাষা জানতেন না। তাই তিনি আকার ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তিনি একজন রাজপুত্র, অঙ্গুলি নির্দেশ করে লাহ্রি গিরিশৃঙ্গ দেখিয়ে বলেন ঐ দিক থেকে এসেছেন তিনি এই দেশে।

তিব্বতীরা সেদিন তার ইঙ্গিতের ভুল অর্থ করেছিল। তারা ভেবেছিল, তিনি ঈশ্বর, এসেছেন স্বর্গ থেকে অবতরণ করে এই দেশে। তারা তাই রাজকুমারকে তাদের রাজা হবার জন্য আকারে ইঙ্গিতে

অনুনয় বিনয় করেছিল। রাজকুমার স্বীকৃতি জানাতেই তিব্বতীরা তাকে সিংহাসনে বসিয়ে, সেই সিংহাসন স্কন্ধে বহন করে জয়ধ্বনি করতে করতে হাজির হয়েছিল ইয়াম্বু লাগানে (বর্তমানে লাসার সন্নিকটে)। সিংহাসনে রাজাকে বহন করে আনা হয়েছিল বলে তার নাম হয়েছিল নাহ্ থি সাম্পো।

নাহ্—স্কন্ধে, থি—সিংহাসন, সাম্পো—শক্তিমান রাজা।

অপর একটি কাহিনী অনুযায়ী শাক্যসিংহের পুত্র দাচেন জিঙ-এর ছুটি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ বিবাহ করেছিলেন কিন্তু তার কোনো সন্তানাদি হয় না। মৃত্যুশয্যায় তাই তিনি বলেছিলেন যে তাঁর আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে এসে ডিমের সৃষ্টি করবে। এই ডিমের অভ্যন্তরেই থাকবে তাঁর বংশধর। যথার্থ এই ডিম থেকে বেরিয়ে এসেছিল ছুটি সুদর্শন বালক। জ্যেষ্ঠজন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, কনিষ্ঠ বিবাহ করেছিলেন। কনিষ্ঠের তিনটি পুত্র হয়েছিল।

প্রথম পুত্র শালি মিম্ মো চলে গিয়েছিলেন নেপালে। সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

দ্বিতীয় পুত্র পাল্ গিয়া গেল্ জেম্পু তিব্বতের খাম অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। তৃতীয় পুত্র তে-লাগ্ চেম থেকেই নাহ্-থি-সাম্পোর জন্ম হয়েছিল। প্রায় খ্রীষ্টের জন্মের ৩১৬ বৎসর পূর্বের কাহিনী এটি।

তার পরের কাহিনী আর নেই, যোগসূত্র কি করে কালের অন্ধকার গর্ভে গিয়েছিল হারিয়ে। ইতিহাস রচয়িতারা অবশ্য ক্ষান্ত হয়ে ছিলেন না। অতীতের অন্ধকার গর্ভে অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। হদিস মিলেছিল অবশেষে, অন্ধকার গর্ভ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত রাজাকে সনাক্ত করা গিয়েছিল। তিনি ছিলেন নাহ্ থি-সাম্পোর সাতাশতম বংশধর, লাহ্ থো-থোরি-নানৎসান। তাঁর জন্মের ৪৪১ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ নাহ্-থি-সাম্পোর ৮৫৭ বৎসর পরে তিব্বতের রাজার সন্ধান মিলেছিল। লাহ্-থো থোরি নানৎসান-এর অর্থ উচ্চ পর্বতশীর্ষের দেবতা।

লাহ্-থো-থোরি-নানৎসানএর জীবদ্দশায় প্রচলিত চমকপ্রদ কাহিনী রয়েছে। কথিত আছে, লাহ্ থো-থোরি নানৎসান তখন অশীতিপর বৃদ্ধ, সেই সময় একদিন স্বর্গ থেকে ইয়াম্বু লাগান্ প্রাসাদের ওপরে একটি মূল্যবান পেটিকা পড়েছিল। সেই পেটিকায় ছিল সোনার পাতের পৃষ্ঠাবিশিষ্ট পুস্তক, সোনার পাতের পৃষ্ঠায় মণিমুক্তা দিয়ে লেখা ছিল। এ ছাড়াও ছিল স্বর্ণময়, মণিমুক্তাখচিত মূর্তি, একটি উজ্জ্বল রত্ন ও একটি পাত্র। ঐ সময়ে তিব্বতে কোনো বর্ণমালার প্রচলন ছিল না। তিব্বতীয়রা এই পুস্তকের সম্পর্কে কিছু না জেনেই অত্যন্ত পবিত্রভাবে পুস্তকটিকে পুজো করত। একদিন বৃদ্ধ রাজা রাজসভায় সভাসদগণের সঙ্গে পুস্তকের প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। ঠিক সেই সময় দৈববাণী হয়েছিল যে এই স্বর্ণময় পুস্তকে লিপিবদ্ধ, বর্ণমালাই হবে তাঁর দেশের বর্ণমালা। রাজার পঞ্চম বংশধর স্বর্ণ পুস্তকে লিপিবদ্ধ লেখাগুলির পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হবেন। রাজা এই দৈববাণী প্রাপ্তির পর থেকেই পুস্তকটিকে সযত্নে সিংহাসনে স্থাপন করে পবিত্রভাবে পুজো করতে থাকেন। লাহ্-থো-থোরি নানৎসানের পৌত্র তেম্বো সাঙোয়া ছিলেন জন্মান্ধ। তিনি এই পবিত্র গ্রন্থে নিয়মিত পুজো করতেন। অভিষেকের সময়, এই গ্রন্থ নিয়মিত পুজো করার ফলে তিনি আশ্চর্যভাবে দুচোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। দৃষ্টিশক্তি লাভ করেই তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করেছিলেন গ্রন্থটির মধ্যে একটি অদ্ভুত চিত্র। চিত্রটিতে ছিল, টাগ্রী পর্বতশীর্ষে একপাল মেষ। সেইজন্য তার অন্য নাম হয়েছিল টাগ্রী-নিয়ান-সিগ্ বা টাগ্রী পর্বতশীর্ষে মেষপাল লক্ষ্যকারী রাজপুত্র। তেম্বো সাঙোয়ার পুত্র, নাম-রি-স্রন্ সাঙ্ তিব্বতে অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন সুদূর চীনদেশের অনুকরণে। তিনি লবণ আবিষ্কার করেন। তার পুত্র স্রন্ সাঙ্ গোম্পা, ৬০০-৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিব্বতের রাজাদের মধ্যে যতদূর জানা যায় স্রন্-সাঙ-গোম্পার সময়ে বর্ণমালার সম্পূর্ণ প্রচলন হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন

বৌদ্ধধর্মের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লিখিত। তাই তিব্বতের বর্ণমালাকে আরও সহজ ও সরল করবার জন্য পালি ও সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে সমন্বয়সাধন করার প্রয়জনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য তিনি তার সচিব সম্ভোটকে ষোলজন সহচরসহ পাঠিয়েছিলেন কাশীতে সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিক্ষার জন্য। রাজা চীন ও নেপালের রাজকুমারীদের বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পৌত্র স্বনামধন্য থি-স্রঙ্ দৎস্যুন ৭৩০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। থি স্রঙ্ দৎস্যুনের, থি্র স্রঙ্ দ্যৎস্যুনের সময়েই তিব্বতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর পিতা চীনদেশীয় রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। চীনদেশীয় রাজকুমারী ছিলেন নিষ্ঠাবতী ধার্মিক, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মাতার ইচ্ছা ও আদেশ ক্রমে থি্র সঙ্ দ্যৎস্যুন বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে আসেন সংস্কৃত ও পালি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য। তিনি এই উদ্দেশ্যে কাশীতে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় অধ্যয়ন করে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা। সেই সময় বৌদ্ধ ধর্মে, সুপণ্ডিত ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাচার্য পণ্ডিত পদ্মসম্ভব। যুবরাজ থি্র সঙ্ দ্যৎস্যুনের সঙ্গে ইতিমধ্যে প্রখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও তাত্ত্বিক পণ্ডিত শান্তরক্ষিতের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। যুবরাজের ইচ্ছা ছিল তিব্বতে বিরাট বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করে সেখানে উপযুক্ত ধর্মগুরুকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি তিব্বতে সামিয়েতে বার বার বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রতিবারই ভূমিকম্প ও নৈসর্গিক দুর্বিপাকে তাঁর চেষ্টা ব্যহত হয়। ফলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, কোনো অপদেবতা এই কার্যে বাধা দিচ্ছে। পণ্ডিত শান্তরক্ষিতের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলোচনা কালে শান্তরক্ষিত, অসাধারণ যোগবিভূতিসম্পন্ন বজ্রযান মতবাদের ধারক পণ্ডিত পদ্মসম্ভবকে আমন্ত্রণ করে তিব্বতে নিয়ে যাবার উপদেশ দেন। তাঁরই উপদেশ

ক্রমে যুবরাজ যোগাচার্য পণ্ডিত পদ্মসম্ভবকে আমন্ত্রণ করে পরম সমাদরে নিয়ে যান তিব্বতে। পণ্ডিত পদ্মসম্ভাবের নির্দেশক্রমে ও তত্ত্বাবধানে ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের সামিয়েতে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত পদ্মসম্ভব, তিব্বতীয়দের কাছে গুরু রিম্পোচে নামে পূজিত হয়ে বাস করতে থাকেন সেখানে। তাঁরই প্রচেষ্টায় সারা তিব্বতে বজ্রযান মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

থ্রি-সঙ্‌ ছ্যৎস্যুনের ছিল তিনি টি পুত্র। একজন বসবাস শুরু করেন পূর্ব তিব্বতে। সেখানে থেকেই প্রসিদ্ধ খামবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পরবর্তীকালে খামবংশই লাসায় রাজত্ব করতে থাকে। অপর পুত্র তাঁর পাঁচটি পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গুরু ছুওয়াঙ্‌ লো-ব্র্যাগএর দর্শনের জন্য যান পশ্চিমদিকে। সেখানে তিনি না লাঙ্‌গা গুরু টাশী নাম ধারণ করে লাসায় যান। লাসায় সাকিয়া বৌদ্ধ মঠের সন্ন্যাসী গুরু জো-ভো রিম্পোচি তাঁকে নির্দেশ দেন দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে ডেমোজঙ্‌ গ্রামে যাবার জন্য। গুরু টাশী তাঁর নির্দেশ ক্রমে লাসা থেকে চলে যান ডেমোজঙ্‌। ডেমোজঙ্‌ থেকে পরে সাকিয়াতে যান। সাকিয়ায় তখন হুরাচ্‌, প্রুল পাহী-লা-খাঙ্‌ নামে বিরাট বৌদ্ধ মঠ নির্মাণকার্য শুরু করেছিলেন। মঠের দালানটি সাততলা করবার পরিকল্পনা ছিল। চারটি বিশাল কাঠের থাম্‌, ও একশ ষাটটি ছোট ছোট থাম দালানের বিশাল ছাতকে ধারণ করবে। কিন্তু চারটে কাঠের থাম হাজার হাজার মানুষ অক্লান্ত চেষ্টা করেও পারছিল না স্থাপন করতে। গুরু টাশীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কিন্তু সামান্য আয়াসেই স্তম্ভ চারটি স্থাপন করে জো-খিয়া-বুম্‌সা নাম ধারণ করেন। তাঁর এই অসাধারণ ক্ষমতায় হুরুচ এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে—তিনি জোখিয়া বুম্‌সার সঙ্গে নিজ কন্যা গুরুমোর বিবাহ দিয়েছিলেন। বিবাহের পরই জোখিয়া বুম্‌সা অন্যান্য ভাই ও পিতা, গুরু টাশীর সঙ্গে খাম্পাজঙ্‌ তাঁর উত্তর-পশ্চিমে পাশী নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে চারশত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অবস্থান করতে পারে এত

বড় একটি বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করে, বুম্‌সা এক ভাইকে তাঁর অধিকর্তা নিয়োগ করেন। এই মঠেই দেহত্যাগ করেন গুরু টাশী। পিতার মৃত্যুর পর তিন ভাই শে-শিঙ্‌, টেন্‌ডঙ্‌ ও কার্ত্‌ সগ্‌ ভুটানের হোয়াতে চলে যান। জোখিয়া বুম্‌সার কিন্তু পর্যটন ও মঠ স্থাপনের ইচ্ছা তাঁকে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে চলে। ফারী থেকে তিনি টাকলুঙ্‌ হয়ে খাঙ্‌ যান। সেখানে থেকে আরও এগিয়ে যান মচু। মচু থেকে চুম্বিতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। চুম্বির প্রাসাদের সন্নিকটে উত্তরে জোখিয়া বুম্‌সার বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ আছে।

প্রথম তিন ভাইয়ের বংশধর বেগ্‌-সেন্‌ গিয়া বংশ নামে পরিচিত হয়। তাঁরা বংশানুক্রমিক গুরু টাশীর ধ্যান ও পুজো করতেন বলে তাঁদের বলা হত, টাঁশী ফোলা। জো খিয়া বুম্‌সার পরিবারবর্গ মুখ্য বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশী বৌদ্ধবিহারের মতে পূজা অর্চনা করতেন বলে তাঁরা পাশী ফোলা নামে অভিহিত হতে থাকেন।

জোখিয়া বুম্‌সা অপুত্রক ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর লামাদের কাছে উপদেশ ভিক্ষা করলে, লামারা জানান যে জোখিয়া বুম্‌সাকে লেপচাদের দেশে গিয়ে তাঁদের প্রধানকে তুষ্ট করতে হবে। লেপচাদের প্রধান তুষ্ট হলেই তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। লামাদের এই উপদেশ অনুযায়ী জোখিয়া বুম্‌সা সতের জন অনুচরসহ ইয়াক-লা, পেনলঙ পেরিয়ে রঙ্‌চোপঙ্‌এর কাছে সেবুলায় উপস্থিত হন। সেখানে লেপচাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন তাদের প্রধানের নাম থেকঙ্‌ টেক্‌ ও তাঁর স্ত্রীর নাম নিয়াকঙ্‌ নাল্‌। কিন্তু তাঁরা দুজন কোথায় বাস করেন, সে সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন না। জোখিয়া বুম্‌সা অবশেষে দলবল নিয়ে গ্যাঙটক অভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে বুম্‌সা একজন কৃষ্ণকায় বৃদ্ধকে জমিচাষরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে, তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করেন লেপচাদের প্রধানের সম্পর্কে। বৃদ্ধচাষী বুম্‌সার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে জমি চাষ করতে থাকেন নিজের মনেই। বৃদ্ধের হাবভাব, ও চাহনি বুম্‌সার মনে সন্দেহের

উদ্রেক করে। তিনি দলবল নিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন একটি ঝোপের আড়ালে। জমি চাষ শেষ হতেই বৃদ্ধ চাষী যখন গৃহাভিমুখে রওনা হন, বুম্‌সাও তাঁর দলবল নিয়ে গোপনে বৃদ্ধকে চলেন অনুসরণ করে। দীর্ঘ পার্বত্য পথ পেরিয়ে বৃদ্ধ চাষী একটি গৃহের সামনে এসে হাজির হন। গৃহের অভ্যন্তরে উচ্চাসনে একজন বৃদ্ধ পুরুষ পশুচর্মে নির্মিত পোষাক পরিহিত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর গলদেশে ছিল পশুমুণ্ডের মালা। গৃহে প্রবেশ করে বৃদ্ধ চাষী, এই অদ্ভুত দর্শন পুরুষকে প্রণাম করেন ভক্তি ভরে। বুম্‌সা অনেক অনুনয়-বিনয় করে প্রবেশ করার অনুমতি লাভ করেন গৃহের অভ্যন্তরে। প্রচুর মূল্যবান উপহার নিয়ে বুম্‌সা উচ্চাসনে উপবিষ্ট বৃদ্ধকে অভিবাদন করে আপনার মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। বুম্‌সা জানতে পেরেছিলেন এই বৃদ্ধ পুরুষই থেকঙ্‌টেক। সমস্ত লেপচারা পুজো করে থাকে, এই বৃদ্ধকে।

থেকঙ্‌টেক্‌ বুম্‌সাকে আশীর্বাদ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে বুম্‌সার তিনটি সন্তান হবে। এই তিনটি পুত্রসন্তানের মধ্যে একজনের বংশধর হবেন ভবিষ্যতে সিকিমের সম্রাট ও সমগ্র লেপচাদের প্রধান। বর লাভ করে হৃষ্ট মনে বুম্‌সা ফিরে আসেন চুম্বিতে। পরে তাঁর তিনটি সন্তানের জন্ম হয়। জোখিয়া বুম্‌সা তাঁর পুত্রদের সঙ্গে করে দ্বিতীয় বার সিকিমে প্রবেশ করেন চোলা অতিক্রম করে। ফিনিয়ঙের নিচে পিয়াক্‌সে গিরিগুহায় থেকঙ্‌ টেকের সঙ্গে তিনি দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন পুত্রদের সঙ্গে করে।

পুত্রদের বয়ঃপ্রাপ্তির পর জোখিয়া বুম্‌সা একদিন এক একজনকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

জ্যেষ্ঠ পুত্র জবাব দেন, আমি স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করব।

দ্বিতীয় পুত্র বলেন, মানুষের নেতৃত্ব করা ছাড়া আর কোনো কিছুই আমার কাম্য নয়।

কনিষ্ঠ পুত্র জবাব দেন—আমি জমি চাষ করে ফসল সংগ্রহ করবো। এর উপর নির্ভর করেই জীবনধারণ করব।

পুত্রদের জবাব অনুযায়ী জোখিয়া বুম্‌সা তাদের নামকরণ করেছিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রেখেছিলেন—কিয়া-বো-রাব্ বা জোচ্চোর।

দ্বিতীয় পুত্রের নাম—মিত্ পন্-রাব বা জনগণের নেতা।

কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হয়েছিল—লাঙ্ মো-রাব বা চাষী।

বুম্‌সার মৃত্যুর পরে তিন ভাই চুম্বি থেকে চলে আসেন সিকিমের অভ্যন্তরে। সেখানে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন গ্যাঙটক ও ফাতুঙ টেকে। ঠিক একই সময়ে তাঁদের অন্যান্য আত্মীয়পরিজনও তিব্বতের হায়া ও চুম্বি থেকে এসে বসবাস শুরু করেন গ্যাঙটকে। লেপচাদের পাশাপাশি বাস করে তাঁরাও সিকিমের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

কিয়া-বো-রাব ও তাঁর বংশধরগণ একস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করতেন না। বাসস্থান ক্রমাগত বদল করতে করতে এগিয়ে যেতেন পূর্বাভিমুখে। পরে তাঁদের পরিবারবর্গ ইউল টেম্পা বা বনবাসী নামে অভিহিত হন। লাঙ্ মো-রাবের বংশধরদের নাম হয় লেঙ্গের পা। মিত্ পন্-রাব ও লাঙ মো-রাব উভয় বংশের বংশধরগণই পিয়াক সেন টার পা নামে পরিচিত হন। মিত্ পন্-রাব তিব্বতের সাকিয়ার কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েকে বিবাহ করেন। তাঁর চারটি পুত্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র সাকিয়ায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁর নাম হয় ঝাঙ্ পো টার্। দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাসের দশম দিনে, তদনুযায়ী তাঁর নাম হয় ৎশেষ ছুতার। তৃতীয় পুত্রের জন্ম রবিবার, তাই তাঁর নাম হয় নিঈমা গিয়াস পা। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন সন্ন্যাসী। টাশীর জন্মোৎসব যখন পালিত হচ্ছিল তখন কনিষ্ঠ পুত্র গুরু টাশীর জন্ম হয়।

এই চার ভাইএর পরিবারবর্গ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল সিকিমের চারটি সম্ভ্রান্ত বংশের। (তঙ্ ছুরুশে)। এই চারটি বংশের পৃথক

পৃথক নাম ছিল—ঝাঙ্ টার্ পা, ৎশেষ গিয়ার টার পা, নিঙমা গিয়াস্ পা ও গুরু টাশী পা।

মিত্‌পন্-রাবের দ্বিতীয় পুত্র ৎশেষ ছুতারএর ছিল পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। তাঁর কন্যার সঙ্গে ৎশেষ ছুতারের অনুচরের অবৈধ প্রণয়ের জন্য এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছিল। এই অবৈধ সন্তান জন্মজনিত বংশের কলঙ্ক, কিয়া-বো-রাবের বংশধরদের করেছিল কুপিত। ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা ৎশেষ ছুতারের কন্যা ও তাঁর প্রণয়ীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। নবজাত সন্তানের কান কেটে ফেলে তাকে নিওর স্পগ পাৎসো পা নামে অভিহিত করেন। এই হিংসাশ্রয়ী ঘটনা কিয়া-বো-রাব ও মিত্‌পন্-রাব বংশের মধ্যে বপন করে চরম শত্রুতার বীজ। সেই বীজের বিষময় পরিণাম দেখা দেয় যথা সময়ে। কিয়া-বো-রাবের পুত্র গিয়াল পো আচু ষড়যন্ত্র করে মিত্‌পন্-রাবের কনিষ্ঠ ও ধার্মিক পুত্র গুরু টাশীকে হত্যা করেন সোনামসির সন্নিকটে। নয় বৎসর পরে গুরু টাশীর পুত্র গিয়াল গো আফার আক্রমণ করে গিয়াল পো আচুকে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গিয়াল পো আচু রঙগু থেকে পালিয়ে ডেকলিঙের সন্নিকটে থুন পোরুঙ্গে আশ্রয় নেন। রঙগুনে গিয়াল পো আফা বাস করতেন, সেখান থেকে থুন পোরুঙ্গের দূরত্ব খুব সামান্য বলে গিয়াল পো আচু পালিয়ে গিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। সে জন্য তাকে পাথেঙ ডিঙ, আরও এগিয়ে ডুমসঙ, সেখান থেকে আরও দূরে ভালিঙে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়।

পিতৃহন্তাকে হত্যা করতে না পেরে চঞ্চল হয়ে ওঠেন গিয়াল পো আফা। তিনি ভুটানরাজের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেন। তদনুযায়ী ভুটানের সেনাপতি অরিসেথা গিয়ালপো আচু ও তাঁর পুত্র শাভূম্ রাজাকে আক্রমণ করে অম্বিওখের কাছে বধ করেন নির্মম-ভাবে। এই রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য ঝাঙ্‌টার পা বংশের সঙ্গে ইউল্ টেম্পা বংশের শত্রুতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই শত্রুতার জন্য দুই বংশের মধ্যে সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হত না।

এমন কি পরবর্তীকালে ইউল টেম্পা বংশের কোনো উপহার বা ধনরত্ন রাজকোষে স্থান পেত না। গুরু টাশীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঝাবদা ফাগ্ ছিলেন নির্বিরোধী মানুষ। তার পুত্র তেনজিঙ্। গুরু তেনজিঙের পুত্রই সিকিমের প্রথম চোগিয়াল ফুন্টসগ নামগিয়াল।

সিকিম রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস তথ্যনির্ভর নয়। তবু এ এ সম্পর্কে রয়েছে নানা কাহিনী প্রচলিত। তবে এ তথ্যের সত্যতা অনস্বীকার্য যে সিকিমের রাজবংশ উদ্ভূত হয়েছিল মিনাকে। এই স্থানটি বর্তমানে পূর্ব তিব্বতের খাম। অবশ্য অতীতে সিকিমের রাজ্য সীমা অনেক দূর পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। উত্তরে সিকিমের সীমানা ছিল তিব্বতের ফারীর সন্নিকটে থাঙ্‌লা পর্যন্ত, পূবে ছিল ভুটানের প্যারোর নিকটে ট্যাগঙ্‌লা পর্যন্ত। কথিত আছে খাম রাজবংশের পূর্ব-পুরুষ এসেছিলেন ইন্দ্রবোধি রাজবংশ থেকে। ইন্দ্রবোধি বর্তমানে ভারতের হিমাচল প্রদেশ। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের যুগে এই ইন্দ্র-বোধি থেকে দুঃসাহসী যুবরাজ তিব্বতে খামএ এসে মিনাক রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন খ্রীষ্টীয় নবম শতকে।

কথা ও কাহিনী তথ্যনির্ভর হতে পারে না। তবু মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে একটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, সে হচ্ছে সিকিমের রাজবংশ প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় কোনো রাজবংশ থেকেই উদ্ভূত। পুরাণ আর মহাকাব্যের যুগে হয়তো বা দেশকালপাত্র কোনো সীমা রেখার গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন সিকিমের নাম যেমন ছিল বে ইউল ডেমোজঙ, আরও সুদূর অতীতে পুরাণ আর কাব্যের যুগে বে ইউল ডেমোজঙ হয়তো বা অন্য কোনো নামে ছিল পরিচিত। সে পরিচয় আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়।

ষোল

নতুন ঘর, নতুন মানুষ ; নতুন রাজা।

পুরোনো যা' কিছু ছিল, পড়ে থাকে চুম্বি উপত্যকায়, ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদের স্তূপের মাঝে। জানি না, আজও আছে কি না। ইতিহাসের ক্ষীণধারা চতুর্দশ শতকের কোনো এক সময় হয়তো বা চো-লা, ইয়াক্-লা বা জেলাপ-লা পেরিয়ে এসেছিল নতুন ঘরে। সে ধারা ক্ষীণ হলেও নীরব নিস্তব্ধ নয়, প্রাণচঞ্চল। তাই হারিয়ে যায় নি পাহাড়-পর্বতের গহ্বরে। নতুন ঘরের ইতিহাসের প্রথম নায়ক খুঁজতে খুঁজতে সেই ক্ষীণ ধারার সন্ধান মিলেছিল গ্যাঙটকের সন্নিকটে। সেখান থেকে ইয়ক্‌সাম সুন্দর সবুজ বনানীর ভেতর দিয়ে চড়াই আর উৎরাইয়ের বাধা ডিঙিয়ে পথ। দীর্ঘ হলেও মনমুগ্ধকর ক্লান্তিকর হলেও এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সে পথ চলা। ইয়ক্‌সাম, স্বচ্ছ সলিলা কাতক পোখরীর নিস্তরঙ্গ জলের দর্পণে মুখ দেখে তুষার শুভ্র কাব্রু শিখর।

অভিষেকের দিন লাহ্বছেন ছেম্বু হয়তো বা বলেছিলেন—"আজ থেকে তোমার নতুন পরিচয়, তুমি ফুণ্টসগ নামগিয়াল। অতীত ভুলে যাও, বর্তমানের আলোকবর্তিকা নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে ঘরে যেতে হবে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে। নতুন মানুষদের শোনাতে হবে মুক্তির বাণী। আজ থেকে তুমি চোগিয়াল। ফুণ্টসগ স্তব্ধ হয়ে শুনেছিলেন সব কথা। হয়তো বা দুর্বহ দায়িত্বের কথা ভেবেছিলেন।

ফুণ্টসগ, গুরু তেনজিঙের পুত্র। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন গ্যাঙটকের সন্নিকেট। শৈশব, কৈশোর আর যৌবন কেটেছিল তাঁর সেখানেই। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আহূত হয়ে এসে-

ছিলেন ইয়ক্‌সাম। ইয়ক্‌সামে তাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। লেপচাদের প্রধান থেকঙ্‌ টেকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল মাত্র কয়েক বৎসর পরে। সিংহাসনে আরোহণ যেমন ফুণ্টসগের জীবনে এক আকস্মিক ঘটনা, রাজ্য শাসন ও সমস্ত রাজ্যে সংস্কারসাধন কিন্তু তেমনি এক দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর পূর্বে থেকে সমস্ত সিকিমের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ছিল। সে দলের দলপতিরা যথেচ্ছভাবে তাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অঞ্চলগুলো শাসন করত। এই দল-গুলোর মধ্যে একতা ছিল না, তারা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ফুণ্টসগের প্রধান ও প্রথম কাজ হয়েছিল এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে স্বপক্ষে নিয়ে আশা ও তাদের ওপরে নিজের পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করা। এই কাজে প্রধান সহায়ক ছিলেন লাহ্বছেন ছেম্বু। কথিত আছে, লাহ্বছেন ছেম্বুর সহায়তায় কাঞ্চনজঙ্ঘার দক্ষিণ উপত্যকার শাসক মাঙ্গল দলপতি শিণ্টু সাটিচেনকে পরাজিত করেছিলেন ফুণ্টসগ। শিণ্টু সাটিচেন পলায়নের সময় অভিসম্পাত দিয়ে যান, চন্দ্র, সূর্য ফুণ্টসগের এই অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি দেবে।

চোগিয়ালরূপে অভিষিক্ত হবার পরই, লাহ্বছেন ছেম্বু তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন লামারূপে। রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্বও তাঁর ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছিল। তাঁর আগ্রহ ও লাহ্বছেন ছেম্বুর প্রেরণায় ইয়ক্‌সামে পওহুনরী গিরিশিরার ওপরে ডুবদি বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল। এই মন্দিরে আজও রয়েছে চোগিয়ালের মূর্তি, তাঁর অভিষেকের সময়কার বিভিন্ন দ্রব্যাদি। অভিষেকের সময় যে সব গ্রন্থ পাঠ করা হয়েছে সেগুলি। গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি ছাড়াও সিকিমের ধর্ম প্রতিষ্ঠার পুরোধা লাহ্বছেন ছেম্বু, রিগজিন ছেম্বু ও শেম্পা ছেম্বুর মূর্তি রয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে সম্ভবত ডুবদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লাহ্বছেন ছেম্বুর নির্দেশক্রমে, ইয়ক্‌সামের অনতিদূরে কুলহাইত গিরিশিরায় সাঙাছোলিঙে ও

পেমিওওচিতে বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির নির্মাণের কার্যসূচিও গ্রহণ করা হয়েছিল।

ফুন্টসগ বিবাহ করেছিলেন গ্যাঙটকের বেপসানগ্যে বংশের কোনো এক অভিজাত পরিবারে। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক পুত্র-সন্তান লাভ করেছিলেন। তার নামকরণ হয়েছিল তেনস্থ্যঙ নামগিয়াল।

উনত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন ফুন্টসগ। এই সময় তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতাদের স্বপক্ষে নিয়ে আসবার জন্য। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লেপচা, ভুটিয়াদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভ করার জন্য, লাহ্বছেন ছেম্বুর সহযোগিতায় বৌদ্ধ মঠ, মন্দির নির্মাণ ও ধর্মপ্রচারের জন্য লামাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যাপারেও তাঁকে মনোযোগী হতে হয়েছিল। ক্ষুদ্র হলেও সিকিমের বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চল উপযুক্ত রাস্তার অভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন তিনি। শাসনকার্যে সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে ভাগ করে ছিলেন বারোটি জঙ্ বা জিলায়। প্রত্যেকটি জঙের জন্য একজন করে লেপচা জঙ্পন বা শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। ফুন্টসগকে শাসনকার্যে সহায়তা ও পরামর্শ দেবার জন্য মন্ত্রিসভায় বারোজন সদস্য ছিলেন। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফুন্টসগ, সিকিমের প্রথম চোগিয়াল দেহত্যাগ করেন।

ফুন্টসগের অবর্তমানে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে চোগিয়াল পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তেনস্থ্যঙ্ নামগিয়াল। তাঁর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা তিব্বত থেকে প্রখ্যাত লামা জিগমে গিয়াৎসোর আগমন। তিনি লহ্বছেন ছেম্বুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর আরব্ধকার্য সমাধার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সাঙাছোলিঙের বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায়। এই বৌদ্ধ মঠ সিকিমের আপামর জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত বলে ঘোষিত হয়েছিল। সত্যিকারের আদর্শ কঠোরব্রতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের

অবস্থানের ও ধর্মচর্চার জন্য আরও একটি বৌদ্ধ মঠ স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল লাহ্বছেন ছেম্বুর। স্থান নির্বাচন করেছিলেন সাঙাছোলিঙের পূর্ব-দক্ষিণে পেমিওঙচিতে। লাহ্বছেন ছেম্বুর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়েছিল পেমিওঙচিতে। সিকিমের তৃতীয় ও বৃহত্তম এই বৌদ্ধ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল শুধু তিব্বতীয় লামাদের অবস্থানের জন্য। এই মন্দিরের অঙ্গসজ্জা ও দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের জন্য তিব্বতের চিত্রকরদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। মন্দিরেটি ছিল বর্তমান মন্দির ও মঠের অর্ধমাইল পশ্চিমে। তার ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে। তেনস্যুঙ নামগিয়াল রাজপরিবারের জন্য রুবদেনৎসেতে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তেনস্যুঙের রাজমহিষী ছিলেন তিনজন। প্রথমা ও প্রধানা মহিষী নিয়ামবি এনমো ছিলেন তিব্বতীয়। তাঁর গর্ভে একটিমাত্র কন্যার জন্ম হয়েছিল। এই কন্যা পেণ্ডে আমো সিকিমের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তেনস্যুঙের দ্বিতীয়া মহিষী দেবা সাম্ শেরপা ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সিকিমের টিঙ্কিজঙ্-এর কোনো এক সম্ভ্রান্ত বংশের। তাঁর গর্ভেই জন্মলাভ করেছিলেন সিকিমের পরবর্তী চোগিয়াল চাডার নামগিয়াল ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে।

তেনস্যুঙ তৃতীয়বার বিবাহ করেছিলেন লিম্বুরাজ ইও ইও হাঙের কন্যাকে। লিম্বরাজ বাস করতেন পশ্চিমে অরুণ নদীর সন্নিকটে। তৃতীয়া মহিষীর সঙ্গে সাতজন মহিলা এসেছিলেন। সিকিমের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাদের বিবাহ হয়। তৃতীয়া মহিষীর গর্ভে শালনো গুরু নামে পুত্র ও পেণ্ডি ছেরিঙ্ গিইনুর জন্ম হয়েছিল। শালনো গুরু ডিঙগ্রঙে বসবাস করতেন কিন্তু তাঁর বংশ পরবর্তীকালে লুপ্ত হয়। সিকিমের নান সাঙ কার্পা পরিবারে বিবাহ হয়েছিল পেণ্ডির।

তেনস্যুঙ নামগিয়ালের রাজত্বকাল ছিল প্রায় তিরিশ বৎসর। এই দীর্ঘ তিরিশ বৎসরে তিনি পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুচারুরূপে

সম্পন্ন করবার জন্য, সিকিমের বিভিন্ন জাতির সর্বজনগ্রাহ্য জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্যে প্রধান আটটি জাতির ভেতর থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন। এই আটজন প্রতিনিধি ছিলেন তাঁর রাজ্যের উপদেষ্টা। ব্যক্তিগত জীবনে তেনস্যুঙ অত্যন্ত অসুখী ছিলেন। পারিবারিক অশান্তি তাঁর শেষ জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তিনজন রাজমহিষীর জন্মস্থান ভিন্ন ও বিভিন্ন পারি-পার্শ্বিক অবস্থায় লালিত বলে তাঁদের কারও ভেতরে বিন্দুমাত্র সদ্ভাব ছিল না। তিব্বতী মহিষী নিজেকে সব সময়ে অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। ফলস্বরূপ রাজমহিষীদের মধ্যে প্রায়ই কলহ লেগে থাকত। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে তেনস্যুঙ নামগিয়াল অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। তেনস্যুঙ নামগিয়াল যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন তাঁর দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভজাত পুত্র চাডোর নাম-গিয়াল মাত্র চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক তরুণ। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। কিন্তু তাঁর চোগিয়াল পদে অভিষিক্ত হওয়া তেনস্যুঙের প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠা কন্যা পেণ্ডে আমোর মনঃপূত হয় নি। ভ্রাতা ভগ্নীর বিবাদ ঘোরতর শত্রুতায় পরিবর্তিত হয়েছিল।

চাডোর নামগিয়ালকে সিংহাসন চ্যুত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন পেণ্ডে আমো। তিনি ভুটান রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভাইকে ধ্বংস করবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভুটানের দেবরাজ তাঁর অনুরোধ ক্রমে সুযোগ্য সেনাপতি টা-প-নাগ দোয়াঙকে নির্দেশ দেন সিকিম আক্রমণ করবার জন্য। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানের দুর্ধর্ষ সেনাদল সিকিমে প্রবেশ করে অতর্কিতে রুবদেনৎসে রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে। চাডোর নামগিয়ালের অনুগত মন্ত্রী ইয়ুগথিঙ ঈয়েসে চোগিয়ালকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়ান। দুর্গম চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তাঁরা তিব্বতে উপস্থিত হন নেপালের ইলাম ও ওয়ালঙ অতিক্রম করে।

তারপর সুদীর্ঘ পদযাত্রা, তুষারময় পার্বত্যভূমি পেরিয়ে তাঁরা দুজন উপস্থিত হন লাসায়। সেখানে দালাই লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের দুর্দৈবের কথা বিস্তারিতভাবে বলেন। দালাই লামা তাঁদের আশ্রয় দেন তাঁর রাজ্যে। অপরদিকে ভুটানী সৈন্যদল রুবদেনৎসে রাজপ্রসাদ দখল করে বসে। সেখানে মন্ত্রী ইয়ুগথিঙ্‌ ঈয়েলের পুত্রকে বন্দী করে। রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত হয় যথেচ্ছভাবে। পেণ্ডে আ-মোর আমন্ত্রিত ভুটানী সৈন্য সিকিমকে দখলে রাখে প্রায় সাত বৎসর। এই সময়ের মধ্যে টাকসেগঙ্‌ ও নামগিয়াল টেম্পোর সন্নিকটে পাখিয়ঙের নিকটস্থ ওঙদো ফোদঙে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এ ছাড়াও তারা রঙ্গীত নদীর তটভূমি থেকে রুবদেনৎসের প্রাসাদ পর্যন্ত পাথর দিয়ে সোপান শ্রেণীর মতো বাঁধানো পথ নির্মাণ করে-ছিলেন। তিব্বতের লাসায় অবস্থানকালে চাডোর নামগিয়াল তিব্বতী ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল লাসায়। ফলে তিনি ষষ্ঠ দালাই লামার রাজজ্যোতিষীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠা, সততা ও ধর্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন ষষ্ঠ দালাই লামা। তিনি চাডোর নামগিয়ালকে মধ্য তিব্বতের কিছু কিছু তালুক দান করেছিলেন।

তিব্বতে বসবাস করলেও চাডোর নামগিয়াল হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। তাঁর অনুরোধক্রমে দালাই লামা ভুটানের দেব-রাজকে সিকিম থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নেবার নির্দেশ দেন। ভুটানী সৈন্য সিকিম ত্যাগ করলে চাডোর নামগিয়াল আবার প্রবেশ করেন নিজ রাজ্যে। সিকিমের জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানায়। হৃতবল সৈন্যরা যেন নতুন আদর্শবোধে বলীয়ান হয়ে ওঠে। তাদের সাহায্যে চাডোর ভুটানী সৈন্যদের বিতাড়িত করেন সিকিমের ভূভাগ থেকে। কিন্তু দীর্ঘকাল সিকিম অবরোধের ফলে ভুটানীরা সিকিমের কোথাও কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল। ফলে

তাঁদের উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না, যার ফলে সিকিম রাজাকে কালিম্পঙ ও রেনক নামে দুটি অংশ হয় হারাতে।

চাডোর নামগিয়ালের সঙ্গে এসেছিলেন প্রখ্যাত লামা জিগমে পাও। তিনি ছিলেন তিব্বতের দুগপা লিঙ মঠের লামা। চাডোর নামগিয়ালের দীর্ঘ সাত বৎসর তিব্বতের প্রবাসজীবন ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল সব চাইতে বেশী। তাই দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর একাজে সক্রিয় সাহায্য করেন জিগমে পাও। তিব্বতে বসবাসকালে মিণ্ডলিঙের বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির তাঁর মন জুড়েছিল। তাই তিনি পেমিওঙচিতে নতুন করে বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ নির্মাণ করান। এই মঠ ও মন্দির মিণ্ডলিঙের মঠ মন্দিরকে অনুকরণ করে নির্মিত হয়। বর্তমান পেমিওঙচির মন্দিরটিই এটি। এই বৌদ্ধ বিহারে একশত আটজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বসবাসের ব্যবস্থা রাখা হয়। চাডোর নামগিয়াল প্রথম নিজের মস্তক মুণ্ডন করে লামারূপে দীক্ষিত হন। তিনি আদেশ জারী করেন যে প্রত্যেক ভুটিয়া পরিবারের তিনটি সন্তানের দ্বিতীয় জনকে লামারূপে দীক্ষিত হয়ে বসবাস করতে হবে পেমিওঙচির বৌদ্ধ মঠে। তিব্বতে থাকাকালে চাডোর বৌদ্ধ মঠের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কঠোরতা লক্ষ্য করেছিলেন। সিকিমের বৌদ্ধ বিহারগুলিতে অনুরূপ শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠার প্রচলনের জন্য তিনি লামাদের অবশ্য পালনীয় নিয়ম ও নিষ্ঠাসম্পর্কিত চাগস্ ইগ্ নামে পুস্তক রচনা করেন। লামাদের মধ্যে মুখোশ নৃত্য বা রঙছান-এর প্রবর্তন করেন বৌদ্ধ মঠগুলিতে। এই নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য টাক্রু বা যুদ্ধের দেবতাকে সম্মান প্রদর্শন করা। তিনি লেপচা প্রজাদের সুবিধের জন্য এক নতুন ধরনের বর্ণমালার প্রচলন করেন। টাশীডিঙে গুরু লা খাম বৌদ্ধ মন্দির স্থাপন তাঁর আর একটি অবদান।

চাডোর নামগিয়ালের ভগ্নী পেণ্ডে আমো ইতিমধ্যে আসক্ত হয়েছিলেন লামা নাহ্-রিন্-ছেনগণের প্রতি। পরে তাঁরা দুজনে

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু লামা ছিলেন রুরুঙপা সম্প্রদায়-ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের পক্ষে সংসারজীবন যাপন করা এবং বিবাহ করা মহাপাপ। পেণ্ডে আমো এই পাপের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে পাপ স্খালনের জন্য টাশীডিঙে মন্দির নির্মাণ করান। তিনি নিজেও ধর্মকার্যে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু ধর্মকার্যে লিপ্ত থাকলেও অন্তরে অন্তরে চাডোরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে চাডোর নিজের অসুস্থতার জন্য গিয়েছিলেন রালাঙের উষ্ণ প্রস্রবণে। সেখানে পেণ্ডে আমো একজন তিব্বতী চিকিৎসকের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। চিকিৎসার নামে তিব্বতী চিকিৎসক চাডোর নামগিয়ালের একটি শিরা কেটে দেন। সেই শিরা থেকে প্রচুর রক্ত ক্ষরণের জন্য মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন চাডোর নামগিয়াল। তাঁর এই মৃত্যুর ফলে সিকিমে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সিকিম দরবার ও সেনাদল বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পেণ্ডে আমো ও তিব্বতীর চিকিৎসকের এই ঘৃণ্য আচরণের জন্য। দরবারের নির্দেশে সৈন্যদল নামচিতে গিয়ে বন্দী করে ফেলে পেণ্ডে আমো ও তিব্বতী চিকিৎসককে। চিকিৎসককে দরবারের আদেশ অনুযায়ী নামচিতেই নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়।

নৃশংতার চরম শাস্তি পান পেণ্ডে আমো। নামচিতে তাঁকে একফালি রেশমী বস্ত্র গলায় জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয় সেখানেই। জঘন্য চরিত্রের জন্য পেণ্ডেকে জাহ মার্ গিয়ান বা দুষ্ট আত্মার প্রতীক বলে মনে করা হয়ে থাকে। এই দুষ্ট আত্মা জাহ দুধ রাহুল নামে অপদেবতার স্ত্রী। জাহ দুধ রাহুল (রাহু?) সূর্য গ্রহণ সংঘটনের অপদেবতা। পেণ্ডের কোনো সন্তান ছিল কিনা জানা যায় নি।

চাডোর নামগিয়াল তিব্বতের 'উ' প্রদেশের কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা লো গিলমেকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ভবিষ্যতের চোগিয়াল গিরমে নামগিয়াল।

চাডোর নামগিয়াল মাত্র ৪২ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তখন থেকেই নানা দুর্বিপাক যুদ্ধবিগ্রহের জন্য সাত বৎসর তিব্বতে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে বসবাস করতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় একুশ বৎসর তিনি রাজ্য শাসন করেন। এই সময়টিও ছিল ঘটনাবহুল।

চাডোরের মৃত্যুর পর এক বৎসর প্রখ্যাত লামা জিগমে পাও নাবালক গিরমে নামগিয়ালের তত্ত্বাবধায়করূপে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে গিরমে নামগিয়ালকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে চোগিয়াল পদে অভিষিক্ত করা হয়। গিরমে তখন মাত্র দশম বৎসর বয়স্ক বালক। তিনি ছিলেন অত্যধিক ভাবপ্রবণ ও অস্থির-চিত্ত। রাজপ্রাসাদের বিধিনিষেধ রাজার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মাঝে মাঝে তাঁর অস্বস্তির কারণ হত। কোনো কিছুর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বা অনুরাগ ছিল না। ঠিক এই সময় ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোলদের তিব্বত আক্রমণের ফলে নিয়াঙ্মাপা সম্প্রদায় তাদের আবাসস্থল মিণ্ডলিঙ্ পরিত্যাগ করে আশ্রয় গ্রহণ করেন সিকিমে। গিরমে এই মিণ্ডলিঙ্ মঠের মঠাধ্যক্ষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু রাণী ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল ও সাধারণ। তিনি তাই রাজাকে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করতে পারেন নি। ফলে গিরমে রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করে দি ছেন লিঙ্ মঠে অবস্থান করতে শুরু করেন। এই মঠ গেইজিঙের কাছে অবস্থিত ছিল। রাণী বসবাস করতে থাকেন রুবদেনৎসে প্রাসাদেই। এই সময় রাজা লেপচাদের বেশী বিশ্বাস করতে শুরু করেন। তাদের প্ররোচনায় জঙ্গদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে থাকেন। ফলে জঙ্গরা লিম্বুয়ানায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে তারা বিদ্রোহী হয়ে যোগাযোগ স্থাপন করে নেপালের সঙ্গে। ফলে লিম্বুয়ানা নেপাল রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। গিরমে বিরক্ত হয়ে দি ছেন লিঙ্ থেকে রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তিব্বতে চলে যান। সেখানে

সন্ন্যাসীরূপে বিভিন্ন স্থানে তীর্থ ভ্রমণ করতে থাকেন। তার ছদ্ম-বেশ ধরা পড়ে না কোথাও। একমাত্র কারমা পা লামা ওয়াঙ্‌ চুক দোরজে তাকে চিনতে পারেন। তাঁর কাছে গিরমে রাজার মতো সম্মান ও যত্ন পেয়েছিলেন। কিছুকাল পরেই গিরমে ফিরে আসেন সিকিমে। ততদিনে রাণী সিকিম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন তিব্বতে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে কিছুকাল অতিবাহিত করার ফলেও গিরমের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটে না বিন্দুমাত্রও। তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী দ্বিতীয়বার বিবাহে ঘোরতর আপত্তি করেন। ১৭৩৩ সনে তিনি গুরুতররূপে পীড়িত হন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাজার কাছে তাঁর অবর্তমানে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবেন জানতে চাইলে মুমূর্ষ রাজা জানান উত্তরাধিকারী সম্পর্কে মন্ত্রিসভার উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই। ইয়ক্‌সামের সন্নিকটে (ডুবদি) সিঙজিয়াকএ একজন তরুণী সন্ন্যাসিনীকে দেখা যাবে ভেড়া চরাতে। সেই সন্ন্যাসিনী সম্ভবত সাঙাছোলিঙ্‌ মঠের। তিনি টাকছুঙ্‌ পরিবারের নীর গাহডেনএর কন্যা। তাঁর গর্ভের সন্তান রাজার ঔরসজাত ও সিকিমের ভাবী চোগিয়াল। সেই পুত্র লালিতপালিত হচ্ছিলেন আঙ্‌ নিয়া খিসায়। তাঁর নাম নামগিয়াল পেঞ্চু। তার পরেই গিরমে নামগিয়াল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নামগিয়াল পেঞ্চু জন্মগ্রহণ করেছিলেন কত খ্রীষ্টাব্দে তা সঠিক জানা যায় নি। তবে খুব সম্ভব ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জন্মরহস্য চোগিয়াল পদে অভিষিক্ত হওয়ার পথে এক বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছিল। গিরমে নামগিয়ালের মৃত্যুর পরই রাজ্যে দেখা দিয়েছিল দারুণ বিশৃঙ্খলা। সিকিমের প্রথম চোগিয়াল, ফুণ্টসগ নামগিয়ালের সময় থেকেই চৌদ্দটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভেতর থেকে জঙ্‌পন বা স্থানীয় শাসনকর্তা নিয়োজিত করা হত। এই জঙ্‌পনদের মধ্যে রাজকোষের ধনরক্ষক শে ছুতার পরিবারের চাঙজেড্‌ তামদিঙ্‌ বেশ একটি শক্তিশালী দল গঠন করে গিরমে নামগিয়ালের

মৃত্যুকালীন ঘোষণার বিরোধিতা করেন। তাঁরা নামগিয়াল পেঞ্চুকে চোগিয়াল পদের যথার্থ উত্তরাধিকারী স্বীকার করে নিতে রাজী হন না। বরং সুযোগ বুঝে তামদিঙ্ নিজেকেই রাজা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু লেপচা প্রতিনিধিরা নামগিয়াল পেঞ্চুর পক্ষাবলম্বন করেন। তাঁদের দলপতি চাঙ্‌জেড্ কারওয়াঙ্ এক প্রতিরোধ বাহিনী নিয়ে তামদিঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। তামদিঙ্ পরাজিত হয়ে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন তিব্বতে। তিব্বতীয় রাজা এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বন্ধ করতে ও সিকিমের যথার্থ চোগিয়াল স্থির করবার জন্য রাবদেন্ শেরপা গিয়ালপোকে পাঠিয়েছিলেন প্রতিভূ নিযুক্ত করে। রাবদেন বিরোধ নিষ্পত্তির নামে পাঁচ বৎসর সিকিমের শাসনভার পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনকালে দুটি দুর্গ নির্মিত হয় কারমি ও মাঙসিরে। এই সময়ে পেমিওঙচির প্রখ্যাত লামা কাঙছেন্ রাল্‌ফ দোরজে গ্রীষ্ম ও বর্ষায় দার্জিলিঙের বিপরীত দিকে রিশিহতে একটি ছোট মঠে অবস্থান করতেন। তাঁর সঙ্গে লেপচাদের দলপতি চাঙ্‌জেড্ কারওয়াঙের ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। কারওয়াঙ দার্জিলিঙে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। তিনি লামা কাঙছেন রাল্‌ফের সহায়তায় তিব্বতের প্রতিনিধি রাবদেনের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর সঙ্গে নামগিয়াল পেঞ্চুর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অবশ্য লামা কাঙছেনের কাছ থেকেও বিস্তারিত তথ্য অবগত হয়ে নামগিয়াল পেঞ্চুকেই যথার্থ চোগিয়াল বলে ঘোষণা করেন। তদনুযায়ী মাঙসিরে প্রকাশিত হয় তাঁর এই বিখ্যাত ঘোষণাপত্র। এই পত্র মাঙসের দুমা নামে পরিচিত। রাবদেন নামগিয়াল পেঞ্চুর হাতে শাসন ভার তুলে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন তিব্বতে।

নামগিয়াল পেঞ্চুর রাবদেনের জ্যেষ্ঠপুত্র আঙজেলের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাণী নিঃসন্তান অবস্থায় আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে দেহত্যাগ করেন। পেঞ্চু পরে তিব্বতের 'উ' প্রদেশের অধিবাসী পিশি টারগিয়েনের কন্যা ও দেবা সমসের খিতি

ফুককার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পিশিটার গিয়েনের কন্যার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়েছিল। দেবা সমসের খিতি ফুককার কন্যার গর্ভে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তেনজিঙ নামগিয়াল।

নামগিয়াল পেঞ্চুর রাজ্যকালের শুরু যেমন বিশৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে, সমাপ্তিও প্রায় তাই। তাঁর রাজত্বকালে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহের কথা প্রায়ই শোনা যেত। রাজ্যের এই অশান্ত পরিস্থিতি, পার্শ্ববর্তী নেপাল ও ভুটানের রাজ্য বিস্তারের লোভ জাগিয়ে তুলত। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে সিকিমে সঙ অধিবাসীরা বিদ্রোহ চাঙজেড্ কারওয়াঙের বিচক্ষণতার জন্য দমিত হয়। সেই সময় নেপালরাজ পৃথ্বিরাজ শাহ্-এর নেতৃত্বে গুর্খা সেনাদল সিকিম আক্রমণের উদ্দেশ্যে সীমন্তবর্তী অধিবাসীদের বিদ্রোহী করে তুলবার চেষ্টা চালাতে থাকে। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানরাজ দেব জুঙ সিকিম আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। একদিক নেপালরাজ পৃথ্বী নারায়ণ শাহ্ অপর দিকে ভুটানরাজের শ্যেন দৃষ্টির মধ্যে অশান্ত সিকিমের শাসনভার চালাতে হয় নামগিয়াল পেঞ্চুকে।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানী সেনাদল পূর্ব সিকিম অক্রমণ করে। সেই অক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয় সারাদেশের জনসাধারণ। তিস্তার ওপরকার সেতু, রালাঙ সাথঙ্-এর সন্নিকেটে ভুটানী সৈন্য পরাজিত হয়ে তামা লা হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে গিয়ে অনেক সৈন্য প্রাণ হারায়। ১৭৭৫ সনে নেপালরাজ পৃথ্বী নারায়ণ শাহ্-এর পুত্র প্রতাপ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেই সিকিম অক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তাঁর প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও সিকিম কার্যত অক্রান্ত হয়। এই যুদ্ধে অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন চাঙজেড্ কারওয়াঙের পুত্র চাঙজেড্ চোথুপ ওরফে আথেঙপঙ্গ ওরফে সত্রাজিৎ। চোথুপের এই নামগুলো বিভিন্ন যুদ্ধের কৃতিত্বের স্বীকৃতি। ভুটানী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে শত্রু সৈন্যদের তামা লাতে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় নাম আথেঙপঙ্গ তার লেপচা গুণগ্রাহী-

গণ প্রদান করে। গুর্খা সেনাদের পরাস্ত করায় তার নাম হয় সত্রাজিৎ।

তেনজিঙ নামগিয়াল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। সিকিম তখন শত্রু পরিবেষ্টিত, বহিঃশত্রুর আক্রমণে সীমান্ত রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত। নামগিয়াল পেঞ্চুর অবর্তমানে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিকিমের চোগিয়াল পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো বৎসর। তিনি চাঙজেড্ কারওয়াঙের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহিষী অনিও গিয়ালজেনের গর্ভে সিকিমের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী চোফো নামগিয়ালের জন্ম হয়। ষোল সতের বৎসর বয়সে তেনজিঙ নামগিয়াল সন্তানের পিতা হন। সিংহাসন তাঁর কাছে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, বরং ছিল কণ্টকাকীর্ণ। সিকিম নেপাল সীমান্ত লঙ্ঘন করে যখন তখন দুর্ধর্ষ গুর্খা সৈন্য প্রবেশ করত সিকিমে। সিকিমী জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে গুর্খা সৈন্য বিতাড়িত করছিল। সিকিমের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষায় তারা যখন ব্যস্ত, ঠিক তখনই পূর্বসীমান্ত অতিক্রম করে ভুটিয়া সৈন্যদল বিপুল বিক্রমে সিকিমে প্রবেশ করে আটটি জঙ্ দখল করে নিয়েছিল। তাদের দ্রুত অগ্রগতি প্রতিহত করেন বিখ্যাত সেনাপতি চাঙজেড্ চোথুপ। তাঁর সেনাদলের হাতে ভুটিয়া সেনাদের দলপতির আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে বিতাড়িত হয়। এই জয় চাঙজেড্ চোথুপের সত্রাজিৎ নাম অক্ষুণ্ণ রাখে।

কিন্তু সিকিমের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগের কালো মেঘ। চাঙজেড্ চোথুপের সহকারী দেব টাকারপো যখন বিপুলবিক্রমে গুর্খা সৈন্যদের বিতাড়িত করে নেপালের চেনপুর পর্যন্ত এগিয়ে যান ঠিক সেই সময় বিলাঙজঙের সন্নিকটে সিকিমী সৈন্যদের আকস্মিক পরাজয় ঘটে। দেব টাকার পো যুদ্ধে নিহত হওয়ায় ভীত ও সন্ত্রস্ত সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। এই পরাজয় ঘটে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। চাঙজেড্ চোথুপ এই মর্মান্তিক পরাজয়ে অবসর গ্রহণ

করেন ভগ্ন মনোরথ হয়ে। যুদ্ধে জয়লাভ করায় গুর্খা সেনাদের বিক্রম বৃদ্ধি পায়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা আবার সিকিম আক্রমণ করে। সৈন্যদল অত্যন্ত সন্তর্পণে চিয়াভঞ্জন হয়ে প্রবেশ করে কুলাহাইত। সেখান থেকে সবার অলক্ষ্যে অতর্কিতে অবরোধ করে রুবদেনৎসে রাজপ্রাসাদ। অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বিমূঢ় রাজা ও রাজমহিষী গুপ্তপথ দিয়ে প্রাসাদ থেকে পলায়ন করেন। রাজপরিবারের ধনসম্পদ ও অলঙ্কার কোনো কিছুই পারেন না নিয়ে আসতে। শুধু রাজমহিষী মন্দিরের অভ্যন্তরের বেদীর ওপর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেবতার মুখোশটি পরিধেয় বস্ত্রের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে আসেন। তেনজিঙের শিশুপুত্র চোফো নামগিয়ালকে ফাতুঙের লামা কাঁধে করে দুর্গম পথ পেরিয়ে রাজার সঙ্গেই চলেন নিরুদ্দেশের পথে। তাঁরা সারাদিন গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পৌঁছে যান কাটঙ ঘাট। সেখান থেকে তাঁরা উপস্থিত হন তিব্বতের মচু উপত্যকায়। অরক্ষিত রাজপ্রাসাদ, বৌদ্ধ বিহার ও গুম্ফা যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠিত হয়। সেই সময় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পেমিওঙচি ও টাশীডিঙ মন্দির।

অপরদিকে গুর্খা সেনাদের বিচক্ষণ সেনাধ্যক্ষ দামোদর পাণ্ডের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী সমস্ত দক্ষিণ সিকিম অধিকার করে নেয়।

তেনজিঙ নামগিয়াল রাজমহিষী ও নাবালক পুত্র চোফো নামগিয়াল তিব্বতের কাবেতে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন ভুটানের দেবরাজা। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তেনজিঙ নামগিয়াল লাসায় উপস্থিত হয়ে সিকিম থেকে গুর্খা সৈন্য হটিয়ে দেবার জন্য তিব্বত সরকারের সক্রিয় সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী তিব্বতী সৈন্য এগিয়ে আসে সাহায্যের জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে সিকিমী সেনাদল শক্তি সঞ্চয় করে গুর্খা সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত

গুর্খা সেনাদল অধিকৃত সীমান্ত অঞ্চল ছেড়ে পলায়ন করতে শুরু করে।

কিন্তু এই দুর্দিনের অবসান দেখবার জন্য হতভাগ্য চোগিয়াল, তেনজিঙের সিকিমে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় না। দুর্গম পদযাত্রা, কঠোর পরিশ্রম ও দুর্ভাবনায় স্বাস্থ্য অকালে ভেঙে পড়েছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তেনজিঙ নামগিয়াল তিব্বতের লাসায় দেহত্যাগ করেন।

সিকিমের সপ্তম চোগিয়াল চোফো নামগিয়াল। তিনি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে তিব্বতে আশ্রয় প্রার্থীরূপে প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। এই পাঁচ বৎসর কখনও বা তাহাকে কাবে, কখন ও বা বসবাস করতে হয় লাসায়। অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতা তেনজিঙ নামগিয়ালের অকাল মৃত্যুর পর, সিকিমের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি দেখা দিতেই তিব্বত সরকার তাকে যথোচিত উপঢৌকন সহ সিকিমে প্রেরণ করেন। মাত্র বারো বৎসর বয়সের কিশোর চোফো নামগিয়ালকে সিকিমের চোগিয়াল রূপে অভিষিক্ত হতে হয়। চোফো ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান। এত অল্পবয়সে তাঁর বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দর্শনে সিকিমীরা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জ্ঞানের দেবতা মঞ্জুশ্রীর অবতার বলে মনে করত। তিনিই সম্ভবত দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করেছিলেন। তার রাজ্য কাল ছিল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ একাত্তর বৎসর। সিকিমের ইতিহাসে এত দীর্ঘকাল রাজত্ব কোনো রাজাই সম্ভবত করতে পারেন নি। চোফো নামগিয়ালের এই দীর্ঘ রাজ্যশাসন তাই ঘটনাবহুল।

তাঁর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সিকিম নেপাল সীমান্তের ও তিব্বত-সিকিম সীমান্তের পুণর্বিন্যাস। এই পুনর্বিন্যাসের ফলে সিকিমের বেশ কিছু সীমান্তবর্তী ভূখণ্ড নেপাল ও তিব্বতের অংশ-রূপে চিহ্নিত হয়।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গুর্খা সৈন্য তিব্বত আক্রমণ করেছিল। পর বৎসর তিব্বতী সেনাদল, গুর্খা সৈন্যদের বিতাড়িত করে, নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে প্রবেশ করে।

উপায়ান্তর না দেখে নেপালরাজ এক অসম্মানকর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে তিব্বতী সেনাদের সহায়তা করেছিল সিকিমের সঙ্, লেপচা ও ভুটিয়া বাহিনী। নেপালের বিরুদ্ধে চীনও তিব্বতের অভিযানে সিকিমী সেনাদলকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নেপালের সঙ্গে চীন ও তিব্বতের সীমান্ত সংক্রান্ত আলোচনায় সিকিমকে বিন্দুমাত্র জানানো হয় না। ফলে সিকিমের অজ্ঞাতসারেই তার রাজ্যের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল। নেপালের সীমানা তিস্তার বাম তীর পর্যন্ত নেওয়া হয়েছিল সরিয়ে। তিব্বতে অবস্থিত পিয়াতেজঙ্ ও সামিয়েতে সিকিম রাজার ভূসম্পত্তি, তিব্বত সরকার হস্তগত করেন। নিজের রাজ্যের সীমানা চোলা ও জেলাপ-লা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে আসেন। ফলে সিকিম চুম্বি উপত্যকার বিশাল অংশ হারায়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিকিম সরকারকে পেমিওঙ্চি ও দক্ষিণ সিকিমের ভূভাগের জন্য নেপাল সরকারকে কর প্রদান করতে হত। এই সময় ভারতবর্ষে নব প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সরকার হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার ও বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা করছিল। সিকিমকে নিজের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য প্রায় বাধ্য হয়েই ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক জালে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নেপাল সরকারের সীমান্ত বিরোধে সিকিমকে করতে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষাবলম্বন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের তিতালিয়ার সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী সিকিম নেপালের সীমানা পুনঃনির্ধারিত হয়। তদনুযায়ী সিকিমের সীমারেখা পশ্চিমে সিংগালি-লা গিরিশ্রেণীর ওপর দিয়ে যায়। এই সীমারেখা স্থির করেছিলেন মেজর ল্যাটার, আর তাঁকে সহযোগিতা

করেছিলেন নাজির চেইনা তেনজিঙ, মাচা তেম্বা, লামা ডাচিন লঙগাডো।

রাবদেনৎস, নেপাল সীমান্ত নিকটবর্তী বলে ঐ বৎসরই রাজধানী স্থানান্তরিত হয় টুমলঙে। সেখানে নতুন করে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।

চোফো নামগিয়াল বিবাহ করেছিলেন তিব্বতের চতুর্থ পাঞ্চেন লামার ভগ্নীকে। তাঁর গর্ভে প্রথম সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সেই সন্তানের অকাল মৃত্যুতে দ্বিতীয় পুত্র সিড্‌কিওঙ্‌ নামগিয়াল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে; দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পুত্র রিশুঙ্‌ নামগিয়ালের জন্ম হয়েছিল।

দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্যের অভাব, সীমান্ত বিরোধ, সবকিছুর সঙ্গে পারিবারিক কলহ যুক্ত হয়ে চোফো নামগিয়ালের ব্যক্তিগত জীবনও অশান্তিময় হয়ে ওঠে। নেপাল তিব্বত সীমানা চুক্তির পর থেকেই, সিকিমের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্কের ফাটল ধরতে থাকে। সিকিমের মহারাণী তিব্বতের পাঞ্চেন লামার ভগ্নী হলেও, পাঞ্চেন লামার সঙ্গে সিকিম রাজের সৌহার্দ ছিল না। অপর দিকে রাজার খুল্লতাত চাঙজেড্‌ বোলেক সিকিমের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করায় বিরোধী পক্ষ ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রকাশ্যে শত্রুতা আরম্ভ করে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই বিরোধ দানা বাঁধতে থাকে। চাঙজেড্‌ বোলেক ১৮২৬ টুমলঙে নিহত হন তুঙইক মিঞ্জোর হাতে। বোলেকের আত্মীয়স্বজন কোটাপাগণ প্রাণভয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে পালিয়ে গিয়ে। কোটাপাদের সঙ্গে প্রায় আটশত লেপচাও ছিল। নেপালে গিয়ে সিকিমের চোগিয়ালের বিরুদ্ধাচারণ করতে শুরু করে। কিন্তু চোগিয়াল তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করে স্বদেশের প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেন। ইলাম থেকে একে একে কোটাপাগণ তাদের সঙ্গীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবার চেষ্টা করতে

থাকেন। কিন্তু কার্যত কোটাপাগণ গুর্খাসৈন্যের সহযোগিতায় নেপাল সিকিম সীমান্তে বিরোধ বাধাতে থাকে প্রায়ই।

ক্যাপ্টেন লয়েড-এর নেতৃত্বে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে একদল ব্রিটিশ অফিসার সিকিমে আসেন সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য। মালদহের কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট মিঃ গ্র্যান্টও এসেছিলেন ক্যাপ্টেন লয়েডের সঙ্গে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দার্জিলিঙের ইজারা গ্রহণ করেন ইংরেজ সরকার। এ জন্য বাৎসরিক ৩০০০ টাকা খাজনা ধার্য হয়। এই খাজনার পরিমাণ বাৎসরিক ৩০০০ টাকা থেকে ৬০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছিল ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ ডাঃ হুকার ও সিকিম দরবারে পলিটিক্যাল অফিসার ডাঃ ক্যাম্পবেল সিকিম ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন দরবারের অনুমতি নিয়েই। কিন্তু তাঁদের বন্দী করা হয়েছিল সিকিমের দেওয়ানের নির্দেশে। ডিসেম্বর মাসেই মুক্তি দেওয়া হয় দুজনকে। তাঁদের বন্দী ও অত্যাচার করা এই অজুহাত ব্রিটিশ সরকার সেনাদল পাঠান ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। সেনাদল প্রায় বিনা বাধায় দার্জিলিঙ্ ও তরাই অঞ্চল দখল করে নেয়। এই অভিযানের ফলে ব্রিটিশ সরকার সিকিম মহারাজের প্রাপ্য বাৎসরিক ৬০০০ টাকা খাজনা দেয় বন্ধ করে। তরাই অঞ্চল, উত্তরে রম্যম নদীর সীমারেখা, পূর্বে গ্রেট রঙ্গীত পর্যন্ত বিস্তৃত সিকিমের কিয়দংশ ব্রিটিশ সরকার বাঙলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়।

সমস্ত বিপর্যয়ের দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে সিকিমের দেওয়ানের ওপরে। চোফো নামগিয়াল দেওয়ানকে বরখাস্ত করেন। অবশ্য পরে দেওয়ান তার স্ত্রীর সহায়তায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল দেওয়ান পদে। তার স্ত্রী ছিল চোফো নামগিয়ালের ঔরসে অন্য রমণীর গর্ভজাত সন্তান।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিকিমের সঙ্গে আবার বিরোধ শুরু হয় ব্রিটিশ সরকারের। লেঃ কর্নেল গোওলার ও স্পেশাল কমিশনার

অ্যাসলে ইডেন সিকিমে প্রবেশ করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে মার্চ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিপত্রে ছিল মোট তেইশটি অনুচ্ছেদ। চোফো নামগিয়াল চুম্বিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ভয়ে, তাই এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁর পুত্র সিড্‌কোওঙ্‌ নামগিয়াল। এই সন্ধির অনুচ্ছেদে চূড়ান্তভাবে বাঙলাদেশের মধ্যে দার্জিলিঙের অন্তর্ভুক্তি স্বীকৃত হয়। চোফো নামগিয়াল ১৮৬৩ সনে চুম্বিতেই দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটাত্তর বৎসর। চোফো নামগিয়ালের পাচজন মহিষী ছিলেন। এছাড়াও দ্বিতীয়া পত্নীর সহচরী রাজঅন্তঃপুরে উপপত্নীরূপে বাস করতেন।

প্রথমা পত্নীর গর্ভে দুই কন্যা ও পুত্রের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু মধ্যমা কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্রের প্রাণবিয়োগ ঘটে অকালে। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া মহিষী ছিলেন প্রখ্যাত টাশী লামার ভগ্নী। দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল দুই পুত্র ও এক কন্যার। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সিড্‌কোওঙ্‌ নামগিয়াল। অপর দুজন অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তৃতীয়া চতুর্থা মহিষী অকালে প্রাণত্যাগ করেন নিঃসন্তান অবস্থায়। পঞ্চমা মহিষী মেঞ্চি টনক নামে কোনো স্থানের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে জন্ম হয়েছিল থুটুব নামগিয়ালের। সিডকোওঙ্‌ নামগিয়াল ছিলেন ধর্মপরায়ণ। রাজ্য শাসন, রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি তাঁর তেমন ছিল না। তিনি ছিলেন সরল, ও সৎ। পরে তিনি খামের কারমাপা লামারূপে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পিতার অবর্তমানে বাধ্য হয়ে ১৮৬১ সন থেকেই রাজকার্য পরিচালনা করতে হয় তাঁকে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বাৎসরিক ৬০০০ টাকা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছিলেন। সিডকোওঙ্‌-এর অনুরোধে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাৎসরিক ৬০০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া শুরু করে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় বাৎসরিক ৯০০০ টাকায়;

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বাৎসরিক ১২,০০০ টাকা। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সিডকোওঙ্ নামগিয়াল, ভাই থুটুব নামগিয়াল ও ভগ্নী শেরিঙ্ পুট ও চাঙজেড কারপো দার্জিলিঙে এসে বাঙলার তৎকালীন লেঃ গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন! ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দেহত্যাগ করেছিলেন তিনি। সিডকোওঙ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি রাজ্য শাসন করেছিলেন মাত্র নয় বৎসরকাল। রাজ্য শাসনের প্রতি তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। তাই শাসন-ব্যবস্থা পুরোপুরি ছিল মন্ত্রীদের হাতেই।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে থুটুব নামগিয়াল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধার্মিক ভাই সিডকোওঙ্ নামগিয়ালের মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে চোগিয়াল পদে অভিষিক্ত হন। থুটুব নামগিয়ালের দুই পত্নীই, তিব্বতের উচ্চ বংশোদ্ভবা। প্রথমা পত্নীর গর্ভে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোডা নামগিয়াল, পরবৎসর জন্মগ্রহণ করেছিলেন সিডকোওঙ টুল্‌কু। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। থুটুব ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত টাশী নামগিয়ালের জন্ম হয়। চার বৎসর পর এক কন্যা চুনীওয়াঙ্‌মো জন্মগ্রহণ করেন।

থুটুবের সিংহাসন নিষ্কণ্টক ছিল না। সিংহাসন আরোহণের পরই তাঁকে তাঁর আত্মীয়-পরিজনের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর আত্মীয়-পরিজন অনেকেই বসবাস করতেন কলকাতা ও দার্জিলিঙে। তাঁরা সেখান থেকেই সিকিম রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটানোর চেষ্টা করেন। চোফো নামগিয়াল সিকিমে নেপালীদের নতুন করে বসবাস নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু থুটুবের রাজত্বকালে শীপালামা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চুকুঙে নেপালীদের বসবাসের বন্দোবস্ত করেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন কাঙসা দেওয়ান ও পাদঙ্ লামার ভাই লাসো অথিঙ্। স্থানীয় অধিবাসীরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার

হয়ে ওঠে, বিশেষ করে দালাম অখিঙ, ডেনসাপা ও পেমিওঙ্চির ত্রাচিঙ্ লামা, এই নেপালীদের বার তিনেক উৎখাত করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার, কিন্তু নেপালীদের বসবাস অনুমোদনের জন্য সিকিম দরবারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করেন। পরে কালিম্পঙে সিকিমের মহারাজা থুটুবের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিভূ অ্যাসলে ইডেনের বৈঠক হয়। সেখানেই স্থির হয়, সিকিমে নতুন করে নেপালীদের বসবাস অবৈধ। তবে এ বিষয়েও আলোচনা হয়েছিল যে, যদি নেপালীরা সিকিমের কোনো পরিত্যক্ত ভূমিতে বসবাস শুরু করে, তাদের কোনো রাজকার্যে নিয়োগ করা চলবে না; গ্রামের দলপতি হতেও পারবে না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাঙসা দেওয়ান ও তার ভ্রাতৃবর্গ রাজার অনুমতি সংগ্রহ করে সিকিমের রেনকে বসবাসের অযোগ্য স্থান নেপালীদের মধ্যে বিলিব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন ত্রাচেন লামা। তিনি সদলবলে রেনকে এসে নতুন বসবাসকারী নেপালীদের উৎখাত শুরু করেন। ফাডঙ্লামা টুমলঙ রাজপ্রাসাদ থেকে সশস্ত্র দল নিয়ে অগ্রসর হন রেনকের দিকে। পেমিওঙ্চি লামাদের বশে আনবার জন্য তাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করেন, অবশেষে ব্যর্থ হয়ে সশস্ত্র আক্রমণ করেন। বিরোধের ফলে বেশ কিছু সংখ্যক হতাহত হয়। ফাডঙ্ লামারা জয়ী হয়ে পেমিওঙ্চির বৌদ্ধ বিহারের অনুরূপ বিহার নির্মাণ করেন ইয়াঙ্গঙএ। ব্রিটিশ শক্তির সহযোগিতায় কাঙ্সা দেওয়ান ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নতুন করে নেপালী প্রজাকে পত্তনি দিতে থাকেন।

এই অসদাচারণ, বিদ্বেষপূর্ণ আবহাওয়া ভগ্নমনোরথ থুটুব চুম্বিতে বসবাস শুরু করেন। এদিকে ব্রিটিশ শক্তি নতুন করে শুরু করে জাল বিস্তার। তারা কাঙ্সা দেওয়ান ও শিও দেওয়ানের ওপরে রাজ্য শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণের জন্য রাজার ওপরে চাপ দিতে থাকে।

থুটুবের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার তিব্বতীয়দের

ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনা করত। ১৮৮৪-১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রতিভূ কোলম্যান মেকলে তিব্বত যাওয়ার পথে সিকিমে প্রবেশ করেন। তিব্বত সীমান্তে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন তিব্বত সরকারের অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

তিব্বতীয়েরা লাঙথু দখল করে সেখানে তাদের সৈন্য মোতায়েন করে। এই বিরোধের মধ্যস্থতা করেন থুটুব। কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে সিকিমের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরতে শুরু করে। তিব্বত সরকার সিকিমরাজকে যে বাৎসরিক উপঢৌকন পাঠাত, সে উপঢৌকন পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে ব্রিটিশ সরকার ও সিকিম সরকারকে মঞ্জুরীকৃত বাৎসরিক অনুদান দেয় বন্ধ করে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিকিমে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করা হয়। তিব্বতীয়েরা সৈন্য সমাবেশ করে চুম্বিতে। চুম্বি তখনও সিকিমের অংশ ছিল। ন্যাটঙ, রিঙচেঙগঙ ও চুম্বিতে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার চীন সরকারের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়। চীন সরকার সিকিমের ওপরে ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়, অপরপক্ষে ব্রিটিশ সরকার সিকিম তিব্বতের পুনর্বিন্যাস মেনে নেয়। সিকিম তিব্বতের নতুন সীমানা নির্ধারণের সময় সমগ্র চুম্বি উপত্যকা তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত হয়। নাথুলা-জেলাপ-লা, ইয়াক্-লা, সিকিম তিব্বত সীমারেখার মধ্যে পড়ে। এই সীমা নির্ধারণে সিকিম সরকারের সঙ্গে কোনো আলোচনাই করা হয় না।

১৮৮· খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রতিভূ ক্লড হোয়াইট সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন সিকিমে। উদ্দেশ্য ছিল থুটুব নামগিয়ালকে চাপের কাছে নতি স্বীকার করানো। কিন্তু থুটুব ছিলেন স্বাধীনচেতা, তিনি গ্যাঙটকের প্রাসাদ পরিত্যাগ করে চুম্বির পথে লোগিয়ালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্লড হোয়াইট রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে সব কিছু তছনছ করেন। রাজভক্ত কর্মচারিদের করেন বিতাড়িত। নিজের অনুকূলে কাঙসাপা ভাইদের নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য

কাউন্সিল গঠন করেন। থুটুবকে চুম্বি থেকে গ্যাঙটকে আনানো হয়। তাকে বলা হয় পেমিওঙ্ চিলামা ও অন্যান্য অনুগামীদের সংস্রব ত্যাগ করে কাঙসাপাদের মতানুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে। থুটুবের সমস্ত রাজকোষ দখল করা হয়েছিল আগেই। সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। পরে থুটুব ও মহারাণীকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয় কালিম্পঙ্। সেখানে কয়েক মাস রাখার পর আবার মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই সময় চুম্বিতে স্থিত সিড্কোওঙ্ টুল্‌কুর অসুস্থতার সংবাদে মহারাণী তিব্বতে যান। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ ক্লড হোয়াইট থুটুবকে বন্দী করে গ্যাঙটকে নির্জন কক্ষে রেখেছিলেন। রাজাকে তেরোদিন সময়মতো আহার ও পানীয় পর্যন্ত দেওয়া হত না। পরে মহারাণী সিডকোওঙ্ টুল্‌কুকে নিয়ে গ্যাঙটকে প্রত্যাবর্তন করেন। ক্লড হোয়াইট জমি দান করে জমিদার সৃষ্টি করার জন্য নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসেন থুটুবের অনুমোদনের জন্য। থুটুব এই প্রস্তাবে অনুমোদন জানাতে অস্বীকার করেন। ১৮৯১ সনে থুটুব ক্লড হোয়াইটের যথেচ্ছাচারিতার বিবরণ দিয়ে কলকাতাস্থিত ব্রিটিশ গভর্নরের কাছে পত্র দেন। ক্লড হোয়াইট ইতিমধ্যে থুটুব নামগিয়ালকে বন্দী করে নিয়ে আসেন কার্শিয়ংএ। সেখানে অবশ্য মহারাণী ও সিডকোওঙ্ টুল্‌কু ও সামান্য কয়েকজন অনুচরকে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে টাশী নামগিয়ালের জন্ম হয়।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কমিশনার নোলান্ ক্লড হোয়াইটের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, সিকিম ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে তিক্ততার অবসান হয়।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে থুটুব নামগিয়ালকে সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হয় গ্যাঙটকে। সেখানে রাজোচিত মর্যাদার সঙ্গে উপযুক্ত উপহারাদি দিয়ে অভ্যর্থনা জানান ক্লড হোয়াইট। সমস্ত সিকিম, রাজা ও রাণীর প্রত্যাবর্তনে উৎসবের আয়োজন করে। ১৮৯৭ সনে রাজা ও

রাণীর দীর্ঘজীবন কামনা করে সমস্ত সিকিমের অধিবাসীরা বিশেষ প্রার্থনার অনুষ্ঠান করে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কমিশনার নোলান সিকিম পরিদর্শন কালে তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করেন মহারাণীর সঙ্গে। মহারাণী যখন এই বিষয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ফ্রান্সিস ইয়াঙ্‌ হাসব্যাণ্ড ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে লাসা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে এলে পাঞ্চেনলামা ও ভুটানের দেবরাজা নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে আসেন। তাঁরা ব্রিটিশ ভাইসরয় ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সঙ্গে সিকিমের শাসন ক্ষমতা থুটুব নামগিয়ালের হাতে অর্পণ করবার জন্য অনুরোধ জানান। সিকিমে শান্তি ফিরে আসে।

গ্যাঙটক সিকিমের রাজাধানী হিসাবে নতুন করে গড়ে ওঠে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে স্থাপিত হয় ইংরেজী স্কুল। প্রখ্যাত টাশী নামগিয়াল সেই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র। সিডকোঙ্‌ টুল্‌কু অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে চোগিয়াল ও মহারাণী নেপালের কাঠমাণ্ডুতে যান তীর্থযাত্রার জন্য। তাঁরা স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করান। নেপালের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র সমশেরএর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর পর সিকিমের মহারাণী ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে থেকে তিনি কলকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চারবৎসর পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে থুটুব নামগিয়ালও পরলোকে গমন করেন।

থুটুব নামগিয়ালের মৃত্যুর পর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সিডকোঙ্‌ টুল্‌কু চোগিয়ালরূপে অভিষিক্ত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর। শৈশব থেকেই তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তখনই তার মধ্যে অষ্টম চোগিয়াল সিডকোঙ নামগিয়ালের অনেক গুণাগুণ দেখতে পাওয়া যায়।

এজন্য তাঁকে কারমাপা লামা বলে মনে করা হত। বাল্যবয়স থেকেই তিনি ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। সিকিমে প্রত্যাবর্তন করে বনবিভাগ, বৌদ্ধ বিহার ও বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পিতার শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্য তাঁকে রাজকার্যে সহায়তা করতেন। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে কারাবাসের শাস্তি আইন করে রদ করে দেওয়ার মূলে তাঁর অবদান প্রচুর। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ সিকিমের লামাদের ঐক্যবদ্ধ হবার অনুকূলে চেষ্টা করেন। তাঁর ভগ্নী চুনী ওয়াঙমো বৌদ্ধমঠে বাস করেন। তার সহায়তায় পুরানো বৌদ্ধমন্দির ও মঠের সংস্কার সাধিত হয়। তিনি জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে জমিদারদের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন। বহু জমিদার তাঁর বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে সামান্য অসুস্থ বোধ করায়, বাঙলাদেশ থেকে ইংরেজ ডাক্তার নিয়ে আসা হয়। ডাক্তার তাঁকে প্রচুর পরিমাণে ব্র্যাণ্ডি দেন। গরম কম্বল দিয়ে দেহ আবৃত করে বিছানা গরম করবার জন্য আগুন জ্বালাবার নির্দেশ দেন। এই ব্যবস্থার এক ঘণ্টার মধ্যেই সিডকোওঙ্ টুল্কু মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর এই মৃত্যু সিকিমের সকলেই সন্দেহজনক বলে মনে করতেন।

সমগ্র সিকিমের আমূল সংস্কার সাধন করে আধুনিক সভ্যতার আলোয় আলোকিত করেছিলেন টাশী নামগিয়াল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর তার জন্ম হয়েছিল কার্শিয়ঙে। পিতা থুটুব নামগিয়াল তখন সেখানে অন্তরীণ। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই ডিসেম্বর তিনি চোগিয়াল পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন একুশ বৎসর বয়সে।

গ্যাঙটকের ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে দার্জিলিঙের সেণ্ট পলে শিক্ষা লাভ করেন। সেখান থেকে তিনি আজমীর মেয়ো

কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই অক্টোবর লাসার রাকাশাব্ বংশের কুনজাঙ ছেচেনএর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর প্রথম পুত্র পালজোর নামগিয়াল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর। দ্বিতীয় পুত্র পালদেন থণ্ডুপ নামগিয়াল জন্ম গ্রহণ করেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে মাসে। এ ছাড়া তার প্রথমা কন্যা পেমা সেদেউনএর জন্ম হয়েছিল ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪। অন্যান্য কন্যা, পেমা চোকী (জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৫), সোনাম পাদাউন (জন্ম ২৭শে মে, ১৯২৭)। পুত্র জিগদল শেওয়াঙ নামগিয়াল জন্মগ্রহণ করেন ২৩শে আগস্ট, ১৯২৮। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্নী চুনী ওয়াঙমোর সঙ্গে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী রাজা উর্গায়েন দোরজির বিবাহ হয়েছিল। সিংহাসনে আরোহণ করেই টাশী নামগিয়াল সিকিমের আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিচারালয় স্থাপন করে বিচারক নিয়োগ করেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেন হাইকোর্ট। শাসন পরিষদের আওতা থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করেন। ভারতে প্রবর্তিত সিভিল ও ক্রিমিন্যাল কোডের প্রচলন করা ও ভারতীয় পেনাল কোডের প্রবর্তন তাঁর অন্যতম কীর্তি।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিকিম দরবারের শাসন সম্পর্কীয় সমস্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন তিনি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জুয়া খেলা বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। বিনা মজুরীতে ভয় প্রদর্শন করে বা জুলুম করে শ্রমিকদের কায়িক পরিশ্রম করানো আইন করে রহিত করেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। জমিদারদের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা বা বিচার করার ক্ষমতা ইত্যাদি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আইন করে বন্ধ করে দেন। পূর্বে সরকারী কার্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিকদের যখন তখন খাটানো হত। এর নাম ছিল ঝারলাঙী। ইয়ঙ হাসব্যাণ্ডের লাসা অভিযানে এই ঝারলাঙীর বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে

এই ধরনের শ্রমিকদের ব্যবহার সীমিত করে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারদের ঝারলাঙী ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূমি সংস্কারসাধনের কাজ হাতে নেন চোগিয়াল। দেশে সুপরিকল্পিতভাবে ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভে করানো হয়। জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করে ধীরে ধীরে প্রজাদের কাছ থেকে সিকিম সরকার শুল্ক আদায় শুরু করেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেশ থেকে ৬০০০ সিকিমী তরুণ যুদ্ধে যোগদান করে। মহারাজার পুত্র যুবরাজ পালজোর নামগিয়াল এয়ার ফোর্সের অফিসার রূপে যোগ দেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুদ্ধরত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

১৯৪৪ সনে যানবাহন পরিচালন ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৫২ সনে ভারতের অর্থসাহায্যে সিকিমের নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

যুদ্ধের পর সিকিমের প্রদেশ কংগ্রেস নামে রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করে। এই দলের মুখ্য দাবি হয় (১) জমিদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন (২) পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠন (৩) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য ভুটিয়া, লেপচা ও নেপালী, সরকারের সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত হন। পরে অবশ্য মতবিরোধের জন্য পদত্যাগ করেন তাঁরা। সিকিম ন্যাশনাল পার্টি নামে অপর একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয় ইতিমধ্যেই। নানা মতবিরোধ ও রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দেয় সিকিমে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত রাজনৈতিক দল মীমাংসায় পৌছায়। তদনুযায়ী কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে ছয়টি আসন ভুটিয়া ও লেপচাদের জন্য সংরক্ষিত, ছয়টি নেপালীদের জন্য, পাঁচটি আসন সংরক্ষিত হয় রাজার মনোনীত সদস্যদের জন্য। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পর বৎসর ২৩শে মার্চ একটি সরকারী ইস্তাহারে রাজনৈতিক

দলগুলির আপোসরফা অনুযায়ী রাজ্যশাসনব্যবস্থা ও সংবিধান সম্পর্কে উল্লিখিত হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সংবিধানের সংস্কার-সাধন করা হয়।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সিকিম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তির ফলে ভারতের সঙ্গে সিকিমের বন্ধুত্ব আরও গাঢ়তর হয়। সিকিমের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ভারত সর্বপ্রকার সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে টাশী নামগিয়ালের শাসনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ১৯৫৬ সনের ২৪শে মে মাসে ২৫০০ শততম বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। দু বৎসর পরে ১লা অক্টোবর মহাযান সাধনতত্ত্ব ও তিব্বতীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ, জ্ঞানলাভের জন্য গ্যাঙটকে নামগিয়াল ইনষ্টিট্যুট অফ্ টিবেটলজি স্থাপিত হয়।

সিকিমের রাজপরিবারের প্রায় সমস্ত মহিষীই এসেছিলেন তিব্বত থেকে। তাঁরা কেউবা ছিলেন পাঞ্চেনলামার আত্মীয়, কেউবা তিব্বতের বিভিন্ন মঠের প্রখ্যাত লামাদের সঙ্গে আত্মীয়তাসুত্রে গ্রথিত। কিন্তু রাজকুমার পালদেন থণ্ডুপও তিব্বতের কোনো এক বংশের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে তিনি নিউইয়র্ক লরেন্স কলেজের ছাত্রী মার্কিন তরুণী হোপকুকের পাণি-গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সনে এভারেস্ট হোটেলে পরিচয়, ১৯৬৩ সনে বিপুল সমারোহেই বিবাহ উৎসব পালিত হয় গ্যাঙটকে। বিবাহ বৌদ্ধ ধর্মমতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এমন কি বিবাহের পরে তাঁরা সিকিমের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির পেমিওঙ্ চিতে গিয়েছিলেন প্রার্থনা করতে। টাশী নামগিয়ালের দেহান্তরের পর তিনিই বর্তমান চোগিয়াল।

সতেরো

সিকিমের প্রাচীন রাজধানী ছিল ইয়ক্সাম। পাহাড়ী ছোট্ট গ্রাম, যেদিকে তাকানো যায় শুধু গাঢ় সবুজের মহা সমারোহ। রাজধানী হওয়ার মতো বৈশিষ্ট্য নেই এমন কিছু। তবু সুদূর অতীতে আলোর বর্তিকা নিয়ে এসেছিলে তিনজন জ্ঞানী লামা। রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, স্থাপিত হয়েছিল ধর্ম। পথের মানুষকে নিয়ে এসে বসানো হয়েছিল পাথরের সিংহাসনে। প্রথম চোগিয়ালের প্রথম রাজধানী। তারপর সেই রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল পেমিওঙ্চিতে। সীমান্ত-রাজ্য নেপালের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল টমলুঙএ। বর্তমানে সিকিমের রাজধানী গ্যাঙটক। আধুনিক সাজ-সজ্জায় সজ্জিত, আধুনিক সভ্যতার প্রাচুর্যে তার নতুন কলেবর। কিন্তু ইয়ক্সাম সেই প্রাচীন গ্রাম, অনাদৃত, হয়তো বা অবহেলিতও। ইতিহাস আর রূপকথার রাজপুত্রের স্মৃতি-বিজড়িত প্রাচীন ইয়ক্সাম তবু আমার কাছে মহিমান্বিত।

এই ইয়ক্সামের মায়া কাটিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হয় লাহ্বছেন ছেম্বুর পদচিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে। ধূলি-ধূসরিত পথ নয়, কঠিন পাথরের বুকে মুছে যাওয়া সেই পদচিহ্ন স্থূল দৃষ্টির সামনে হারিয়ে গেলেও তো মনে হয় ভাস্বর হয়ে চলে গেছে মহামহিমান্বিত কাঞ্চন-জঙ্ঘার দরবারের উদ্দেশ্যে। আমি তাই এগিয়ে চলি।

আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল ঘন মেঘে। তাঁবুর ভেতর ঠাণ্ডা জলের ছিটে আর হিমশীতল হাওয়ার ঝাপটার ছোঁয়া লাগতেই রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বর্ষণ আর ঝোড়ো হাওয়ার শব্দের মধ্যেই শুনেছিলাম পাশাঙের কণ্ঠ, গুড মর্নিং স্যার। বুঝি, বেড্টী নিয়ে পাশাঙ এসেছে ঘুম ভাঙাতে। ভাবতে ভাবতে

অন্তঃসত্বা পাশাঙ গৃহিণীর কথা মনে পড়ে। এই ঝড় বাদলায় মাল বয়ে নিয়ে যেতে হবে তাকে আরও দুর্গম পথের দিকে।

আলো জ্বেলে চমকে উঠেছিলাম, তাঁবু চুইয়ে বৃষ্টির জল পড়ে ভিজে গিয়েছিল স্লিপিং ব্যাগ ; ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে। আমার সাড়া পেয়ে বিমল ডাক্তারও উঠে পড়েছিল। তারপর জলে ভিজে তাঁবু গোটানো। দুর্যোগের মধ্যেই তৈরী হতে হয়েছিল সবাইকেই। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, ইয়ক্সামে আর বসে থাকা নয়। নতুন করে ভাবি, পথের শেষ নেই।

ভাবি, মন্দ কি? বর্ষণমুখর পথঘাট আর বনানীর বিচিত্র রূপ না হয় ভাল করে উপভোগ করা যাবে। উত্তর-পশ্চিম সিকিমের উচ্চ হিমালয়ে যাবার পথে ইয়ক্সাম শেষ জনপদ। এখান থেকেই শুরু রোথাঙ ও আলুকথাঙ উপত্যকার পথ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে নেপাল যাবার পথ রোথাঙ উপত্যকা দিয়ে। বাকিম ও জোংরী দিয়ে এই পথ চলে গিয়েছে। এই পথই সিকিমের পথ। নতুন ঘরের নতুন মানুষদের জন্য এই পথ বেয়ে এসেছিল আধ্যাত্মিকতার ভাবস্রোত সুদূর তিব্বত থেকে।

১৮৭৯ সনে এই পথ দিয়ে নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে গিয়েছিলেন দুঃসাহসী বাঙালী অভিযাত্রী শরৎচন্দ্র দাস। তাঁর সঙ্গে ছিল উগায়েন গিয়াৎসো।

ইয়ক্সাম থেকে বাকিমের দূরত্ব প্রায় নয় মাইল। বাকিমের উচ্চতা ৮২০০ ফুট। পথ মোটেই সহজ নয়, বৃষ্টি না হলে ভালই লাগবে গভীর বনের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড চড়াই ভাঙতে। বনে পাইন, দেওদার, ওক্, ওয়ালনাট আর জলপাই গাছ। মস্ত বড় বড় পাকা জলপাই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পড়ে থাকে গাছ তলায়। বড় বড় গাছের ঘন অরণ্যে অজস্র অর্কিড। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত বিচিত্র অর্কিড আছে কিনা জানি না। ইয়ক্সাম থেকে পথ চলেছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। রাস্তায় বিছুটি গাছ পাথরের গায়ে

অসংখ্য জেঁাক, আরও এগিয়ে গেলেই নজরে পড়বে পথের আসল রূপ। গভীর বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে পথ। শুধু পথের আভাস চড়াইয়ের পর চড়াই পেরিয়ে উঠে গিয়েছে গিরিশিরার শীর্ষে, তারপর দ্রুত অবতরণ প্রাগচ্যুর তটভূমির কাছাকাছি পর্যন্ত। ইয়ক্সাম থেকে এই দূরত্ব প্রায় সাত মাইল।

ভোরের অন্ধকারে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে। সমস্ত রাস্তা জুড়ে বৃষ্টির জল ঝরনা ধারার মতো বয়ে চলেছিল। তার ভেতর দিয়ে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে জলের তোড়ে পাহাড়ের গা ধসে পড়েছিল, ছোট ছোট ঝরনাগুলো রূপান্তরিত হয়েছিল জলপ্রপাতে। ওপর থেকে প্রচণ্ড বেগে জলধারা পড়ছে, তার নিচ দিয়ে অতি সন্তর্পণে পেরিয়ে যেতে হয়েছে। পাশেই খাদ, প্রায় তিন-চারশ ফুট গভীর। আমরা পেরিয়ে এলেই হবে না, নির্বিঘ্নে পার করে নিয়ে আসতে হয়েছিল পোর্টার ও শেরপানীদের। টাশীডিঙে পেঁৗছবার আগে যাদের দেখেছি প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি আর ধসের সামনেও উচ্ছল, হাস্যময়ী, বাকিমের রাস্তায় দেখি তাদের মুখ থমথমে। প্রাগচ্যুর সেতুর ধারে এসে পেঁৗছতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লেগেছিল। সেতু পেরিয়ে আবার চড়াই, বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে, সমস্ত চড়াই পথটায় ওয়ালনাট গাছের ভিড়। চড়াইয়ের শেষ প্রান্তে দেখি কতগুলো পাথর জড়ো করা, সেখানে অনেকগুলো প্রার্থনা পতাকা। পবিত্রতার জন্য নয়, হয়তো বা বিপজ্জনক পথ নির্বিঘ্নে পেরুবার জন্য প্রার্থনা। জল ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে বাকিমে যখন পেঁৗছে যাই তখন বেলা দেড়টা। আরও আগে হয়তো বা পেঁৗছানো যেত। কিন্তু প্রাগচ্যুর ধারে বসে বসে বিশ্রামের ফাঁকে দেখেছি প্রাগচ্যুর নীলাভ জলধারা। প্রাগ্‌চ্যু আর একটু এগিয়ে গিয়ে ইয়ক্সামের কাছে মিলিত হয়েছে রোথাঙ্‌চ্যুর সঙ্গে। প্রাগ্‌চ্যু উৎপন্ন হয়েছে আলুকথাঙ্‌ হিমবাহ থেকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে চারপাশ থেকে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। রাত থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। থেমেছে মাত্র ঘণ্টা তিনেক আগে। থোকা থোকা মেঘ গিরিশিরা বেয়ে নিচে নেমে গিয়েছে। তার ওপরে সূর্যাস্তের লোহিত আভা সন্ধ্যার প্রাক্কালেও বর্তমান। চারপাশে পাইন, ওক আর ওয়ালনাটের গভীর বনে ঘেরা এই জায়গাটার নাম বাকিম। সিকিমীদের ভাষায় বাকিম শব্দের অর্থ বাঁশের ঘর। বাকিমের আশেপাশে অজস্র নলখাগড়ার মতো সরু বাঁশের ঝোপ। মাঝে মাঝে বিশাল পাইন আর ওয়ালনাট গাছ। সিকিমীরা দলে দলে ভেড়া নিয়ে আসে এই পথে। গ্রীষ্মের শুরুতে উচ্চ উপত্যকার বরফ যখন গলে কচি সবুজ ঘাস গজায় তখন তারা ভেড়াগুলোকে ছেড়ে দেয়। এ ছাড়াও শীতের প্রকোপে উচ্চ উপত্যকা থেকে ইয়াক্ বা চমরী গরুগুলো বাকিমের জঙ্গলের আশেপাশে বাস করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এরা দলবদ্ধভাবে চরে বেড়ায়। পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে দুর্গম গিরিপথের বরফ ভেঙে নেপাল বা তিব্বতের উপত্যকায় ঢুকে পড়ে। এমনি করে কয়েক মাস ঘুরে শীতের শুরুতে ফিরে আসে। ইয়াকের দুধ, এমন কি মাংসও সিকিমীরা খায়। গায়ের লম্বা লম্বা লোম দিয়ে কম্বল, সোয়েটার বুনিয়ে ফেলে। শুনি, সিকিমের চোগিয়ালের অনেকগুলো ইয়াক্ রয়েছে এদিকে। বাকিমের আশেপাশে অনেকগুলো বাঁশের গাঁথনি করা কুঁড়েঘর আছে। সেগুলোতে ইয়াক্ ও ভেড়া নিয়ে আসবার সময় অথবা ফেরবার সময় আশ্রয় নেয় সিকিমীরা। ছোট ছোট বাঁশের কুঁড়েঘরগুলোর জন্যই হয়তো বা বাকিমের নামকরণ।

বাকিমের উচ্চতার তুলনায় শীতের প্রকোপ অনেক বেশী। তার মূল কারণ বাকিমের তিন দিক্‌টাই গভীর বনানীতে ঘেরা। সূর্যের আলো অলিগলি আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে ঢুকতে পারে না। গাছ-পালার তলা দিয়ে ছোটখাটো জলধারা বয়ে যাওয়া মাটি কর্দমাক্ত। মাটির ওপরে আবহমান কাল থেকে গাছের পাতা পড়ে পচে এক

দুর্গন্ধময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বাকিমের আশেপাশে ঢালু পাহাড়ের গায়ের এই চেহারা সর্বত্র। এই স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে বিশাল আকৃতির জোঁক মাঝে রক্তের গন্ধ পেয়ে গাছের ডাল থেকে টুস করে পড়ে পথচারীর মাথায়, না হয় গলায় বা কাঁধের ওপরে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও এগুলো যেন অমর। এই অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিবেশের মধ্যেও, পূর্বদিকের খোলা অংশ দিয়ে নীল আকাশের খানিকটা দেখা যায়। সোপান শ্রেণীর মতো ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া সবুজ বনানীতে ছাওয়া গিরিশিরাগুলো নজরে পড়ে। নিচে বেশ দূরে ইয়ক্‌সামের উপত্যকা। ঐ সুদৃশ্য উপত্যকার অনেকাংশ জুড়ে সোনালী ধানের ক্ষেত, ছোট ছোট ঘর স্লেট পাথর দিয়ে ছাওয়া। এত দূর আর উঁচু থেকে মনে হয়, কোনো নিপুণ শিল্পীর তুলি দিয়ে সযত্নে ক্যানভাসের ওপরে আঁকা ছবি। সে ছবি ধরে রাখা যায় না। সে শুধু স্মৃতির পাতায় আঁকা থাকে। দিনের পর দিন কেটে যাবে। এই অপূর্ব ছবি হয়তো ঝাপসা হয়ে যাবে স্মৃতিপট থেকে। কিন্তু প্রথম দর্শনের ভাল লাগার স্মৃতি থাকবে ভাস্বর হয়ে।

ক্যাপ্টেন মদন সিং ইয়ক্‌সাম থেকে আমাদের সঙ্গেই রওনা হয়েছিল। পথের মাঝে আগে আগে গিয়েছিল দল-ছাড়া হয়ে। বাকিমে পৌঁছেই ভেবেছিলাম তাকে দেখব আগেভাগে বসে আছে মগভর্তি গরম চা হাতে নিয়ে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি মদন সিং পৌঁছয় নি। ইয়ক্‌সাম থেকে বাকিমের পথ একটিই। প্রচণ্ড বর্ষণের মধ্যে খুবই বিপজ্জনক জায়গায় আমরা দাঁড়িয়েছি, গাছের গুঁড়ি এনে বিপজ্জনক জলধারার ওপরে সেতু বানিয়ে কুলি ও শেরপানীদের নিরাপদে পার করে দিয়ে আমরা এগিয়েছি। মদন সিংএর সাক্ষাৎ পাই নি কোথাও। সবাই আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি। তবু, বাকিমের পাহাড়ের গায়ে গায়ে তাঁবু খাটানো কিচেনে একবার উঁকি দিই। পাশাঙ্‌ বৃষ্টিতে ভেজা কাকের মতো কুঁকড়ে গেছে শীতে। পাশাঙ্‌ গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে আমি

অবাক হই। মানুষের কি অসীম আত্মবিশ্বাস নিজের দৈহিক সামর্থ্যের ওপরে। বিমল বলে, এই প্রেগন্যান্সি অবস্থায় ডাক্তার সিঁড়িতে উঠানামা সম্পর্কেই সাবধানতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেন।

কিন্তু পাহাড়ের অসমতল ভূমিতে যাদের জন্ম, বসবাস ও মৃত্যু, তাদের কাছে আধুনিক চিকিৎসকদের নির্দেশনামা নিরর্থক।

বাকিমের স্বল্পপরিসর স্থানে বাঁশের চাটাইএর ছাউনি দেওয়া ঘর বানিয়ে রেখেছে, দার্জিলিঙের মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিট্যুট। সেখানে আশ্রয় নিয়েছে কুলি ও শেরপানীদের দল। এক কোণে আগুন জ্বেলেছে। সেই আগুনের ধারে বসে ভেজা মোজা, পুল-ওভার শুকিয়ে নিতে নিতে মদন সিংএর জন্য অপেক্ষা করি। চারটে বাজতেই টর্চ নিয়ে রেস্‌কিউ পার্টি বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টির জলে ভেজা ক্লান্ত বিপর্যস্ত দেহ নিয়ে ফিরে আসে মদন সিং। পথ ভুল করে সে সোজা নেমে গিয়েছিল প্রাগ চ্যুর তটভূমি পর্যন্ত। প্রচণ্ড জোঁকের কামড় খেয়ে বিপর্যস্ত মদন সিং আবার ফিরে গিয়েছিল ইয়ক্‌সাম। ইয়ক্‌সাম থেকে একজন পোর্টার নিয়ে রওনা হয়। মাইল খানেক দূর থেকে আমাদের দল গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়। মদন সিংকে পেয়ে সবাই কলরব করে উঠি। সবাই মিলে তাকে সাহায্য করতে শুরু করি। হাতে তুলে দেওয়া হয় মগ ভর্তি গরম চা। আগুনের ধারে বসে তার মুখে শুনি পথ ভুল করার গল্প। মদন সিং খুব আমুদে মিলিটারী অফিসার। সিকিমের লাচেন লাচুঙ অঞ্চলেও সে ঘুরেছে। নাথু-লাতে কিছুদিন বাস করেছিল। আগুনের তাপে তার শরীর চাঙ্গা হতেই স্বভাবসুলভ হাসি হেসে আবার সে যথারীতি শেরপানীদের সঙ্গে রসিকতা জুড়ে দেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে যায় বাকিমে। সেই সঙ্গে নেমে আসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ কর্দমাক্ত পাহাড়ের গা। সিকিমের লামাতন্ত্রে বর্ণিত শীতল নরকের একটি ছোট্ট সংস্করণ যেন বাকিম।

আঠারো

থুজি চে কাঞ্চনজঙ্ঘা !

কাঞ্চনজঙ্ঘা, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ !

আমি ধন্য। দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর চিন্তার ফসল তুমি। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, অসংখ্য নমস্কার তোমাকে। জওহর পর্বতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম। তোমাকে দেখেছিলাম সূর্যাস্তের সোনালী রঙে রাঙানো গর্বোন্নত স্বর্ণশিখর নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকতে। সেই দিনই আমার এসব কথা ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু সেদিন তো আমি বুঝতে পারি নি, তোমার গর্বোন্নত শিখরদেশের এত আকর্ষণ, সেদিন জানতেও পারি নি।

মনলেপচায় পৌঁছে নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলি। কপাল থেকে বেয়ে পড়া ঘাম এসে পড়েছিল চোখে মুখে, দু চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ।

সকালবেলার অন্ধকারে রওনা হয়েছিলাম বাকিম থেকে। শুধু চড়াই, চোখের সামনে পথের বিলীয়মান রেখা যেন উঠে গিয়েছে আকাশের দিকে। ঘন বনচ্ছায়ার মধ্যে নীল আকাশ নিশ্চিহ্ন। এই বিলীয়মান পথের রেখা ধরে পথ চলেছি। যেন অনন্তকালের পথ চলা, খাড়া পাহাড়ের পিচ্ছিল কর্দমাক্ত গা বেয়ে ওঠা। পাইন, দেওদার, ওক্ আর ওয়ালনাটের ঘন বনে ছাওয়া স্যাঁতসেঁতে পাহাড়ের গা। তার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঝিরঝিরে জলধারা। এর মধ্যেই হতাশ হয়েছি, অবসন্ন দেহ নিয়ে বসে পড়েছি যেখানে সেখানে। বড় বড় কালো রঙের জোঁকের ভয়ে

আবার চলেছি। কিন্তু কেন, কিসের আশায় এত কষ্ট, এত কৃচ্ছ্র-সাধন?

বাকিম থেকে জোংরীর পথ সামান্য হলেও কষ্টসাধ্য। দূরত্ব মাত্র নয় মাইল। কিন্তু তার প্রথম মাইল সাতেক পথই চড়াই। ঘন বাঁশের জঙ্গল, সরু সরু বাঁশের ঝাড় আশেপাশে ঢালু পাহাড়ের কোল জুড়ে সর্বত্র। মাঝে মাঝে সামান্য সমতল স্থান, সেখানে মেষ পালকেরা বাঁশের চাটাই দিয়ে বানিয়ে রেখেছে গুটিকয়েক কুঁড়েঘর। ইয়কৃসাম থেকে ভেড়ার পাল নিয়ে সোজা এসে রাত্রিবাস করে বাঁশের কুঁড়েঘরগুলোতে। বাকিম শব্দের অর্থ বাঁশের ঘর, এ নামের তাৎপর্য সর্বত্র দেখি।

কুঁড়েঘরগুলোর চারপাশে বেশ খানিকটা প্রশস্ত স্থান জুড়ে দেখেছি রুমেক্স গাছের বিপুল সমারোহ। পালংশাকের গাছের মতোই লম্বা শীষ ওঠে। তার ডগায় ফুল ফোটে, ফল ধরে। ফলগুলোর গা কাঁটাযুক্ত। রুমেক্সের পাতা ভেড়াদের প্রিয় খাদ্য। ফলগুলো পেকে শুকিয়ে গেলে ভেড়ার লোমের সঙ্গে যায় আটকে। তার পর ভেড়াগুলো বয়ে নিয়ে যায় শুকনো ফল পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন উচ্চতায়।

সেখানে কোনো নিরাপদ সমতল স্থানের সন্ধান মিললে মেষ পালকেরা রাত্রিবাস করে ভেড়াগুলো নিয়ে। ঘাস-পাতা দিয়ে ছোট্ট ছাউনি, নয়তো পাহাড়ের গুহা তাদের সাংঘাতিক হিমেল হাওয়া থেকে রাখে আড়াল করে। ভেড়াগুলো সমতল ভূমিতে শুয়ে থাকে একসঙ্গে। তাদের দেহ থেকে রুমেক্সের শুকনো ফল পড়ে অসংখ্য কচি কচি চারা জন্মায়। ভেড়াদের মলমূত্র আবার রুমেক্স গাছের পক্ষে সারের কাজ করে। ভেড়া .চরাতে হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ভাণ্ডারের দ্বার হয়তো বা উন্মুক্ত হয়েছিল কোনো একদিন মেষপালকদের কাছে। তারা পথের নিশানা বানিয়েছিল, পাথর সাজিয়ে চিহ্ন রেখে। ছোট্ট ঝরনা, নিরাপদ

গুহা, বা উন্মুক্ত প্রান্তরের সন্ধান করে রাত্রিবাসের আশ্রয় আবিষ্কার করেছিল। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত এই মেষপালকদের প্রকৃতিও সাহায্য করেছিল তার অকৃপণ হাতে। রুমেক্স গাছ মেষপালকদের প্রতিটি নিরাপদ আশ্রয়ের সাক্ষী। এই গাছের পাতা যেমন ভেড়াদের খাদ্য, তেমনি মেষপালকও ব্যবহার করে সবজিরূপে। আমি এই গাছের পাতা দিয়ে বেসন সহযোগে ভাজা সুস্বাদু বড়া খেয়েছি। তবে, তেরো-চোদ্দ হাজার ফুটের ওপরে রুমেক্সের সন্ধান মেলা দুষ্কর। অন্তত আমি দেখি নি। মেষপালকদের এই নিরাপদ আশ্রয়গুলো পরবর্তীকালে সার্ভেয়ার ও অভিযাত্রীদের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মেষপালকরা অনেক ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ গাইডের কাজ করেছে।

বাকিমের বাঁশ গাছগুলো দেখে আমাদের সহযাত্রী একজন পর্বতারোহণ শিক্ষার্থী বলেছিল, এই সরু সরু বাঁশ থেকে উৎকৃষ্ট কাগজের মণ্ড তৈরি হতে পারে। সহযাত্রীটি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় স্নাতক। সিকিম হিমালয়ের বনজসম্পদের কিছুটা নিদর্শন নজরে পড়বে: সমুদ্রতল থেকে দশ হাজার ফুট উচ্চেও গভীর বন। সে বনে বিশাল-কায় পাইন, দেওদার, ওক আর ওয়ালনাট গাছ। তার পরেই পাহাড়ের গা থেকে ওক ও ওয়ালনাট গাছ বিরল হতে শুরু করে; বিশাল পাইন আর দেওদার গাছের মাঝে অনাহূত আবির্ভূত হয়েছে রোডোডেনড্রন গাছ, দৈর্ঘ্যে প্রায় কুড়ি থেকে তিরিশ ফুট। গাছ ভর্তি, গোলাপী, উজ্জ্বল গোলাপী, ফিকে লাল ও উজ্জ্বল লাল রঙের ফুলের গুচ্ছ সবুজ পাতার ভিড় ঠেলে যেন পড়েছে বেরিয়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কাদা আর পাথর, কুয়াশা আর ঝরনার জলে সিক্ত পিছিল পাহাড়ের ঢালু বুক, পা হড়কে গেলে যেখানে ধরবার মতো নেই কোনো অবলম্বন, পাথর বা গাছের ডালে হাত রাখলেই জিওল গাছের আঠার মতো চটচটে দেহ নিয়ে জোঁক এসে লাফিয়ে

পড়ে, প্রাণ ভরে রক্ত চুষবার আশায়। এমন এক অস্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশের মধ্যে ও চারপাশের উজ্জ্বল রোডোডেনড্রনের পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে বুঝি সমস্ত বনভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালী শীর্ষের পুজোয় উঠেছে মেতে।

বাকিমের বাঁশঝাড় পেরুবার ফাঁকে একটি সমতল ভূমিতে বাঁশের কুঁড়েঘরের সামনে বসে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। কাছেই একটি শুষ্ক জলাশয় লক্ষ্য করেছি। কোন এক সুদূর অতীতে সেখানে হয়তো ছিল কাকচক্ষু সরোবর। স্থানটির উচ্চতা দশহাজার ফুটের মতো। আশে-পাশে বাঁশের বাখারি দিয়ে ছাওয়া গুটিকয়েক চালাঘর। তার অদূরেই চরে বেড়াচ্ছিল বিশালকায় চমরী গাই। স্থানটি বাকিমের অন্তর্গত হলেও কি একটা নাম আছে যেন। শুনেছি, সেখানে অধুনা সিকিমের জনক লাহ্বছেন ছেম্বুকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল কতগুলো প্রেতাত্মার সঙ্গে। তিব্বত থেকে আসবার পথে তাঁকে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান লাহ্বছেন ছেম্বু প্রেতাত্মাদের পরাজিত করে নির্বিঘ্নে হাজির হয়েছিলেন ইয়ক্সামে।

তারপর বিশ্রাম নিয়েছিলাম প্রায় এগারো হাজার ফুট উচ্চে বিশালাকৃতি পাইন গাছের তলায় কালো পাথরের পাঁচিলের আড়ালে। স্থানটির নাম বোধহয় গোম্পচিন্, তার ডান পাশে খাদের মতো। বাকিমের পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে প্রাগচ্যুর তটভূমি পর্যন্ত। ঐ কালো পাথরের আড়ালে লাহ্বছেন ছেম্বু পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। রাত্রিবাস করবার ফাঁকে সারা রাত অতিবাহিত করেছিলেন গভীর ধ্যানে। বাকিম থেকে স্থানটির দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। কিন্তু এই সামান্য পাঁচ মাইলই অনন্ত-কালের পথ। এর পরেই শুধু রোডোডেনড্রনের উজ্জ্বল রঙীন ফুলে উদ্ভাসিত পথ। মনলেপচার কাছে এসে গাছ ছোট হয়েছে, শুরু হয়েছে খর্বাকৃতি রোডোডেনড্রন আর ভূর্জপত্র গাছ।

মনলেপচা থেকে সামান্য উৎরাই, তারপর প্রশস্ত উপত্যকা, সোনালী আর সবুজ রঙে মেশামেশি ঘাসের কার্পেটে মোড়া সমতল

ভূমির মধ্যে রঙীন ফুলের বাহার। সমস্ত সমতল ভূমির চারপাশে খর্বাকৃতি রোডোডেনড্রন আর ভূর্জপত্র গাছ। সব গাছগুলোর উচ্চতা সাত থেকে দশ ফুট। রোডোডেনড্রনের বেগুনী, হাল্কা বেগুনী, সাদাটে রঙের ফুলে সমস্ত উপত্যকা স্বর্গের নন্দন বনের মতো। নন্দন বন আমি দেখি নি কিন্তু জোংরীর সন্নিকটে এমন অপূর্ব উপত্যকা আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে বসি সবাই তৃণাচ্ছাদিত উপত্যকায় বেলা তখন দ্বিপ্রহর, সূর্যের কিরণে নেই তেজ। কেমন একটানা হাওয়া যেন চারপাশে শীত ছড়িয়ে রেখেছে। কিছু সময় বিশ্রাম নিতেই ঘামে ভেজা পোষাক যেন তুষারশীতল বলে মনে হয়। সেই সঙ্গে বুঝতে পারি আমরা উচ্চ হিমালয়ে এসে হাজির হয়েছি। প্রাণ ভরে বাতাস টেনে নিয়েও যেন সাধ মেটে না। চারপাশের অসীম বাতাসের সমুদ্র যদি অগস্ত্যমুনির মতো শুষে নিতে পারতাম ?

আমার আগে এসেছিল ক্যাপ্টেন মদন সিং। বাকিমে তার মুখে যে দীপ্তি দেখেছিলাম, ম্লান হয়ে গিয়েছে এই অপরূপ উপত্যকায়। কুলির দল এসে বোঝা নামিয়ে বসেছিল। কেউ কেউ তুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে হাঁসফাঁস করছিল কামারশালার হাফরের মতো। শেরপানীদের উজ্জ্বল মুখশ্রী নিষ্প্রভ। মুখের হাসি গিয়েছিল বিলীন হয়ে। কিন্তু বিস্তীর্ণ উপত্যকার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি বোধহয় সবকিছুই ভুলে গিয়েছিলাম। মাথার ওপরে গাঢ় নীল আকাশ, চারপাশে রঙীন রোডোডেনড্রনের গুচ্ছ।

উত্তর-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত অপরূপ তুষারশিখর-গুলো যেন সমস্ত উপত্যকাকে রেখেছে বেষ্টন করে। উত্তর-পূর্বে সুদৃশ্য গিরিশৃঙ্গ, সিনিউলচু, শিম্ভু, পাণ্ডিম ; উত্তর-পশ্চিমে মহামহিমান্বিত কাঞ্চনজঙ্ঘা। মাথা নত হয়ে যায় আমার। জওহর পর্বতে তুচোখ ভরে দেখা সেই সম্রাটের উদ্ধত শীর্ষ আমার দৃষ্টির সামনে, কাছে, বেশ কাছে। ভাবি, দার্জিলিঙ থেকে মুগ্ধ নয়নে

তোমাকে দিনের পর দিন দেখে দেখেও যারা ক্লান্ত হয় না, তারা যদি আসতে পারত তোমার রাজসভার তোরণদ্বারে।

বার বার ভাবি, থুজি চে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ!

উনিশ

মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণের মাঝে তীব্র হিমপ্রবাহ সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ ভেদ করে দেহ স্পর্শ করতেই ধীরে ধীরে উঠে পড়ি। পা বাড়াই জোংরীর দিকে। পথ এবার সহজ, সরল। ভূর্জপত্র গাছ আর রোডোডেনড্রনের গাছের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে। পথের দক্ষিণ-পশ্চিমে জোংরীর উপত্যকা, আর উত্তর-পূর্বে আলুকথাঙের পথ। জোংরী থেকে আলুকথাঙের দূরত্ব মাত্র তিন থেকে চার মাইল। রোডোডেনড্রনের বনের মাঝ দিয়ে প্রথম প্রায় হাজার খানেক ফুট উৎরাই, তারপর প্রাগচ্যু পেরিয়ে আবার চড়াই। পথ এমন সাংঘাতিক কিছু নয়। আলুকথাঙ উপত্যকা সৌন্দর্য অতুলনীয়। এই উপত্যকার সামনে দাঁড়িয়ে তুষারশৃঙ্গ পাণ্ডিম, তিনচিঙ্‌কাঙ্‌ ও জুবনু। উপত্যকায় একটি মনোরম হ্রদ রয়েছে। আলুকথাঙের উচ্চতা ১৩,৪০০ ফুট। সেখান থেকে মাইল চারেক চড়াই পথ পেরিয়ে গেলে ছেমাথাঙ্‌ (১৫,৫৭০ফুট)। ছেমাথাঙ গুই-চালার (১৬,৬০০ফুট) পাদদেশে। গুইচা-লা গিরিপথের দূরত্ব মাত্র দেড় মাইল।

বেলা একটা বেজে যায় জোংরী পৌছতে। চারপাশে দু-তিনশ ফুট উঁচু গিরিশিরার মাঝখানে বেশ একটা ঢালু উপত্যকা জোংরী।

উত্তর-পশ্চিমে দূরে নেপালে অবস্থিত ইয়ালুঙ্ হিমবাহ থেকে মারাত্মক হিমেল হাওয়া ঝড়ের মতো সব সময়েই বইতে থাকে। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড উৎপাত শুরু হয়। জোংরী পৌঁছবার আগে ওখানকার সম্পর্কে অনেক বর্ণনা শুনতাম। এই পথ সিকিম হিমালয়ের পবিত্র পথ। চারপাশে অবর্ণনীয় শোভা বিচিত্র রোডোডেনড্রনের। প্রশস্ত উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্বে বয়ে চলেছে ঝরনাধারা। তার ধার দিয়ে ভিজে মাটিতে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য গাঢ় গোলাপী রঙের প্রিমুলা। মাঝে মাঝে হলুদ রঙের কম্পোজিটা। পাথরের খাঁজে আড়ালে ভাগ্যবানের নজরে নীল পপিরও সন্ধান মিলবে। যারা জোংরীতে দেখেছেন সূর্যের আলো, চাঁদনী রাতে তাঁবুর বাইরে, নয়তো চমরী গাই রাখবার পাথর সাজিয়ে তৈরি ঘরে বসে দেখেছেন তুদণ্ড জোংরীর অপরূপ শোভা, তাদের নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান বলব। আবহাওয়া খারাপ থাকলে জোংরী লামাদের বর্ণিত ঠাণ্ডা নরক। সেই ঠাণ্ডা নরকে পাপীদের দেহ নিয়ে যম-দূতেরা ফেলে রাখে, নগ্নদেহের ওপর গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ ছড়াতে শুরু করে যতক্ষণ না প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পাপীর দেহ হিমশীতল হয়। জোংরীতে এর ব্যতিক্রম নেই। বাকিমের হাড়ভাঙা চড়াই পেরিয়ে জোংরীতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ালুঙের হিমশীতল হাওয়া তুষারকণা উড়িয়ে নিয়ে আসবে। দেহের ঘাম শুকোবার আগেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যেতে হবে। আগুন জ্বালানো যাবে না সহজে। আশ্রয় নেবার আগেই নিরাশ্রয় করবার ভীষণ ষড়যন্ত্র শুরু হবে চারধার থেকে। সমস্ত আকাশ ভেঙে গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারকণা পড়তে শুরু করবে।

তবু জোংরী আমার কাছে অমরাবতীর মায়াকানন। চারপাশে প্রকৃতির অপরূপ বর্ণাঢ্য রোডোডেনড্রনের ফুলসাজ, উপত্যকার বুকে পোটেনটিলার হলদে ফুল, প্রিমুলার লাল ফুল, কোথাও কোথাও একোনাইটের নীল ফুল। ইয়ালুঙের মাতাল হাওয়া আসে আসুক তুষারকণা নিয়ে, কিছু যায় আসে না তাতে। এই অপরূপ পরিবেশে

এক মগ গরম চা নিয়ে সারাদিন বসে থাকা যায় রোডোডেনড্রন গাছের গোড়ায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবার অনেক আগেই জোংরীর তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। ছোট্ট ঝরনার অস্ফুট কলকণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে দেখি জলধারার ওপরে তুষারের ঘন আস্তরণ পড়ে কণ্ঠ রুদ্ধ করেছে ঝরনাধারার। সামনেই উত্তর-পশ্চিমে একটি উচ্চ পাহাড়ের ওপরে উঠে দাঁড়াই। হঠাৎ আমার চোখের সামনে যেন সৌন্দর্যের আর একটি ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। সূর্য তখন অস্ত যায় নি, আমার সামনে তুষারকিরীটধারী রাজাধিরাজ কাঞ্চনজঙ্ঘা। সূর্যের সোনালী কিরণে সারা অঙ্গে যেন সোনা ঝরে পড়েছে। কে নাম দিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা, কে সেই সৌন্দর্যপিপাসু প্রকৃতির মহান সাধক।

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিকিমের বৃহত্তম গিরিশিখর। এর একটি অংশ রয়েছে নেপালের দিকে, যে জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা সিকিম নেপালের সীমানা নির্ধারণ করছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম নিয়ে এক সময়ে বিশেষ এক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। সিকিম নেপাল সীমান্তের এই বিশাল গিরিশিখর তিব্বত থেকেও দৃশ্যমান। যে জন্য এর নামকরণ তিব্বত, নেপাল ও সিকিম থেকেও হয়েছিল। নামকরণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য নেই। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সংস্কৃত নাম যার অর্থ কাঞ্চনময় জঙ্ঘা বা স্বর্ণ নির্মিত উরুদেশ। বিভিন্ন অভিযাত্রী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সংগৃহীত তথ্য থেকে কতকগুলো নাম পাওয়া যায়।

সিকিমের লেপচাদের ভাষায় কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম	কওলোচু	Waddell
" ভোটিয়াদের ভাষায়	খম্বুকরম্	Sandberg
" তিব্বতীদের ভাষায়	গ্যানস-ছেন-জোড্‌লঙ্‌গা	Vanmanen
নেপালের ভোটিয়াদের ভাষায়	কাঙচেন্	Hodgson

নেপালের আদিবাসীদের ভাষায়	খম্বুকরম্‌ ল্যাঙুর	Hodgson
ভারতীয় ভাষায়	কাঞ্চনজঙ্ঘা	Imperial Gazetteer

কাঞ্চনজঙ্ঘা মূলত সিকিমের পর্বত বলে সিকিমের অধিবাসীদের দেওয়া নামেরই প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল। সিকিমের অধিকাংশ গিরিশিখরগুলোর নাম সিকিমীদের দেওয়া। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা এত উচ্চ গিরিশিখর, যার শীর্ষদেশ সিকিম ছাড়াও অন্যান্য নিকটবর্তী দেশ থেকে দেখা যায়। তাই সে সব দেশে এই গিরিশিখরের প্রচলিত নামগুলোকেও অগ্রাহ্য করা যায় না।

সিকিম, নেপাল ও তিব্বতের অধিবাসীদের দৃষ্টিতে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ হিসাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা এমন কিছু নতুন নয়। কারণ, তাদের দেশে অসংখ্য তুষারমণ্ডিত গিরিশিখর। কিন্তু বাঙলাদেশের অধিবাসী সমতলের বাসিন্দা। বাঙলার উত্তর সীমান্তে এই বিশাল গিরিশৃঙ্গ বাঙালীদের চোখে গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল সুদূর অতীত থেকেই।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তের অনেক গিরিশিখরের উল্লেখ রয়েছে প্রাচীন পুরাণ ও সংস্কৃত মহাকাব্যে। তাই সেই পর্বতশিখরের নাম সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত।

কৈলাস—তিব্বতী নাম—কাঙ্‌রিম্‌ পোচী

গুরলামান্ধাতা	মেমো-নাম-নিয়াম্‌রি
গোসাই থান	শিসা পুঙমা
গৌরীশঙ্কর	ট্রাসী শেরিঙ

হিন্দু মন্দিরের নিকটবর্তী তুষারশৃঙ্গগুলিকে তীর্থযাত্রীর দল সংস্কৃত নামকরণ করেছিলেন অতীতকালে। এই হিন্দু মন্দিরগুলো পরবর্তীকালে বৌদ্ধ তীর্থরূপে পরিগণিত হয়েছে। তারপর তিব্বতী নামকরণ করা হয়েছে গিরিশিখরগুলির। হিমালয়ের অনেক গিরিশৃঙ্গের সংস্কৃত নামের পাশাপাশি রয়েছে তিব্বতী, নেপালী নাম। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘাই বোধহয় এমন একটি গিরিশৃঙ্গ যার ভারতীয় দেওয়া

নামের কোনো পরিবর্তন সিকিম বা তিব্বতে হয় নি আজও। তবু কাঞ্চনজঙ্ঘার ভৌগোলিক নামের কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনা লামা তিব্বতের মানচিত্রে চোমোলহারী ছাড়াও সিকিমের উচ্চ গিরিশিখরের অবস্থান দেখিয়েছিলেন। সেই গিরিশিখরের নামকরণ করেছিলেন 'রিমো-লা'। ১৮২৮-১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাপ্রথ (Klaproth) চীনাদের অঙ্কিত তিব্বতের মানচিত্র প্রকাশ করেছিলেন; তিনি মানচিত্রে চীনা লামাদের অঙ্কিত বিভিন্ন গিরিশিখরের অবস্থানের ভুল সংশোধন করে, সঠিক অবস্থান নির্দেশিত করেছিলেন। মার্কহ্যান ও স্বেন হেডিন (Markhan & Sven Hedin) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁর প্রকাশিত মানচিত্রের। ক্লাপ্রথ সিকিমের এই উচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম দিয়েছিলেন জিমৌলা। ক্লাপ্রথের প্রকাশিত মানচিত্র ছাপাহয়েছে Sven Hedin এর 'Southern Tibet' Vol. I, II & VII এ।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চনজঙ্ঘা নাম সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ভূগোলের বইয়ে। সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কর্মীরা সিকিমের এই বিশাল গিরি-শিখরকে লক্ষ্য করেছিলেন বাঙলাদেশের সমতল ভূমি থেকে। জরীপ বিভাগের ব্রিটিশ কর্মচারীদের সহকারীরা ছিলেন বাঙালী। তারাই কাঞ্চনজঙ্ঘার নামকরণ করেছিলেন। সুতরাং কাঞ্চনজঙ্ঘা এই নামকরণ হয়েছিল ভারতবর্ষের দিক থেকে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক ও সাহিত্য একাদেমীর সভাপতি) সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জরীপ বিভাগ যখন এই উচ্চ গিরিশিখর পর্যবেক্ষণ করে জরীপ করেছিলেন, তখন তাঁরা পূর্ব প্রচলিত সংস্কৃত নামটিই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মত গ্রহণ করেছিলেন বাঙালী সাহিত্যিকরাও।

তদনুযায়ী বাঙলা সাহিত্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই সংস্কৃত নামটিই প্রচলিত হয়েছে। বাঙলা ভাষার মাধ্যমে এই নামের প্রচার হয়েছে হিন্দী ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এ সম্পর্কে।

এ সম্পর্কে S. G. Burard লিখেছেন "But when I see the interest taken in the Himalayan snow peaks of Nandadevi and Dhaulagiri by dwellers in the Plains of India it seems inconceivable that the inhabitants of nothern Bengal should have had no name, during pre-historic centuries, for the peak of perpetual snow which was presenting such a strange contrast to their own hot climate." যখন আমি দেখি যে ভারতের সমতলের বাসিন্দারা হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ নন্দাদেবী ও ধওলাগিরি সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছে, উত্তরবঙ্গের উষ্ণ জলবায়ুর মধ্যে বসবাসকারীদের দৃষ্টির সামনে ভাস্বর এমন বিচিত্র চিরতুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের প্রাচীন কোনো নাম থাকবে না, একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জোসেফ হুকার তাঁর বিখ্যাত বই Himalayan Journal এর মাধ্যমে এই গিরিশৃঙ্গের নাম সর্বপ্রথম ইউরোপীয়দের দৃষ্টিগোচরে আনেন। অবশ্য তিনিই কাঞ্চনজঙ্ঘা নামের বিকৃতি ঘটিয়ে কিঞ্চিনজঙ্ঘা নাম প্রচলন করেন। ঐ বৎসর ব্রায়ান হজসন (Brian Hodgson) হিমালয়ের মানচিত্র অঙ্কিত করে সিকিমের এই সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গকে কাঙ্‌চেন নামে অভিহিত করেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জরীপ বিভাগ একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার বানান লেখা হয় Kant-Schin-Dschinga.

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের প্রস্তাব অনুযায়ী, নামের ও বানানের সমতা রাখার নির্দেশ জারী করেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়। স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের প্রস্তাব অনুসারে কাঞ্চনজঙ্ঘা নামই গৃহীত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের চাইতে জনপ্রিয় ছিল হুকার সাহেবের হিমালয়ান জার্নাল। ফলে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একাদশ সংস্করণে হুকারের প্রচলিত কিঞ্চিনজঙ্ঘা নামটি ব্যবহার করা হয়। হাণ্টারের কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম বিকল্প হিসাবে মেনে নেওয়া হয়।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টেবল্ (Constable) হান্টারেরনামই গ্রহণ করেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Fullarton's ও Lippincott's Gazetteerএ হুকারের নামই গ্রহণ করা হয়।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সার্ভেয়ার জেনারেল ব্রিগেডিয়ার টমাস হুকার সাহেবের নাম বর্জন করে সংস্কৃত নাম গ্রহণের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্র দাস C.I E ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তার Tibetan Dictionaryতে কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটি ব্যবহার করেন। কর্নেল ওয়াডেলও এই নামটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে Mr. Freshfield কাঞ্চনজঙ্ঘা নামই ব্যবহার করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত বই Arround Kanchanjangaতে।

তিব্বতে প্রচলিত কাঞ্চনজঙ্ঘার অনেকগুলি নাম সংগ্রহ করেছিলেন প্রখ্যাত অভিযাত্রীরা বিভিন্ন সময়ে।

নাম	অর্থ	অথরিটি
Gans-chhen-mdzod-Lnga	Five receptacles of vast glacier ice	Jeaschke 1881
Gans-Chhen- rje Lnga	Five-Kings of vast ice	
Gans-Chhen-rtse Lnga	Five great glecier peaks	
Kang-Chhen-dzonga	Five repositories of great snow	Waddell. 1891
Kang-Chhen-dsonga	Fir treasure chests of great snow	Sand Berg 1895
Gans-Chhen-mced-Lnga	Five brethren of great snows.	Ribbach 1929
Gans-Chhen-mdzod-Lnga	Five receptacles of vast glacier ice	Van Manen 1931
Kanchen Junga (Indianised from the sanskrit)	Golden thigh	Impeaial gazetreer.

কাঞ্চনজঙ্ঘা নামের প্রকৃত উচ্চারণ ও বানান সম্পর্কে সংস্কৃত

ভাষা থেকে অথ্য সংগ্রহ করে ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জেনেভা কনভেন-সনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকৃত বানান ও উচ্চারণের উল্লেখ করেন Kancana Jangh। (Himalayan Journal vol. III p. 154)

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতে না হতেই হঠাৎ কোথা থেকে রাশি রাশি কুয়াশার মতো মেঘ ছেয়ে ফেলে। ইয়ালুঙ থেকে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট হয় শুরু। কাঞ্চনজঙ্ঘা বুঝি ক্ষুব্ধ হয়। তুষারপাত শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড বেগে। প্রথম সাগুদানার মতো গুঁড়ি গুঁড়ি ও তারপর মুঠো মুঠো গুঁড়ো যেন আকাশ থেকে ছড়াতে থাকে কোন এক অদৃশ্য শক্তি। তাপমাত্রা কমে যায় দ্রুত। তাঁবুর ভেতরে ঢুকে সবাই আশ্রয় নেয় প্রচণ্ড তুষারপাত থেকে। ঘণ্টা কয়েক ধরে চলে এই উৎপাত; এর মধ্যেই সবাই বাইরে বেরিয়ে রান্নার স্থানে গিয়ে খেয়ে নেয়। রান্নার স্থানে আগুনের পাশে কিছু সময় জটলা করে ফিরে আসে।

ঘুম ভেঙে যায় গভীর রাত্রে। কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন ডাকে, দাজু, দাজু? চমকে উঠি, কার যেন কান্না মেশানো স্বর। স্লিপিংব্যাগ থেকে হাত বার করে টর্চ জ্বালি, তাঁবুর মুখ খুলে ফেলতেই এক ঝটকা হিমশীতল হাওয়া এসে যেন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। বাইরে তুষারের ওপরে ঠিকরে পড়েছে শুচিশুভ্র জ্যোৎস্না-লোক। রাত দুটো বাজে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, শেরপানী কাঁদছে নিঃশব্দে। তার করুণ মুখে এসে পড়েছে চাঁদের আলো। দু' চোখ বেয়ে জল ঝরছে অবিশ্রান্ত।

দাজু, দেখো, মুখ্‌সে খুন্‌ গিরতা হ্যায়। দেখো, শেরপানী হাঁ করে দেখায় মুখ ভর্তি তার তাজা রক্ত। চমকে উঠি, সামনে সাদা ধবধবে বরফের মধ্যেও টকটকে রক্ত রয়েছে পড়ে।

ডাক্তার, ডাক্তার!

বিমল বেশ লম্বা, পা লম্বা করলে তাঁবুর খুঁটির সঙ্গে যায় পা ঠেকে।

ধাক্কা দিতেই চমকে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে পা লেগে তাঁবুর দুটো খুঁটি খুলে পড়ে যায়। দুজনেই টর্চ নিয়ে ধড়মড় করে বেরিয়ে পড়ি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জুতো কাঠের মতো শক্ত, স্লিপিংব্যাগের তলায় রেখেও ফল হয় নি। বহু কষ্টে জুতোয় পা গলিয়ে এগিয়ে যাই। তাঁবু পড়ে থাকে। শেরপানীকে ধরে আমি আর ডাক্তার নিয়ে যাই ওদের ছাউনির ভেতর। সেখানে আর সব শেরপানী আগুন জ্বালিয়ে শুয়ে রয়েছে চারপাশে।

বিমলের ঘুম ছুটে যায় মুহূর্তের মধ্যে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এই তরুণীকে পরীক্ষাই বা করবে কেমন করে? খুলে পড়া তাঁবুর ভেতর থেকে হাতড়ে হাতড়ে স্টেথিস্কোপ আর থার্মোমিটার নিয়ে আসি। আগুনের কাছাকাছি শেরপানীকে বসিয়ে অন্য একজন শেরপানীকে ডেকে তুলি। তরুণীর গায়ে বেশ পুরু মোটা কাপড়ের আলখাল্লার মতো, তার পরে পশমী পোষাক। সব কিছুর ওপরে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। এত ঠাণ্ডায় দেহের কোনো অংশ অনাবৃত করাও বিপজ্জনক।

ছাউনির ভেতরেই জ্যোৎস্নালোকের ক্ষীণ আভা। কাঠের আগুন জ্বলছিল চিড়চিড় করে। আবছা আলোয় শেরপানীর মুখ ঝাপসা দেখায়। বিমল টর্চ ফেলে গলা পর্যন্ত দেখে নেয়। অন্য এক জন শেরপানীকে দিয়ে বুকের ওপরে পুরু কাপড় আলগা করে টেথো লাগিয়ে ভাল করে দেখে নেয় বুকপিঠ। আমার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসে বিমল, যা ভেবেছি তাই। ডান দিকের লাংস…

দেখো দিদি, শেরপানীকে লক্ষ্য করে ডাক্তার বিমল বাঙলা হিন্দী মিশিয়ে বলে—কাল তুমি ওয়াপস্ যাও। ওষুধ লিখে দিচ্ছি, চিঠি দিচ্ছি দার্জিলিঙে চলে যাও। আজ তোমাকে একটা সুইয়া দেবো। দেখা যাক্…

শেরপানী করুণ কণ্ঠে কেঁদে ওঠে, ডাক্তার দাজু, ওয়াপস্ জানে মত্ বোলো।

আমি অবাক হই, কিঁউ?

আভি ওয়াপস্ জানেসে ম্যায় ভুখা মর্ জাউঙ্গী। শেরপানীর দু চোখের জল আবছা অন্ধকারেও চিক্‌চিক্ করে।

ডাক্তার ও আমি দুজনই অন্ধকারে দৃষ্টি বিনিময় করি। বলে কি? টি. বি. তার পর হিমপটিসিস্। নড়াচড়া করলে আরও বাড়বে, তারপর সাংঘাতিক হবে। এ অবস্থায় চড়াই-উৎরাই যে কি মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে সে হয়তো জানে না এই পাহাড়ের কোলে লালিতা তরুণী। শহর হলে, যাকে বলে বেড রেস্ট সম্ভব হলে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা। আমি ভাবতে পারি না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও আমরা দুজন যেন ঘেমে উঠি। অন্যান্য শেরপানীরাও বলে, ডাক্তার সাব, ওকে আমরা চমরীকিয়াঙ্ নিয়ে যাব। ওর মাল সবাই নেব ভাগাভাগি করে। তুমি সুইয়া দিয়ে ওর খুন গিরা বন্ধ করে দাও। চমরীকিয়াঙে ছোট ছোট ঝুপড়ি আছে, ডাক্তার সাব।

ডাক্তার আমার দিকে তাকায়, দেখছেন কাণ্ড! বেড রেস্টএর রোগী চড়াই ভেঙে আরও ঠাণ্ডার মধ্যে যাবে চমরীকিয়াঙ্। ও তো মরে যাবে। কি করি বলুন তো? এত রাত, তার মধ্যে এই সাংঘাতিক দুর্যোগ!

সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত একটানা তুষারপাত হয়েছে। জোংরীর সবুজ ঘাস আর রঙীন ফুলে ঢাকা উপত্যকার ওপরে জমা হয়েছে নরম তুষারকণা। অনেক রাত পর্যন্ত পালাক্রমে তাঁবুর ওপর থেকে বরফ সাফ করতে হয়েছে। এর মধ্যে, এই অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে কি সাংঘাতিক বিপদ।

ভাবি, উপায়ই বা কি? ওই শেরপানী দিনমজুর। বয়স কম, লাবণ্যবতী তরুণী। দার্জিলিঙে দেখেছি ওকে উচ্ছল। পর্বত আরোহণ শিক্ষার্থীর অনেকেই ওর সঙ্গে সারা পথ নানা রসিকতায় মেতেছে। ওকে সুন্দর করে সাজিয়ে আধুনিক সমাজে দাঁড় করিয়ে

দিলে খুব বেমানান হবে না। ওর সংসার হতে পারত, সুন্দর ছোট-খাটো সংসার। স্বামী পুত্র, নিশ্চিন্ত নির্ভরশীল, স্নেহ ভালবাসা মায়া মমতা ঘেরা নীড় গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু এসব আশা, দুরাশা মাত্র। এসব কল্পনা স্বপ্নাতীত। তাই বিশ্রামের কথা ভাবতে পারে না, আরামের কল্পনাও করতে পারে না এই যৌবনের শুরুতে। বসে থাকা ওর কাছে মৃত্যুর শামিল।

ডাক্তার, ওয়াপস্ জানে মত্ বোলো, ম্যায় ভূখা মর জাউঙ্গী! শেরপানীর করুণ প্রার্থনা। রোগে মৃত্যুর চাইতে, অনাহারে মৃত্যুর ভয় যেন বেশী। আমি ভাবি, সে মৃত্যু বুঝি জীবনযুদ্ধে পরাজিতের গ্লানি মাখানো, তাই।

দু-একজন পোর্টারকে ঠেলে তুলে বরফের ভেতর থেকে ওষুধের বাক্স উদ্ধার করতে হয়। বাক্স খুলে ইঞ্জেকসনের যন্ত্রপাতি বার করে তৈরি হয়ে নেয় বিমল। শেরপানীকে বিছানায় শুইয়ে দিই। মৃত্যুর গহ্বরে বসে মৃত্যু ভয়ে ভীত এক তরুণীকে দিতে থাকি সান্ত্বনা, অভয়।

কুড়ি

রাতের দুঃস্বপ্ন কেটে যায় ভোরের স্নিগ্ধ আলোয়। বিমলের ডাকাডাকিতে তাকিয়ে দেখি তাঁবুর গায়ে সূর্যের সোনালী রঙ ঝরে পড়েছে। বাইরে বেরিয়ে পড়ি সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে। চারদিকে সাজ-সাজ রব। কুলির দল চলে গেছে অনেকেই চমরীকিয়াঙের দিকে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও। আমি আর বিমল পরে যাবো ঠিক হয়েছে। বিমলের কাছে গত রাতের শেরপানীর কথা জিজ্ঞেস করবার চেষ্টা করতেই থামিয়ে দেয় ইঙ্গিতে। আভাসে জানায় ভালই আছে।

তাঁবু গুছিয়ে দিতে হয় অপেক্ষমান কুলিদের। ইতিমধ্যে চার পাশের বরফ গলতে শুরু করেছে। রোডোডেনড্রনের ফুলগুলোর গায়েগায়ে সাদা রঙের থোকা থোকা বরফ কেমন এক অদ্ভুত দেখায়। রাতের মৃত ঝরনা ভোরের আলোর প্রাণ ফিরে পায়। অস্ফুট কলধ্বনি শুনে এগিয়ে গিয়ে তুষারশীতল জলে মুখটা চটপট ধুয়ে আগে এক মগ গরম চা নিই। তারপর খাবারের প্যাকেটটা রুকস্যাকে ভর্তি করে আমি আর বিমল বেরিয়ে পড়ি। একজন শেরপানী মালপত্র নিয়ে চলে আগে আগে, পিছনে আসতে থাকে অন্যান্য কুলির দল। আমাদের পশ্চিম-দক্ষিণের অনুচ্চ গিরিশিরা পেরিয়ে ভুজগাছের তলা দিয়ে নেমে যাই সুদৃশ্য উপত্যকায়। সেটিও জোংরী উপত্যকার পশ্চিমাংশ। উত্তর-পশ্চিমে কালচে রঙের পাথরের পর্বতশিখর যার নাম সিকিমের ঘরে ঘরে। দূর থেকে ঠিক চোর্তেনের মতো দেখতে। প্রকৃতিদেবী যেন এক বিশাল চোর্তেন নির্মাণ করে রেখেছেন। পর্বতশিখরটি সিকিমের সব চাইতে পবিত্র কাবুড়। কাবুড়ের উচ্চতা ১৫,৮৭৮ ফুট। জোংরীর উপত্যকার উচ্চতা ১৩,৭০০ ফুট। কাবুড়ের পাদদেশে সিকিমের প্রসিদ্ধ গিরিগুহা ছে চেন্ ফু বা পরম আনন্দময় গুহা। কাবুড়ের পাদদেশে বিশাল উপত্যকার মাঝে মাঝে ইয়াক বা চমরী গরু তত্ত্বাবধানের জন্য সিকিমীরা পাথর সাজিয়ে ঘরের মতো তৈরি করে রেখেছে। শেরপানী আমাদের একটি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে দেখি অসুস্থ শেরপানী রয়েছে বসে। তার কাছেই রয়েছে প্রখ্যাত পর্বতারোহী তেনজিঙ নোরগে। তেনজিঙ অবশ্য পর্বতারোহণ শিক্ষাকল্পের ডিরেক্টর অফ ফিল্ড ট্রেনিং। আমরাও বসি ভেতরে, মাঝে আগুন জ্বালানো। দু-তিনজন সিকিমী আমাদের ইয়াকের দুধ দিয়ে আপ্যায়ন করে। দুধের রঙ ঈষৎ হলদে, সাধারণ দুধের চাইতে অনেক বেশী গাঢ়, স্বাদ সামান্য নোনতা, গন্ধবিহীন। সিকিমীরা এই দুধের সর জমিয়ে শক্ত করে শুকিয়ে রাখে। সেগুলো দেখতে অনেকটা শুকনো নারকেলের মতো। পথ চলতে চলতে সেই

শুকনো সরের টুকরো সুপুরির মতো মুখে ফেলে চিবুতে থাকে। সেগুলি বেশ শক্ত আর অনেক সময় পর্যন্ত মুখের ভেতরেই থাকে। বিমল আর একবার শেরপানীকে পরীক্ষা করে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়। তেনজিঙ জানায় ওকে এমনি করে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তেনজিঙ অভয় দেন, কুছ ডর নেই ডক্‌টর সাব। সব ঠিক হো জায়গা। হিমল কা হাওয়া বিলকুল ঠিক কর দেগা। ফিক্‌র মত্‌ করো। আবহাওয়াটা হাল্‌কা করে দেন তেনজিঙ প্রাণখোলা হাসি হেসে। শেরপানীর ম্লান মুখেও হাসি ফুটে ওঠে।

আমি বিমল তেনজিঙ চলতে থাকি। কাবুড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি গিরিশিরাটি উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেছে। এই গিরি-শিরাতেই রয়েছে ফর্ক পিক্‌, কাব্রু ডোম, কাব্রু, র‍্যাথঙ্‌। র‍্যাথঙ-এর গিরিশিরার পশ্চিমে গিরিশিরা বেশ ঢালু হয়ে র‍্যাথঙ-লার সৃষ্টি করেছে। র‍্যাথঙ-লা অতিক্রম করলেই নেপালের ইয়ালুঙ হিমবাহে পৌঁছানো যায়। জোংরী থেকে একটি পথ চলে গিয়েছে পশ্চিমে কাঙ-লার (১৮,২০০ ফুট) দিকে। কাঙ-লা পেরুলেই নেপাল রাজ্য। স্যার জোসেফ হুকার থেকে শুরু করে অভিযাত্রী শরৎচন্দ্র দাস, রিনজিঙ, উগায়েন গিয়াৎসো ও অন্যান্য বিদেশী অভিযাত্রী এই পথ পেরিয়ে নেপালের কাঙবাচেন গিয়েছিলেন।

কাবুড় গিরিশিখর পরম পবিত্র। অথচ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে এই কাবুড়ের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন Freshfield ও Garwood। তাঁরা শীর্ষদেশে দেখেছিলেন প্রার্থনা পতাকা। ধর্মীয় ব্যাপারে সিকিমী জনসাধারণ বেশ স্পর্শকাতর। বিদেশী পর্যটকদের যথেচ্ছ পর্যটন তারা তাই মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারত না। অতীতে বিদেশীদের কাছে সিকিম প্রায় তিব্বতের মতোই ছিল নিষিদ্ধ দেশ। পর্বতারোহণের ব্যাপারে সিকিম সরকার বহু গিরি-শিখরের ওপরে বাধানিষেধ আরোপ করেছেন। সব ক্ষেত্রেই সেই

গিরিশৃঙ্গগুলোকে বলা হয়েছে পবিত্র শিখর। সিকিমের সবচাইতে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা নিষিদ্ধ পর্বতশিখর।

কাবুড় গিরিশিখরের পশ্চিম পাদদেশে ছোট্ট তৃণভূমিতে সেপ্টেম্বর অক্টোবরে দেখা যায় পোটেন্টিলা, জিরানিয়াম, জেনসিয়ান, সস্সুরিয়া গ্র্যাণ্ডি ফ্লোরা ও সস্সুরিয়া সাক্রা। জুন জুলাইয়ে প্রিমুলার ভিড়। কাবুড়ের পশ্চিম গা ঘেঁষে Shephard pass জোংরী-লা। অপরিসর গিরিপথ প্রচণ্ড ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে র‍্যাথঙ উপত্যকার দিকে। এই পথ জোংরী ও র‍্যাথঙ উপত্যকার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। জোংরী-লায় বিশ্রাম নিই পাথরের ওপরে বসে। গিরিপথের ওপরে ঘন তুষারের আস্তরণ, তার ওপরে পাথরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা অজস্র Prayer flag বা প্রার্থনা পতাকা। জোংরী-লার উচ্চতা প্রায় ১৪,৫০০ ফুট।

গিরিপথ পেরিয়ে খাড়া উৎরাই ভেঙে জোংরী-লার গোড়ায় নেমে পড়তে বিন্দুমাত্র সময় লাগে না। র‍্যাথঙ উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে র‍্যাথঙ চ্যু। নদীর দু পাশে বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে ছড়িয়ে রয়েছে চমরী গরু। এই সব চমরী গরুই সিকিমের চোগিয়ালের। চমরী গরুর এমন সুদৃশ্য বিচরণ ভূমি সারা সিকিমে বিরল। সম্ভবত এই জন্যই স্থানটির নাম চমরীকিয়াঙ। সিকিমী ভাষায় কিয়াঙ মানে বিচরণক্ষেত্র (Grazing ground) বেলা দুটোয় প্রায় সমতল তৃণভূমির উত্তর দিয়ে হেঁটে ছোট ছোট জলপ্রবাহ পেরিয়ে উপস্থিত হই আমাদের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে।

চমরীকিয়াঙ্।

যথার্থ নামকরণ। চারপাশে সোনালী ঘাসে ঢাকা ঢালু উপত্যকা। আশে পাশে পাহাড়ের ঢালে দেখি চমরী গরুগুলোকে বিচরণ করতে। একটা দুটো নয়; বেশ কিছু সংখ্যক। অসংখ্য না হলেও যেন কষ্ট করে গুণতে হয়। ওরা বিচরণ করছে স্বতন্ত্রভাবে, নয়তো বা দলবদ্ধভাবে। বিচরণ করতে করতে এগিয়ে যায় উচ্চ

উপত্যকায়, তার পর তুষার সীমার ওপরে। সেখানে পার্শ্ব গ্রাব রেখার প্রাচীরের ওপর দিয়ে চলে সারিবদ্ধভাবে। প্রকৃতির বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যে এরা মুক্ত। এরা বদ্ধজীব নয়। তাই দেশ, কাল, পাত্রের বাধা ডিঙিয়ে চলে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে। সিকিম থেকে তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথ পেরিয়ে নেপালে, নয়তো বা ভুটান বা তিব্বতে। সারা গ্রীষ্ম বর্ষায়, দেশ ভ্রমণ ও প্রবাসজীবনযাপন। শীতের প্রারম্ভেই যখন উচ্চ উপত্যকায় শুরু হয় তুষারপাত, তখন এরা মুখ ঘুরিয়ে ফেলে স্বদেশাভিমুখে। তারপর, তুষার সীমানার নিচে নেমে আসে দলবদ্ধভাবে। বাকিমকে চমরী গরু বা ইয়াক্-দের শীতাবাস বলা যেতে পারে। শীতের কয়েক মাস গভীর বনের ভেতরে যথেচ্ছ বিচরণ করে। বিশাল এদের অবয়ব, অমিত শক্তির অধিকারী। সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দুটো আর ভয়াবহ চোখের দৃষ্টি, প্রথম দর্শনে, ভয়ে রক্ত বুঝি হিম হয়ে যেতে চায়। কিন্তু এরা অসম্ভব শান্ত ও নিরীহ। সহজে পোষ মানে, তাই সিকিমী, তিব্বতী, ভুটানী ও নেপালীদের অবলম্বন এরা। তুষারাবৃত গিরিপথ দিয়ে প্রচুর মালপত্র নিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারে বলে, সুদূর অতীতে তিব্বতী ভুটানীরা সিকিমের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। এ ছাড়া এদের দুগ্ধ পান করে সিকিমীরা। এদের মাংসও খায়। দেহের লোম দিয়ে কম্বল ও পুলওভার বানিয়ে নেয়।

চমরীকিয়াঙ র‍্যাথঙ উপত্যকায় একটি অপরূপ ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। আদর্শ ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে যা কিছুর প্রয়োজন সবই রয়েছে প্রচুর। সুপেয় জলের ধারা, জ্বালানির উপযুক্ত জুনিপার, কাছাকাছি পাথরের গুহায় প্রকৃতির পান্থনিবাস। অভিযাত্রীদের মন কেড়ে নিতে চায় এর অপরূপ সৌন্দর্য। এর পূর্ব ও পশ্চিমে প্রায় সমান্তরাল গিরিশিরার দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে প্রসারিত হয়ে উত্তর সীমান্তে উপত্যকাকে ঘিরে ফেলেছে। পূর্বদিকের গিরিশিরায় কাব্রু, র‍্যাথঙ পশ্চিমে কাঙ্‌লা, কাঙ্‌ ও কোকতাঙ গিরিশিখর। উত্তরদিকে দুই

গিরিশিরার সংযোগস্থল অপেক্ষাকৃত নিম্ন। তার নাম র‍্যাথঙ্‌ গ্যাপ বা র‍্যাথঙ-লা। এই গিরিপথ দিয়ে খাড়া উৎরাই পেরুলেই নেপালের ইয়ালুঙ হিমবাহের গ্রাবরেখা। চমরীকিয়াঙ্‌ থেকে কাঙ গিরিশিখরটি পরিষ্কার দেখা যায়।। এই গিরিশিখরের বর্তমান নাম ফ্রে পিক, উচ্চতা ১৯,১৩০ ফুট। এই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড জুড়ে পড়েছিল আমাদের রঙীন তাঁবু। একধারে বাঁশের চাটাই নিয়ে এসে ছাউনি বানানো হয়েছে। সেই বিস্তৃত ছাউনি দেওয়া অংশটি কিচেন বা রান্নাঘর। তার কাছেই আর একটি ঘরের মতো করা হয়েছে বাঁশের চাটাই দিয়ে। সেটি শেরপানী ও পোর্টারদের রাত্রি বাসের স্থান।

সন্ধ্যা গাঢ় হতে না হতেই কুয়াশার পাতলা চাদর নেমে আসে চমরীকিয়াঙের বুকে। নিস্তব্ধ প্রকৃতি কলকোলাহলে মুখরিত হয়। আমরা গিয়ে বসি কিচেনের মধ্যে আগুনের ধারে। চমরীকিয়াঙের এই অংশের উচ্চতা ১৪,৫০০ ফুট। কিচেনের ধারে ভিড় বাড়ে, সেই সঙ্গে দেখি পাশাঙের ভ্রূ কুঞ্চিত হতে। এত বড় কিচেনের এক কোণে পাশাঙের ক্ষুদ্র অবয়ব কেমন যেন বেমানান ঠেকে। ভাল করে দেখি, আবছা অন্ধকারে পাশাঙের কাছেই রয়েছে তার গৃহিণী। স্বল্প আলোয় তার চেহারা দেখে চমকে উঠি। একি চেহারা হয়েছে তার? শুষ্ক ম্লান মুখ, চোখ পড়তেই ফিক করে ক্লিষ্ট হাসি হাসে। বিমলকে দেখে পাশাঙ গৃহিণী বলে নিজে থেকেই, সেই অসুস্থা শেরপানীর কথা। সে নাকি ভালই আছে।

বিমল অবিশ্বাস-ভরা দৃষ্টি মেলে ধরে আমার দিকে, শুনছেন, যৎ-সামান্য ওষুধ পড়েছে। রক্ত বন্ধ হয়েছে, তাই না কি ভাল আছে। এরা দেখছি মেডিক্যাল সায়ান্সের মধ্যেও গোল পাকিয়ে ফেলবে।

আমি তাকিয়ে থাকি বিমলের দিকে। বিমল বলে, কি আর করা যাবে? রক্ত যখন বন্ধ হয়েছে, আর খারাপ কোথায়? জ্বর হয় কিনা জানি না। দুর্বলতা বোঝা যাবে না। কারণ উচ্চ হিমালয়ে

এসব বিচার করা সম্ভব নয়। মোট কথা, মরণাপন্ন না হওয়া পর্যন্ত এরা নিজেদের সুস্থ মনে করে।

হয়তো তাই, আমি ভাবি—অসুস্থতা বোধহয় এদের কাছে বিলাসিতার শামিল।

চমরীকিয়াঙে ভোর হতেই তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে মুখে লাগে তীব্র হিমপ্রবাহ, কেমন যেন এক জ্বালাকর অনুভূতি। পূর্ব আকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছে। কাব্রু ডোম ও র‍্যাথঙের শীর্ষে সোনালী আভা। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা বা তার পূর্ব গিরিশিরার কাউকেই দেখা যায় না। বেশ একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে র‍্যাথঙ হিমবাহ ও কাব্রুর হিমপ্রপাত দেখি। সিকিম হিমালয়ের অন্যান্য হিমবাহের তুলনায় র‍্যাথঙ হিমবাহ ছোট হিমবাহ। দৈর্ঘ্য হয়তো বা মাইল পাঁচেক হবে; আর প্রস্থ মাইল খানেক। সার বুরার্ড (Sir Sidney Burard) কিন্তু একে নেপাল হিমালয় বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু ভূপ্রকৃতির গঠন বৈচিত্র্যে সিকিম হিমালয় সত্যি বিচিত্র। বিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কোনোক্রমেই নেপালের ধবলগিরি বা এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গের পূর্বাংশের গিরিশিখর বলা চলে না। সিকিম হিমালয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সিকিম হিমালয় দার্জিলিঙ থেকে সোজাসুজি প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। এই অংশটি নিম্ন হিমালয়ের মহাভারত গিরিশ্রেণীর পূর্বাংশে অবস্থিত। এর দক্ষিণ দিকে শিবালিক পর্বতশ্রেণী না থাকায় সমতলের মুখোমুখি রয়েছে দাঁড়িয়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘার পূর্ব ও পশ্চিম গিরিশিরা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। পশ্চিমের গিরিশিরা অরুণ ও তাম্বুরকোশী উপত্যকার দ্বারা ভগ্ন। পূর্বদিকের গিরিশিরা ভগ্ন তালুঙ, জেমু, লাচেন ও লাচুঙ উপত্যকার দ্বারা।

সিকিম হিমালয়ের উচ্চতম পর্বত কাঞ্চনজঙ্ঘার গিরিশিরা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রেসফিল্ড

ও গারউড সদলবলে সাফল্যের সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিক্রমা করেন। হারমান্ ও ট্যানার সাহেবের সার্ভের পরই সিকিম হিমালয়ের সৌন্দর্য ভাণ্ডারের দ্বারের চাবিকাঠি খুলে যায়। তার পর আসে পর্যটনকারীর দল, বৈজ্ঞানিক সমীক্ষকের দল। কিন্তু পর্বতারোহী দল পর্বতারোহণের উদ্দেশ্য নিয়ে সিকিমে আসেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯০৭ :

C. W. Rubenson ও Monrad Aas নামে দুজন নরওয়ে-জীয়ান পর্বতারোহী অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে এসেছিলেন চমরীকিয়াঙ্। উদ্দেশ্য, কাব্রু গিরিশৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা। কাব্রু গিরিশিখর (২৪,০০২ ফুট) আরোহণের একমাত্র পথ র‍্যাথঙ হিমবাহ দিয়ে কাব্রু হিমপ্রপাত পেরিয়ে উঠতে হবে কাব্রুডোম। (২১,৬৫০ ফুট) ও কাব্রুর গিরিশিরার সংযোগস্থলে। অভিযাত্রীরা ৬ই অক্টোবর র‍্যাথাঙ হিমবাহ পেরিয়ে ১০,৯৫০ ফুট কাব্রু হিমপ্রপাতের পাদদেশে শিবির স্থাপন করেন। পরবর্তী শিবির হয়েছিল ২১,৫০০ ফুটে। সেখান থেকে সরাসরি শীর্ষ আরোহণের চেষ্টায় ব্যর্থ হলে, ২২,০০০ ফুট আরও একটি শিবির স্থাপন করেন। ২০শে অক্টোবর দ্বিতীয়বার শীর্ষে আরোহণের চেষ্টা করেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও হিমপ্রবাহের জন্য সকাল ৮-৩০ মি. আগে কিছুতেই তাঁবু থেকে বাইরে আসতে পারলেন না। সন্ধ্যা ছটায় নরম ভস্‌ভসে বরফ ঠেলে ২৩,৯০০ ফুটে পৌঁছে যান। শীর্ষদেশ যখন তাঁদের হাতের নাগালের মধ্যে প্রকৃতি-দেবী তখন নিদারুণ রসিকতা শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে মেঘ এসে নীল আকাশ ছেয়ে ফেলে। প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে তাঁদের প্রায় উড়িয়ে ফেলে দিতে চায়। বাধ্য হয়ে তাঁরা দ্রুত অবতরণ শুরু করেন। অবশ্য মাঝপথে Rubenson পা ফস্কে পড়ে দড়িতে বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে থাকেন। তাঁরা অধিক রাত্রে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও ক্লান্ত দেহ নিয়ে কোনো রকমে ফিরে আসেন শিবিরে। অভিযান ব্যর্থ হয়। এই বৎসর Dr. Kellas সেপ্টেম্বর মাসে

আসেন জেমু হিমবাহে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও তিন জন গাইড। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সিম্ভু (২২,৩৬০ ফুট) পর্বতশীর্ষে আরোহণ করা। কিন্তু প্রচণ্ড তুষারপাত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাঁর স্বপ্নকে দেয় ব্যর্থ করে। তিনি ২১,৭০০ ফুট উচ্চ থেকে তুষার ঝড়ের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে আসেন। এই বৎসরেই আবার তিনি জেমু হিমবাহে এসে নেপাল গ্যাপে (২০,৬৭০ ফুট) পৌঁছবার জন্য দুবার চেষ্টা করেন। ঘন কুয়াশার আবরণ তাঁর দৃষ্টি অবরুদ্ধ করায় প্রথমবার বিপদসঙ্কুল নেপাল গ্যাপে পৌঁছবার চেষ্টা স্থগিত রাখেন ১৮,০০০ ফুট থেকেই। দ্বিতীয়বার ১৯,০০০ ফুট উচ্চে বরফের ফাটল অতিক্রম করতে না পেরে ফিরে আসেন।

১৯০৯ :

সিকিম হিমালয় Dr. Kellas-এর মনপ্রাণ হরণ করেছিল। তাই তিনি আবার আসেন আগস্ট মাসে। কিন্তু এবার উত্তর-পূর্ব সিকিমে পওহুনরী গিরিশৃঙ্গে (২৩,১৮০ ফুট) আরোহণের চেষ্টা করেন। ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন, তাই তাঁকে ২১,৭০০ ফুট থেকে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হয় প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে। কিন্তু Kellas-এর কুষ্ঠিতে বোধহয় 'হতাশা' কথাটা লেখা নেই। সেপ্টেম্বর মাসে তাই তিনি যান উত্তর-পশ্চিম সিকিমে লাঙপো ও কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমবাহ পরিদর্শনে। সেখানে লোনাক উপত্যকা থেকে জঙসঙ-লা (২০,০৮০ ফুট) অতিক্রম করে জনসঙ শৃঙ্গের (২৪,৩৪৪ ফুট) পশ্চিম গিরি-শিরায় ২২,০০০ ফুট আরোহণ করেন, সেখান থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বরে আরোহণ করেন ২২,১০০ ফুট উচ্চ লাঙপো গিরিশৃঙ্গ। সাফল্যের আনন্দে Kellas আবার নেপাল গ্যাপে আরোহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের জন্য ২০,০০০ফুট উচ্চ থেকে তৃতীয় বারও ব্যর্থ হয়ে আসেন ফিরে।

১৯১০ :

এই বৎসর আবার Dr. Kellas আসেন সিকিমে, অবশ্য মে

মাসে। উদ্দেশ্য বর্ষার আগে সিকিম হিমালয় পর্যবেক্ষণ করা। এবার তিনি জেমু হিমপ্রবাহ থেকে ১৮,১১০ ফুট উচ্চ সিম্ভু স্যাড্‌ল পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জেমুগ্যাপ (১৯,২৭৫ ফুট) ও সিম্ভু স্যাড্‌ল অতিক্রম করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনোটাতেই কৃতকার্য হন না। ব্যর্থ হয়ে চতুর্থবারের জন্য চেষ্টা করেন নেপাল গ্যাপ অতিক্রম করবার। ভাগ্যদেবী চতুর্থবার সুপ্রসন্ন হন। তিনিই প্রথম নেপাল গ্যাপে আরোহণে সমর্থ হয়েছিলেন। এই মাসেই তিনি লোনাক-লা (১৯৫০০ ফুট) অতিক্রম করে প্রবেশ করেন লোনাক উপত্যকায়। সেখান থেকে দ্বিতীয়বার লাঙপো শৃঙ্গে আরোহণ করেন। পরে চোর্তেন নিমা লা (১৯,০৩৭ ফুট) পেরিয়ে আরোহণ করেন সেন্টিনেল শৃঙ্গে (২১,২৪০ ফুট)। Kellas এবার বিজয় গৌরবে এগিয়ে যান উত্তর-পূর্ব সিকিমে। ১৩ই জুন থেকে ১৭ই জুন পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে পওহুনরী শৃঙ্গে (২২,৪৩০ ফুট) আরোহণে সমর্থ হন। জুলাই মাসে অনেকগুলি গিরিপথ পেরিয়ে চোমিওমো (২২,৪৩০ ফুট) শৃঙ্গে আরোহণ করেন। মাত্র দুমাসের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সিকিমের পওহুনরী (২৩,১৮০ ফুট), চোমিওমো (২২,৪৩০ ফুট), লাঙপো (২২,১০০ ফুট) ও সেন্টিনেল (২১,২৪০ ফুট) শৃঙ্গ জয় করা এক অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

১৯১২ :

সিকিম হিমালয় যেন Dr. Kellas-এর রক্তের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। তাই তিনি এ বৎসরও আসেন উত্তর-পূর্ব সিকিমে। এবার তিনি ডোঙকিয়া-লা অতিক্রম করে কাঞ্চন ঝাউ-এর দিকে যান। কিন্তু তিনি কাঞ্চন ঝাউ (২১,৭০০ ফুট) আরোহণ করেন নি।

১৯২০ :

দীর্ঘ আট বৎসর পর Dr. Kellas আবার সিকিম হিমালয়ের ডাকে এসেছিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সিকিমের নরসিঙ্‌ (১৯,১২৮ ফুট)

শৃঙ্গে আরোহণে ব্যর্থ হন। তিনি বুঝতে পারেন দেহে তাঁর আর সেই অমিতবিক্রম নেই। তিনি আরও আবিষ্কার করেন যে তাঁর হার্ট এর গোলমাল শুরু হয়েছে।

১৯২১ :

হার্টের সামান্য অসুখ Dr. Kellas-এর উৎসাহকে নিভিয়ে দিতে পারে নি। তার প্রমাণ পর বৎসরই আবার হিমালয়ের ডাকে সাড়া দেওয়া। তিনি হয়তো জানতেন না এইবারই তাঁর শেষ হিমালয় ভ্রমণ। প্রথম এভারেস্ট অভিযানের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন সিকিমে মে মাসের শেষের দিকে। অন্যান্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে সিকিমের জেলাপ-লা (১৪,৩০০ ফুট) পেরিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন চুম্বি উপত্যকায়। সেখানেই তাঁর হার্টের অসুখ দেখা দেয়। পরে টাঙ্‌ লা (১৫,২০০ ফুট) পেরিয়ে খাম্পাজঙ পৌঁছবার পথে Kellas-এর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। হিমালয়ের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় জুন মাসের গোড়ার দিকে তিনি পরলোক গমন করেন। Kellasকে হিমালয়ের বুকের মাঝেই রাখা হয় সমাহিত করে।

১৯২৯ :

প্রখ্যাত জার্মান পর্বতারোহী Paul Bauer-এর নেতৃত্বে একটি পর্বতারোহী দল জুলাই মাসে আসেন সিকিম হিমালয়ে। তাঁদের উদ্দেশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে আরোহণ করা। তাঁরা জেমু হিমবাহে ১৪,৩৪০ ফুট উচ্চে মূল শিবির স্থাপন করেন। তাঁরা যথাক্রমে ১৭,৩০০ ফুটে ষষ্ঠ শিবির, ১৯,১২৮ ফুটে সপ্তম শিবির, ২০,৫৭০ ফুটে অষ্টম শিবির, ২১,৫৫০ ফুটে নবম ও ২২,৭০০ ফুটে দশম শিবির স্থাপন করেন। ৩রা অক্টোবর যখন ছয়জন পর্বতারোহী ও চারজন শেরপা ২৪,২৫০ ফুট উচ্চে শিবির স্থাপনের স্বপ্ন দেখছিলেন, ঠিক সেইদিন রাত্রেই প্রচণ্ড তুষার ঝড় এসে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দেয় ধূলিসাৎ করে। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন প্রকৃতি। পল বয়ার অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিরাপদে সমস্ত শিবির গুটিয়ে নিচে নেমে আসেন সদলবলে মূল

শিবিরে। Baur এই অভিযানে কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর-পূর্ব অংশ, এর ২৪,২৫০ ফুট পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার গঠনপ্রকৃতি, বরফ ও তুষারের অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন।

১৯৩০ :

Prof G. O. Dyhren Furth বেশ বড় পর্বতারোহীর দল নিয়ে এই বৎসর আসেন কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে। তাঁর দলে অন্যান্য পর্বত আরোহীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত পর্বতারোহী Frank. S. Smythe Dyhren Furth Freshfield-এর প্রস্তাব অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে আরোহণের চেষ্টা করেন। ২৬শে এপ্রিল কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমবাহে ১৬,৫৭০ ফুটে মূলশিবির স্থাপিত হয়। এরপর হিমবাহের আরও ওপরে যথারীতি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিবির স্থাপিত হয়। তৃতীয় শিবির থেকে খাড়া বরফের প্রাচীর আরোহণের সময় বিশাল তুষার ধসে চেতন নামে বিখ্যাত শেরপার মৃত্যু হওয়ায় অভিযান পরিত্যক্ত হয়। পরে এই দল জঙসঙ শৃঙ্গ (২৪,৩৪৪ ফুট) নেপাল শৃঙ্গ (২৩,৫৬৬ ফুট), ডোডাঙ নিমা (২৩,৬২০ ফুট) ও রামথাঙ (২৩,৩১০ ফুট শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

১৯৩১ :

১৯২৯ সনের অভিজ্ঞতার ফলে Paul Bauer আরও শক্তিশালী দল নিয়ে জুলাইএ জেমু হিমবাহে পুরনো স্থানেই মূলশিবির স্থাপন করেন। ১৩ই জুলাই স্থাপিত হয় ষষ্ঠ শিবির। সপ্তম শিবির স্থাপিত হয় ১৯,১২৮ ফুট উচ্চে। সেখানে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী মজুত করা হয়। ৯ই আগষ্ট অষ্টম শিবিরের পথ বানাতে গিয়ে পাশাঙ্ ও স্ক্যালার (Schalier) পা ফস্কে ১৭৫০ ফুট নিচে পড়ে প্রাণ হারান। আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় অভিযানের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। Bauer কিন্তু এতে নিরুৎসাহ না হয়ে অষ্টম শিবির ও ২১,৫৫০ ফুটে নবম শিবির স্থাপন করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ২২,৯৮০ ফুট উচ্চে দশম শিবির স্থাপিত হয়। ১২ই তারিখে ছয়জন সদস্য ও তিনজন শেরপা

সেই শিবির অধিকার করেন। তারপরেই শুরু হয় সত্যিকারের বাধা। ফলে ১৬ই সেপ্টেম্বর ২৪,১৫০ ফুট উচ্চে বরফের গুহার মতো করে একাদশ শিবির স্থাপিত হয়। সেই শিবিরে মাত্র দুজনের স্থান ছিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর শিবিরের দুজন সদস্য ২৫,২৬৩ ফুট উচ্চে গিরিশিরায় আরোহণ করে পরবর্তী শিবির স্থাপন ও অগ্রগতির পথের হদিস করেন। কিন্তু নরম বরফ, গিরিশিরার বেশ কিছু অংশ হঠাৎ ঢালু হওয়ায় অগ্রগতি সাংঘাতিক বিপজ্জনক ও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নিরাপত্তার কথা ভেবে চার রাত্রি একাদশ শিবিরে কাটাবার পর শিবির গুটিয়ে ফিরে যাওয়াই সাব্যস্ত হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের এমন অভিযান পরিত্যক্ত হয় অবশেষে। এই অভিযানে Paul Bauerএর সাংঘাতিক পরিশ্রমের জন্য হার্টের অসুখ দেখা দেয়। পরে তাঁকে বহু কষ্টে আনা হয় নিচে নামিয়ে। প্রত্যাবর্তনের পথে দলের দুজন সদস্য সুগারলোফে (২১,২৬০ ফুট) আরোহণ করেন। Bauer-এর অভিযানে জেমু হিমবাহের নির্ভরশীল ম্যাপ তৈরি করা হয়।

১৯৩৫ :

এই বৎসর C. R. Cooke নভেম্বর মাসে ছোট দল নিয়ে আসেন কাব্রুশিখর (২৪,০০২ ফুট) আরোহণের উদ্দেশ্যে। কুকের ধারণা নভেম্বরে জলবায়ু ও বরফের অবস্থাপর্বতারোহণের উপযোগী। Cooke-এর সঙ্গে মাত্র আর একজন সদস্য ছিলেন। ১৮ই নভেম্বর তাঁরা মূলশিবির স্থাপন করেন। ১৮ই নভেম্বরের মধ্যে কাব্রু হিমপ্রপাত অতিক্রম করে অন্যান্য শিবির স্থাপন করে কাব্রুর শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। কাব্রু শীর্ষে পৌঁছনোর সামান্য দূরত্ব তিনি একাই অতিক্রম করেন। তিনি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা লক্ষ্য করেছিলেন (-) ১১° ফা.। তিনি কোনো তুষারপাত বা তুষার ঝড় ভোগ করেন নি।

১৯৩৬ :

নাঙ্গা পর্বত অভিযানের প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে Paul Bauer ছোট্ট

অভিযাত্রী দল নিয়ে আসেন সিকিমে। আগষ্টের মাঝামাঝি অভিযাত্রী দল জেমু হিমবাহে মূলশিবির স্থাপন করে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরিচালনা করেন। সেপ্টেম্বরে তাঁরা চেষ্টা করেন টুইন (২৩,৩৬০ফুট) ও টেণ্ট (২৪,০৮৯ ফুট) পিক আরোহণের। নেপাল শৃঙ্গের (২৩,৫৬০ফুট) শীর্ষের কাছে পৌঁছে তুষার ধসের জন্য ফিরে আসেন ব্যর্থ হয়ে। ১৯শে সেপ্টেম্বরে তাঁরা সিনিউলচু শৃঙ্গে (২২,৬০০ফুট) আরোহণের চেষ্টা করেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর আরোহণ করেন সিনিউলচু শৃঙ্গে। ২রা অক্টোবর পশ্চিমে ২১,৪৭৩ ফুট উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করে নেমে আসেন লোনাক উপত্যকায়। সেখান থেকে দুর্গম সিম্ভু স্যাডল অতিক্রম করে নেমে আসেন পাশারাম হিমবাহে। ঐ হিমবাহ থেকে জেমু ও সিনিউলচুর দক্ষিণাংশে প্রাথমিক সার্ভে করে সমীক্ষা চালান জুমটু হিমবাহে।

ঐ বৎসরই Eric Shipton তাঁর দুজন সঙ্গী নিয়ে কোঙড়া-লা পেরিয়ে সিকিমে প্রবেশ করেন এভারেস্টে অভিযান থেকে প্রত্যা-বর্তনের পথে। সেই সময় তাঁরা গোর্দামা শৃঙ্গে (২২,২০০ ফুট) আরোহণ করেন।

১৯৩৭ :

জার্মান সুইসদল সেপ্টেম্বর মাসে জেমু হিমবাহে ছয় সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। তাঁরা টেণ্ট ও টুইন পর্বতশৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে ২৬শে সেপ্টেম্বরে তাঁরা আরোহণ করেন সিনিউলচু পর্বতশৃঙ্গে।

এই বৎসরই C.R. cooke, John Hunt ও Mrs. Hunt ১৮ই অক্টোবর থেকে ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত জেমু হিমবাহে অতিবাহিত করেন। ৪ঠা নভেম্বর Hunt ও Cooke নেপাল গ্যাপে পৌঁছতে সমর্থ হন। হাণ্ট ঐ সময় নেপাল শৃঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম শীর্ষে (২৩,৪৪০ফুট) আরোহণ করেছিলেন। এর পর শেরপাদের নিয়ে Cooke আরোহণ করেছিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘার নর্থ কলে (২২,৬২০ ফুট)।

১৯৩৯ :

১৯৩৭ সনের জার্মান-সুইস দলের অভিযাত্রীদের তিনজন সিকিম হিমালয়ের আকর্ষণে আবার আসেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল টেণ্ট পিকে আরোহণ করা। তাঁরা ১৯৩৬ সনে Paul Bauer ও ১৯৩৭ সনে Hunt এর অনুসৃত পথ ধরে এগিয়ে অসাধারণ সংগ্রাম করে অবশেষ আরোহণ করেন টেণ্ট পিকে।

এর পরেই শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। টেণ্ট পিকে আরোহণকারী তিনজনের মধ্যে E. Grob সুইস অভিযাত্রী বলে দেশে ফিরে আসেন। অপর দুজন জার্মান অভিযাত্রী L. Schmaderer ও H. Paider দেরাদুনে যুদ্ধবন্দী হিসাবে বাস করতে থাকেন। একদিন এই দুঃসাহসী অভিযাত্রী দুজন Harrer-এর মতো নেলাঙ হয়ে তিব্বত সীমানায় আসেন পালিয়ে। তারপর তাঁরা পূর্বদিকে অগ্রসর না হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় স্পিতি এসে হাজির হন। তখন ১৯৪৫ সন। যুদ্ধের রণদামামা থেমে গেছে তখন। কিন্তু হতভাগ্য অভিযাত্রীদ্বয় সে খবর জানতেন না। তাঁরা তাই লুকিয়ে ছদ্মবেশে স্পিতির ছোট গ্রাম তাবোর কাছে আসতেই Schmadererকে গ্রামের দুর্বৃত্তরা ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। Paider আত্মগোপন করে 'পু'তে এসে স্থানীয় পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। পুলিস অবশ্য হত্যাকারীকে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। Paider নির্বিঘ্নে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

যুদ্ধের পরবর্তীকালে সিকিম হিমালয়ে বিদেশীদের ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে থাকে। তবু যুদ্ধোত্তর যুগে সিকিমের পর্বত অভিযান বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছিল। তবু ১৯৪৫ সনে থেকে ১৯৫০ সন পর্যন্ত বিদেশী অভিযান মোটামুটিভাবে অব্যাহত ছিল। ১৯৫৪ সনে নেপালের দিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার পথ সম্পর্কে মোটামুটি অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। ১৯৫৫ সনে R. C. Evans-

এর নেতৃত্বে কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন তাঁর দলের সদস্যরা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম Streather। ইতিমধ্যে সিকিমের অনেক শৃঙ্গই পবিত্র বলে ঘোষিত হওয়ায় এবং অনেক অঞ্চল, নিষিদ্ধ অঞ্চল বলে ঘোষিত হওয়ায় বিদেশী অভিযাত্রীদের কাছে সিকিম হিমালয়ের দ্বার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয় পর্বতারোহী দল কিছু কিছু পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন। এর মধ্যে ১৯৬১ সনে সোনাম গিয়াৎসোর নেতৃত্বে একটি অভিযাত্রী দল উত্তর-পূর্ব সিকিমের কাঞ্চনঝাউ (২২,৭০০ ফুট) শৃঙ্গে আরোহণ করেন ২১শে অক্টোবর। ১৯৬২ সনে মে মাসে হিমালয়ান মাউণ্টেইনীয়ারিং ইনস্টিট্যুটের এডভান্স কোর্সের ছাত্ররা ফ্রে পিকে (১৯,১৩০ ফুট) আরোহণ করেন। ১৯৬৩ সনে কলকাতার পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘ সিকিম হিমালয়ে অভিযান চালিয়ে ছিলেন বর্ষার আগে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডিম, কাব্রু সাউথ, কাব্রু ডোম, র‍্যাথঙ ও গোচা গিরিশৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা করা।

কিন্তু সিকিম দরবার থেকে ছেমাথাঙ-এর দিকে যাবার অনুমতি না পাওয়ায় তাঁরা র‍্যাথঙ হিমবাহে চমরীকিয়াঙে মূলশিবির স্থাপন করে কাব্রুডোমে আরোহণের চেষ্টা করেন। ১৬,২০০ ফুট উচ্চে তাঁরা অগ্রবর্তী শিবির স্থাপন করেন পূর্ব র‍্যাথঙ হিমবাহে। সর্বশেষ শিবির স্থাপিত হয় কাব্রু হিমপ্রপাত পেরিয়ে ২১,২০০ ফুট উচ্চে। সেখানে থেকে ওরা মে সকাল আটটায় যাত্রা করেন শীর্ষের দিকে। বেলা সওয়া এগারোটায় ২১,৫৬০ ফুট উচ্চ কাব্রু ডোমে আরোহণ করেন। এর পর ৫ই মে কাব্রু সাউথের শীর্ষে আরোহণের জন্য যাত্রা করে প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের জন্য ২৩,২০০ ফুট থেকে ফিরে আসেন ব্যর্থ হয়ে। এই অভিযাত্রী দলের নেতা ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস। কিন্তু পরে কোনো পর্বতারোহী সংস্থা কাব্রুডোমে আরোহণ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে।

চমরীকিয়াঙে সন্ধ্যার অন্ধকার আসে নেমে। সারাদিন সব

জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলতে হয়। আগামী ভোরে আমাদের কিছু কিছু মালপত্র বয়ে নিয়ে ফ্রে পিকের দক্ষিণ দিকের গিরিশিরা ধরে ১৭,০০০ ফুটে কোকতাঙের গিরিশিরার সংযোগস্থলে শিবির স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্বাচন করে মালগুলো রেখে আসতে হবে। আগামী পরশু তাঁবু গুটিয়ে চলে যেতে হবে সেখানে। সারাদিন বেশ উত্তেজনায় কাটে। শিক্ষার্থীদের মনে বেশ চাঞ্চল্য, একটা কিছু দুঃসাহসী কাজ করতে চলেছে। সবাই তাদের জিনিসপত্র বার বার পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আলাদা করেছে। সব চাইতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন একজন বাঙালী নেভি-র অফিসার। তাঁকে সবাই আচারিয়া দাদা বলে ডাকত। আচারিয়া আমার তাঁবুতে কখনই ছিলেন না। চমরীকিয়াঙে হাজির হয়েই দেখি তিনি আমার তাঁবুর সামনে মালপত্র নামিয়েছেন।

জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কি দাদা—

ব্যাপার কিছুই নয়। আপনার কাছে থাকবো।

কিন্তু আমার পার্টনার

সে অন্য তাঁবু খুঁজে নেবে। কথাটা খুব সহজেই বলেন আচারিয়া। আমি অবাক হই। বলি, কিন্তু আপনি তো অন্যের সঙ্গে ছিলেন।

আচারিয়া দাদা ততক্ষণে তাঁর মালপত্র তাঁবুর ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছেন। কাজ করতে করতে জবাব দেন, ওদের সঙ্গে আমার পোষাবে না।

সে কি ?

হ্যাঁ মশাই। ওরা বড় সিগারেট খায়। বলুন আপনিই, high altitude-এ সিগারেট খাওয়া কি উচিত ? তারপর বয়স্ক লোক আমি, ছোঁড়াগুলো বয়সের সম্মানও দিতে চায় না।

ব্যাপারটা অবশ্য তা নয়। পরে জেনেছিলাম, আচারিয়া দাদা কবিতা লেখেন। দার্জিলিঙে যে কদিন ছিলেন, তার মধ্যেই লিখে ফেলেছিলেন ডজন খানেক। তারপর পথে প্রতিটি রাত্রি

যাপনের স্থানে লিখতেন। আর সঙ্গীকে শোনাতেন রাতে শুয়ে শুয়ে। তাঁর সঙ্গীটি কাটখোট্টা গোছের, কাব্যরস তার মনে হয়তো এক নতুন উৎপাতের সৃষ্টি করেছিল, যার জন্য মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল সে। চমরীকিয়াঙে আসবার পথে আচারিয়া দাদা একটু পিছিয়ে পড়াতেই, সমস্ত তাঁবুতে যার যার মতো পার্টনার বদলে নিয়েছিল। আচারিয়া দাদা দোরে দোরে গেছেন, অনুরোধ করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে আসতে হয়েছে আমার কাছে।

আচারিয়াদার জিনিসপত্র গোছানোর সময় দেখি বাঁধানো খাতা সযত্নে ভর্তি করেন রুকস্যাকে। বুঝি, ১৭,০০০ ফুটেও কবিতা লেখা হবে। মুখে কিছু বলি না, আচারিয়া দাদাই বলেন…high altitudeএ ডট্ পেন তো ঠিক থাকে কি বলেন?

মুখে বলি, হ্যাঁ, মনে মনে ভয় পাই। ওপরেও কি উদ্দাত্তকণ্ঠে কবিতা পড়ে শোনাবেন আচারিয়া দাদা? তাঁবুতে রাত্রে অবশ্য লিখতেন মোমবাতি জ্বালিয়ে। লেখার মুড আসায় আমি হয়তো শ্রোতা হতে পারি নি।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতেই ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে চলে আসি কিচেনে। আগুনের ধারে উপবিষ্ট তেনজিঙ নোরগে। কদিন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে, আর পথ চলে চিনে ফেলেছি লোকটিকে। পাহাড়ের চড়াই উৎরাই অতিক্রম করায় তাঁর সাবলীল গতি দেখে মনে হয়েছে যেন তিনি চলেছেন সমতল পথ ধরে। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে আমি যেখানে দম হারিয়ে হাঁসফাঁস করছি, নাক মুখ দিয়েও প্রাণ ভরে বাতাস টেনে নিয়েও তৃপ্ত হতে পারছি না, কণ্ঠতালু গেছে শুকিয়ে, তেনজিঙকে দেখেছি সহজ স্বচ্ছন্দভাবে গল্প করে যেতে। পৃথিবীর সেরা পর্বতারোহীদের পাহাড়ে চলা সম্পর্কে পড়েছি। কিন্তু তেনজিঙকে দেখে মনে হয়েছে, এতবড় পর্বতারোহী আর বোধহয় জন্মাবে না। তেনজিঙের কাছে সঞ্চিত সবচাইতে লোভনীয় সম্পদ তার পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতার কাহিনী।

শুধু উসকে দিলেই বলতে শুরু করেন। আমাকে দেখেই তেনজিঙ বলতে শুরু করেন হিন্দী নেপালী মেশানো ভাষায়, কাল বহুত মজা মিলেগা। বরফ বাগারা মিলেগা। দেখো, বহুত মজা !

মজার কথা চিন্তা করে অবশ্য চিন্তিত হয়ে পড়ি।

ফ্রে.পিক, আগে নাম ছিল কাঙ্‌শৃঙ্গ। ১৯,১৩০ ফুট উচ্চ পাথরের পর্বতশৃঙ্গ, পাথরের খাঁজে খাঁজে সামান্য বরফ, কিন্তু সুন্দর দেখতে। ১৯৫১ সনে বর্ষার পরে তেনজিঙ এসেছিলেন সুইস অ্যাসিস্টান্ট.ট্রেড কমিশনার জর্জ ফ্রের সঙ্গে। তাঁরা ইয়ালুঙ হিমবাহ পরিদর্শন করে র‍্যাথঙ গ্যাপ অতিক্রম করে এসেছিলেন র‍্যাথঙ উপত্যকায়। ফ্রে সাহেব কাঙ্‌শৃঙ্গ দেখে ঐ শৃঙ্গে আরোহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ফ্রের দলে পর্বতারোহী তিনিই, শেরপাদের সরদার ছিলেন তেনজিঙ।

ফ্রে সাহেবের ইচ্ছা অনুযায়ী শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। সবই ঠিক ছিল, মূলশিবির থেকে শৃঙ্গে আরোহণের জন্য যাত্রা করবার আগের দিন রাতে তেনজিঙ স্বপ্ন দেখেন। অদ্ভুত স্বপ্ন, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতা বৃদ্ধা খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করছে। তেনজিঙ যেন খুবই ক্ষুধার্ত, তিনি বৃদ্ধার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বৃদ্ধা তাঁকে কিছুই দিল না। স্বপ্ন দেখে তেনজিঙ সারারাত আর ঘুমোতে পারেন না। ভোরে সব শেরপাদের বলেন স্বপ্নের কথা। শেরপারা স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। শেরপাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এরকম স্বপ্ন সাংঘাতিক বিপদ ডেকে আনে। তারা সবাই সেদিন তাঁবু ছেড়ে বাইরে যেতে অস্বীকার করল। তেনজিঙও খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্বপ্নের কথা শুনে ফ্রে সাহেব হেসে উড়িয়ে তো দিলেনই, বরং উপহাস শুরু করেন। সকালে যাত্রার সময় শেরপারা ভয়ে বেঁকে দাঁড়ায়। ফ্রে সাহেব তৈরী হয়ে তেনজিঙকে ডাকলেন চল, রওনা হওয়া যাক।

তেনজিঙ নিজেও অস্বীকার করতেন। কিন্তু ফ্রে সাহেবের আহ্বান

পারেন না উপেক্ষা করতে। তাই তাঁকে যেতে হয় ফ্রের সঙ্গে, সঙ্গে এসে জোটে আঙদাওয়া। আর শেরপারা মূলশিবিরেই থেকে যায়।

মূলশিবির ছাড়িয়ে গ্রাবরেখার পাথর ও হিমবাহ পেরিয়ে পাহাড়ের খাড়া ঢাল আরোহণ করতে আরম্ভ করেন। কাঙের পর্বতগাত্র কিছু অংশ বরফে ঢাকা। সকলের আগে ফ্রে মাঝে তেনজিঙ শেষে আঙদাওয়া। তাঁরা কাঙ্‌শৃঙ্গকে তেমন উচ্চ নয় বলে ও ঢাল তেমন দুরূহ নয় দেখে, নিরাপত্তার জন্য দড়ি দিয়ে নিজেদের বেঁধে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। নরম বরফ বলে, প্রথম তাঁরা জুতোর তলায় লোহার ক্র্যাম্পনও লাগান নি। কিন্তু যতই উচ্চতা বাড়তে থাকে, ঢাল খাড়া হতে থাকে, বরফও শক্ত মনে হয়। তেনজিঙ ও আঙদাওয়া তাঁদের জুতোর তলায় ক্র্যাম্পন বেঁধে নেন। ফ্রেকে ক্র্যাম্পনএর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই, ফ্রে হেসে অসম্মতি জানান। ফ্রে অবশ্য অভিজ্ঞ পর্বতারোহী, তাঁর দেহ সুগঠিত, পর্বতারোহণের কলাকৌশলে সুদক্ষ। তাই তেনজিঙ নীরবে শক্ত বরফের ঢাল বেয়ে উঠতে থাকেন। ঠিক ১৭,০০০ ফুট উচ্চে আরোহণ করতেই তেনজিঙ আরও সাবধানে এগুতে থাকেন। পর্বতগাত্র খাড়া, বরফ বেশ শক্ত ও বিপজ্জনক। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগুতে এগুতে চারপাশ দেখে নেন তেনজিঙ। তাঁদের তিনজনের মধ্যে তখন ব্যবধান ছিল প্রায় পনের ফুট করে। হঠাৎ তেনজিঙ দেখেন ফ্রে সাহেবের পা শক্ত বরফের ওপরে পিছলে গেছে। কেন পিছলে গিয়েছিল, কেমন করেই বা পিছলে গেল বুঝবার আগেই তেনজিঙ দেখেন ফ্রে সাহেব গড়াতে গড়াতে তাঁর ওপরে যেন আসছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে রকম কিছু হয় না। ফ্রে গড়াতে গড়াতে পাথর ও বরফে ঠোক্কর খেয়ে তেনজিঙএর পাশ ঘেঁষে পড়তে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যে তেনজিঙ আইস এক্স বরফের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে অবলম্বন করে অন্য হাত দিয়ে ফ্রে সাহেবকে ধরবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু সাহেব এত বেগে পড়ছিলেন যে, তেনজিঙের হাতে

ঝট্‌কা দিয়ে, তাকে পেরিয়ে, নিচে আঙদাওয়াকে ছাড়িয়ে পাথরের গায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে প্রায় হাজার খানেক ফুট নিচে সামান্য সমতল স্থানে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যে তেনজিঙের মনে হয়েছিল যেন তাঁর দেহ পর্বতের গায়ে সেঁটে গিয়ে পাথর হয়ে গেছে। কিছু সময়ের জন্য কোনো শব্দ করতে পারেন না, আঙদাওয়ারও একই অবস্থা। দুর্ঘটনা এমনভাবে ঘটে গিয়েছিল যে তেনজিঙের মনে হয়েছিল, ফ্রে সাহেব যথারীতি তাঁর ওপরেই রয়েছেন। যেন মুখ তুললেই দেখতে পাবেন তাঁকে। কিছুটা সংবিত ফিরে পেতেই নিজেকে যথারীতি সামলে নিয়ে সন্তর্পণে তেনজিঙ্‌ নেমে যান আঙদাওয়ার কাছে। আঙদাওয়া ভয়ে কাঁপছিল ঠক্‌ঠক্‌ করে। বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করে তারপর দুজনে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নামতে শুরু করেন। প্রায় শ'খানেক ফুট নিচে নেমে তেনজিঙ ফ্রে সাহেবের ক্যামেরা উদ্ধার করেন। এমনি করে ধীরে ধীরে নেমে পৌঁছে যান—ফ্রে সাহেবের কাছে। তেনজিঙের বুকের ভেতরে এক অব্যক্ত বেদনা। ঝুঁকে পড়ে ফ্রে সাহেবের দেহ হাত দিয়ে অনুভব করেন, সাহেব অনেক আগেই মারা গেছেন। আঙদাওয়ার মুখের দিকে তাকান তেনজিঙ। আঙদাওয়ার মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত সরে গেছে। তেনজিঙ দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসেন ফ্রে সাহেবের কাছে। তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্বপ্নে দেখা সেই অপরিচিতা বৃদ্ধার মুখ! আঙদাওয়ার দিকে তাকাবার সাহস তাঁর হচ্ছিল না। তারপর কিছু সময় কেটে যায়। ফ্রে সাহেবের দেহ তাঁরা বয়ে নিয়ে আসেন। পরে গ্রাবরেখার পাথরের মধ্যে শান্তিতে শুইয়ে দিয়ে গুটিকতক পাথর দাঁড় করিয়ে রাখেন। সেই থেকে কাঙ্‌শৃঙ্গের নাম হয় ফ্রে পিক্‌।

একুশ

ভোর হতেই সাজ সাজ রব। পাঁচটায় বেড টী দিয়ে ঘুম ভাঙানো। সেই পাশাঙের ভাঙা গলা, গুড্ মর্নিং সাব! মগ এগিয়ে দিই। এত উঁচুতে সূর্যকিরণ তাঁবুর গায়ে না ঠেকা পর্যন্ত ভোর হওয়া বোঝা যায় না। কারণ, ঘুম ভাঙাবার জন্য কোনো পাখি নেই। মগ ভর্তি গরম চা নিয়ে আচারিয়া দাদাকে ডাকি। দাদা উঠে পড়েই বলেন. বুঝলেন ভাই, আপনি একটু তেনজিঙকে বলবেন বুঝিয়ে, আমি আজ যাবো না।

—যাবেন না, সেকি! শরীর খারাপ নাকি?

শরীর খারাপ! আচারিয়া দাদা যেন চেঁচিয়ে ওঠেন। শরীর খারাপ মানে? শরীর আমার আপনার চাইতেও ফিট্। জানেন, আমি বাইশ হাজার ফুট উঁচু স্থানকে পরোয়া করি না।

—তবে, গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলি।

—যেতে ইচ্ছে করছে না। দার্জিলিঙ থেকে সেই তো চলেছি, চলার শেষ নেই বুঝেছি। কিন্তু বিরতি মানে ইণ্টারভ্যাল থাকবে না কেন বুঝি না। আচারিয়া দাদা আমার মুখের দিকে তাকান জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে। আমি হেসে বলি, বেশ তো, আমাদের ইনস্ট্রাক্টার টাশীকে বলবেন। আমিও বলব।

বাইরে বেরিয়ে এসে আমার মনটাও যেন কেমন একটু মুষড়ে যায়। আকাশটা তেমনি নীল আর নেই, মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো মেঘ। র‍্যাথঙের ও কাব্রু ডোমের ওপরেও বেশ খানিকটা মেঘ। সবাইকে চা দিয়ে ফিরতি পথে পাশাঙ্ আমাকে দেখে বলে, মরশুম বিলকুল ঠিক নেই। হাসে পাশাঙ্। মরশুম আচ্ছা না হলে যেন ওর একটা বিশেষ আনন্দ। বিপদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে

যেন পাশাঙের আসল চেহারা জেগে ওঠে। অন্য সময় সে নিষ্প্রভ মন মরা।

হাত মুখ ধুয়ে নিই। ব্রেকফাস্ট নিয়ে রুকস্যাক কাঁধে করে মিলিটারীদের মতো 'ফল ইন' করি।

ক্যাপ্টেন মদন সিং কানে কানে বলে, শির ফাট্ যাতা হ্যায় দাজু?

আমার পাশেই দেখি আচারিয়া দাদা তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে।

অবাক হই,—কি হল, আপনি যাবেন না বললেন যে?

—যখন বলেছিলাম, বলেছিলাম। এখন আবার বলছি যাব!

—বহুত আচ্ছা! আমি হেসে ফেলি।

বেলা সাতটা বাজতে না বাজতেই রওনা হই। চমরীকিয়াঙের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড ছাড়িয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে যাই উত্তর-পশ্চিমে। চড়াইয়ের শেষ প্রান্তে দেখি সুন্দর করে পাথর সাজানো আর কতকগুলো প্রেয়ার ফ্ল্যাগ লাগানো। এবার র‍্যাথঙ হিমবাহের গ্রাবরেখা। রেখার চিহ্ন নেই বিন্দুমাত্র, এলোপাতাড়ি বিশাল আকৃতির পাথর ছড়ানো। শুনি এসবের নিচে রয়েছে বরফ। হয়তো হবে, কিন্তু আমি দেখতে পাই না কোথাও। বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে চড়াই-উৎরাই ভেঙে র‍্যাথঙ হিমবাহের বিস্তীর্ণ গ্রাবরেখা অতিক্রম করি কোনাকুনি ভাবে। পৌঁছে যাই ফ্রে পিকের পূর্ব পাদদেশে। পৌঁছেই বিস্ময়ে মূক হয়ে যাই। পাহাড়ের ঢাল জুড়ে অজস্র ব্রহ্ম-কমল আর তারই মাঝে মাঝে প্রায় ফুট তিনেক উঁচু ওটা কি দাঁড়িয়ে। কাছে গিয়ে বুঝতে পারি একপ্রকার পাতাযুক্ত মোচাকৃতি উদ্ভিদ্। পাতাগুলো গাছের ডগা থেকে গোড়া পর্যন্ত এমন ঘন সন্নিবিষ্ট, যে উদ্ভিদ্‌টাকে সবুজরঙের লম্বাটে মোচাকৃতি বলে মনে হয়।

এই ধরনের উদ্ভিদ্ তিব্বতের মালভূমিতে অজস্র। তিব্বতীরা নাকি এগুলো খায় ও ওষুধরূপে ব্যবহার করে। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে এর নাম Rheum Nobile. সাহেবরা একে Rhubarb বলে অভিহিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে মজার কাহিনী পড়েছিলাম। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্য সিকিমের উচ্চ হিমালয়ে প্রবেশ করেছিল। উচ্চ উপত্যকায় বিশালকায় Rhubarbগুলোকে দূর থেকে দেখে ভেবেছিল শত্রু-সৈন্য। তাই গুলিগোলাও চালিয়েছিল এই উদ্ভিদ্‌গুলোর দিকে। পরে কাছে গিয়ে দেখেছিল এই বিচিত্র গাছ। রেভিনিউ সার্ভেয়ার Capt. W. S. Sherwell ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে যখন এসেছিলেন সিকিম হিমালয়ে, তিনি এই অদ্ভুত উদ্ভিদ্ দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন It consists of a Conical Assemblage of buff-coloured leaves of great beauty elegantly crimped and edged with pink, the whole growing upon a substantial stem upon which, and hidden by the graceful leaves are bunches of flowers and triangular seeds some what resembling mignonette. The plant measures 45 inches in diameter at the base of the cone, and is about the same height.

এই গাছের কাণ্ড অত্যন্ত নরম ও টক স্বাদযুক্ত। পোর্টাররা বলে এগুলো সেদ্ধ করে খেতে বেশ ভাল। সিকিমীরা একে চুকা বলে। হুকার সাহেব এই গাছগুলির সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন: Pale pyramidal towers a yard high, of inflated reflexed bracts, that conceal the flowers and overlapping one another like tiles, protect them from the wind and rain : A whorl of broad green leaves edged with red spread on the ground at the base of the plant, contrasting in colour with the transparent bracts which are yellow, margined with pink.

মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ খেয়াল হয়, তাইতো আচারিয়া দাদাকে তো দেখছি না। কি ব্যাপার, সবাইকে জিজ্ঞাসা করি। একজন শিক্ষার্থী জানায়, দাদা কিছু দূর এসেই ফিরে গেছেন। ফ্রে পিকের গিরিশিরায় উঠবার জন্য পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকি। দূর থেকে ঢালকে যতটা খাড়া ও বিপজ্জনক ভেবেছিলাম উঠতে শুরু করে বুঝি ততটা নয়। তবে বেশ সতর্কতার প্রয়োজন। চড়াই, আর গুঁড়ো গুঁড়ো পাথর যাকে Scree slope বলা হয় কতকটা তাই।

বেশ কিছু সময় পরে আমাদের অনন্তকালের চড়াই ভাঙা শেষ হয়ে যায়। গিরিশিরার ওপরে পৌঁছে পশ্চিম দিকে দেখি নেপালের সীমানা। বুঝতে পারি না ফ্রে সাহেব কোথা থেকে গড়িয়ে কোথায় পড়ে গিয়েছিলেন। তবে যতটা উঠেছিলাম, কোথাও আমাদের বরফ পেরুতে হয় নি। গিরিশিরায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে বিমর্ষ হই। সমস্ত আকাশ প্রায় মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। বুঝি এবার শুরু হবে তুষারপাত। ফ্রে পিকের গা বেয়ে আমরা উত্তর দিকে কোকতাঙএর গিরিশিরার সংযোগস্থলে পৌঁছবার সময় হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে একস্থানে আমার দৃষ্টি যেন আটকে যায়। পাথরের খানিকটা স্থান জুড়ে ঝাড়-লণ্ঠনের গায়ে ঝুলানো কাচের মতো অজস্র স্ফটিক, ম্লান আলোতেই ঝক্‌ঝক্ করছিল। ভীষণ শক্ত অবস্থায় সেঁটে রয়েছে পাথরের সঙ্গে। আইস এক্স দিয়ে বার বার তুলবার চেষ্টা করে হতাশ হয়ে ফিরে আসি। ইতিমধ্যেই শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়া ও তুষারপাত। নির্দিষ্ট স্থানে মালপত্র নামিয়ে রেখে সতর্কতার সঙ্গে নামতে থাকি। চমরীকিয়াঙে পৌঁছতে বিকেল তিনটে বেজে যায়। সমস্ত উপত্যকা আবছা অন্ধকারে ঢাকা, রঙীন তাঁবুগুলো সাদা তুষারের আবরণে ঢাকা। গা থেকে গুঁড়ো বরফ ঝেড়ে সন্তর্পণে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ি। ভেতরে দেখি আচারিয়া দাদা স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকে শুয়ে রয়েছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, বাইরে বুঝি খুব ঠাণ্ডা?

আমি তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আপনি মাঝ পথে কাউকে না বলে চলে এসেছেন যে।

আচারিয়া দাদা ছ'চোখ কপালে তোলেন—বলব কাকে?

মানে।

আপনারা সবাই তো পড়ি কি মরি করে ছুটছেন। দেখুন মশাই, পাহাড়ে এসেছি স্রেফ ছ'চোখ ভরে দেখতে। দেখছি, আরও দেখব। আমার অত তাড়া নেই ছুটোছুটি করবার।

কিন্তু, এদের সঙ্গে এসেছেন, এদের আইন-শৃঙ্খলা না মেনে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আচারিয়া দাদা বলেন, দাঁড়ান, আপনি বোধহয় ভুলেই গেছেন যে আমি মিলিটারী অফিসার। আমাকে শৃঙ্খলার কথা স্মরণ করিয়া দিচ্ছেন। Look, এতকাল তো সবই মেনে চলেছি, চলবো মুখ বুজে। ছু'চার দিন বিদ্রোহ করবার ইচ্ছে হয় না বুঝি?

আমি কোনো কথার জবাব না দিয়ে পোষাক বদলে ফেলি। তারপর ঢুকে পড়ি স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে।

গুড্ আফটার নুন সাব!

মগটা বার করে দিই পাশাঙের গলা শুনে। চা ঢালতে ঢালতে পাশাঙ্ বলে, মরশুম সাফা নেহি হোগা সাব?

আচ্ছা?

জী সাব, দাঁত বার করে হাসে পাশাঙ্।

আমি ভাবি, লোকটা কি আবহাওয়া দপ্তর নাকি? বলি, বরফ গিরনে সে বহুত মজা আতা হ্যায়। পাশাঙ্?

বিলকুল ঠিক সাব। আর এক দফা হেসে পাশাঙ্ বিদায় নেয়।

অবাক হই। কী জীবন এদের। বার বার পাহাড়ে এই ভাবে আসা, ঝড় বৃষ্টি, তুষারপাত, সমস্তই তার দেহের ওপর দিয়ে গেলেও রোমান্সের রঙ পারে না মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতে। তাই সন্ধ্যায় যখন দেখি পাশাঙ্ গৃহিণী আর পাশাঙ্ ছু' মগ ভর্তি গরম চা নিয়ে মুখোমুখি বসে, অগ্নিসাক্ষী করে অনর্গল বকতে আর খিলখিল করে হেসে ভেঙে পড়তে পড়তে উচ্ছ্বসিত হয়েছে কিন্তু ক্লান্ত হয় নি, তখন আমার মনে হয়েছে, এ আমি কোন জগতে অনাহূতের মতো ঢুকে পড়েছি? এ যে আমার সম্পূর্ণ অদেখা, অচেনা জগৎ। আবার আমাকে ভাবতে হয়েছে নতুন করে। আমার পরিচিত জগতের চিত্র এনে সামনে উপস্থাপিত করে চেয়েছি মিলিয়ে দেখতে। মেলাতে পারি নি।

দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত বৃদ্ধি পায়। নৈশ আহার তাড়াহুড়ো করে শেষ করতে হয়। শুয়ে শুয়ে তাই অফুরন্ত অবসর ভোগ করি। মাঝে মাঝে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে তাঁবুর ওপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলতে হয়।

আচারিয়া দাদার সঙ্গে ভাব জমে যায়। হঠাৎ আচারিয়া দাদা বলেন, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে বীরেন। তাই 'তুমি' বলছি। any objection?

আমি বলি, বিন্দুমাত্র না।

বেশ, আচারিয়া দাদা খুশী হন। দেখো, সবার সঙ্গে সব সময় মনের মিল হয় না। আমি জবাব দিই না। কিন্তু আচারিয়া দাদা নীরব থাকেন না, অনর্গল বকে যান নিজের কথা। তিন কুলে তাঁর কেউ নেই। বিধবা মা ছিলেন, মারা গেছেন বছর কয়েক আগে। দূর সম্পর্কের আত্মীয় রয়েছে ইত্যাদি···। গল্প শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ঝিমুনি আসে। আচারিয়া দাদার হাসি ও কাশির শব্দে চমকে উঠি। আচারিয়া দাদার কণ্ঠ শুনি, life is but an empty dream. একেবারে সাচ্চা কথা বীরেন। আমার dream যদি dreamই থাকত। স্লিপিংব্যাগের ভেতর থেকে আচারিয়া দাদার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনি।

আমি অবাক হই, মানে!

—সব কথার মানে হয় না। বুঝলে হে! ধর, কাউকে তুমি আপন করে কাছে ডেকে নিলে। সে অসহায়, সম্বলহীন, তাকে তুমি হাত ধরে তুলে নিয়ে এলে হতাশার মাঝখান থেকে, তাকে সাহস দিলে, ভরসা দিলে, এগিয়ে দিলে আলোর পথে।

আমি হাসি, বাঃ, আপনি যে কবি তাই জানতাম, কিন্তু রোমান্টিক কবি, সে কথা জানতুম না।

আচারিয়া দাদা ম্লান হাসেন, বীরেন, জীবনকে এখনও ঠিক চিনতে পার নি। আমার বয়স হয়েছে চল্লিশের ওপরে। তোমার চাইতে

অনেক বেশী দেখেছি। মানুষকে ভালবেসে বিশ্বাস করা যায় না, পাহাড়, পর্বত, ঝরনা, সবুজ বনানী এগুলোকে ভালবেসে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

আচারিয়া দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি আবছা অন্ধকারে। বাইরে আকাশ ভেঙে তুষারপাত হচ্ছিল। কেমন একটানা ঝিরঝির শব্দ। এ ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ।

বাইশ

বাইরে একটানা শোঁশোঁ শব্দ, সমস্ত তাঁবুটা যেন উড়ে যেতে চায় ঝড়ের দাপটে। এর মধ্যে এক নাগাড়ে উৎকট কাশির আওয়াজ। স্লিপিং ব্যাগের হুড থেকে মাথা বার করতেই জ্বালাকর হিমশীতল স্পর্শ লাগে সারা মুখে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার তাঁবুর ভেতরে, চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে নিয়ে দেখি আবছা মূর্তির মতো বসে ধুঁকছেন আর কেশে চলেছেন আচারিয়াদা। বাইরে একটানা তুষারঝড় বয়ে চলেছে তুষারঝড়ের প্রচণ্ড গতিবেগের জন্যই তাঁবুর ওপরে তুষারকণা জমতে পারে নি হয়তো। না হলে, এই সাংঘাতিক দুর্যোগেও বার বার বাইরে গিয়ে তাঁবুর ওপর থেকে বরফ সাফ করতে হত। উচ্চ হিমালয়ে তুষার সীমানার ওপরে এধরনের উৎপাত সইতে হয়। আচারিয়া দাদা কাশছেন অবিশ্রান্তভাবে। কাশির এক অদ্ভুত শব্দ, সেই সঙ্গে একটু গোঙানির আওয়াজের মতো। কখন থেকে এই কাশি শুরু হয়েছে জানি না। তবে মনে হয়, অনেক সময় ধরে একটানা কেশে চলেছেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বলে দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

স্লিপিং ব্যাগের চেইন আলগা করে মোমবাতি জ্বালাতে গিয়ে

হাঁফিয়ে উঠি। মাথার কাছে রাখা ফ্লাস্কে গরম জল, বার করে দিই আচারিয়া দাদার হাতে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ভীত হই। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। হাফরের মতো হাঁসফাঁস করছেন দম নেবার জন্য। সেই সঙ্গে উৎকট কাশি দমন করবার জন্য কেশে চলেছেন আরও বেশী করে। টর্চের আলো ফেলি মুখের ওপরে, তাঁর ঠোঁট জোড়া যেন নীলাভ, চোখ দুটো নিষ্প্রভ। মণিবন্ধে নাড়ী ক্ষীণ হলে ও দ্রুতলয়ে লাফাচ্ছে। আচারিয়া দাদাকে ডাকি, খুব কষ্ট হচ্ছে ?

আচারিয়া দাদা ঘাড় নাড়েন। অবস্থা ভাল নয়, অথচ বাইরে প্রচণ্ড ঝড়। আমাদের তাঁবুর কাছেই রয়েছে বিমল। উইণ্ড প্রুফ জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে টর্চ নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। হাতে পুরু দস্তানা, তবু টর্চ ধরতে আর প্রায় ফুটখানেক নরম বরফের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে সামান্য দূরে যেতেই যেন কাহিল হয়ে যেতে হয়। তীব্র হাওয়ার বেগে বরফের কণাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আসা তীরের ফলার মতো বেঁধে চোখে মুখে। নাক কান আগুনের মতো যেন জ্বলতে থাকে। বিমল জেগেই ছিল, ইনস্ট্রাক্টর টাশীও জেগে ওঠে। দু'জন এই দুর্যোগের মধ্যে আমাকে দেখে যেন হকচকিয়ে যায়। আচারিয়া দাদার অবস্থার কথা শুনে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসে আমার তাঁবুর ভেতরে। তারপর সারারাত ধরে চলে নানা চেষ্টা। বরফে ঢেকে যাওয়া ওষুধের বাক্স খুলে ওষুধ নিয়ে আসা, অক্সিজেন সিলিণ্ডার ও গ্যাস মাস্ক আনা। সারা রাত নীরবে আচারিয়াদার পাশে কোনো রকমে বসে কাটাই তিনজেন। অক্সিজেন দেওয়ায় আচারিয়া দাদার শ্বাসকষ্ট কিছুটা কমতে থাকে।

বিমল জানায়, এমার্জেন্ট কেস্। যত দ্রুত সম্ভব্ নিচে নামিয়ে দিতে হবে। না হলে দ্রুত অবস্থা খারাপ হয়ে আয়ত্তের বাইরে যাবে। আচারিয়া দাদার হাতের নখ দেখিয়ে বলে, দেখুন কেমন নীলাভ হয়ে গেছে, Pulmonary oedema দেখা দিলে আর রক্ষে নেই।

সকাল হলেও তুষারপাত বন্ধ হয় না। ঝড় থেমে যায় শুধু। খবরটা পৌঁছয় সবার কাছে। তেনজিঙ নিজেও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভোর ছটার মধ্যেই আচারিয়া দাদাকে নিচে পাঠানোর সমস্ত ব্যবস্থা হয়। বিমল চলে, সেইসঙ্গে একজন ইনস্ট্রাক্টর। আর সাতজন তিব্বতী পোর্টার চলে।

আচারিয়া দাদাকে দেখি, সাংঘাতিক ঝিমিয়ে পড়েছেন। বলি, দাদা, আপনাকে নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আচারিয়া দাদা ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন, কেন, আমার সামান্য কাশি হয়েছে, আজ রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বুঝিয়ে বলি, আপনার গতরাতে সাংঘাতিক কষ্ট হয়েছে। তাই ডাক্তারবাবু ব্যবস্থা করেছেন।

—না, তুমি ব্যবস্থা করেছ, আচারিয়া দাদার নিষ্প্রভ চোখ দুটো জ্বলে উঠতে চায়।

—আমি।

—yes, সামান্য কাশির জন্য আর রাতে তোমার ঘুম হয় নি বলে ষড়যন্ত্র করে নিচে তাড়িয়ে দিচ্ছ। আমি বোবা হয়ে যাই মুহূর্তের জন্য। টাশী বুঝিয়ে বলে, এখানে, এই আবহাওয়া থাকলে আপনার বিপদ হতে পারে।

—বিপদ, মানে মৃত্যু! না, আমি কিছুতেই যাবো না, মৃত্যুকে আমি পরোয়া করি নাকি? কোনো ওজর আপত্তি না শুনে আচারিয়া দাদাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসি। বিমল বলে গম্ভীর কণ্ঠে, মিঃ আচারিয়া, আপনার যে ধরনের কষ্ট হচ্ছে, তাতে এই অলটিটুডে থাকা আমি allow করতে পারি না।

যাত্রা শুরু হয়। আচারিয়া দাদা কুলির পিঠে বসেও চেঁচিয়ে বলতে থাকেন আর কাশতে থাকেন—না, আমি কিছুতেই যাবো না। বীরেন, তুমি traitor. হাত পা নাড়বার চেষ্টা করেন, কাঁদতে

চান চীৎকার করে। কিন্তু মাত্র একটি রাত্রি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা নিয়েছে কেড়ে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই, আচারিয়া দাদার ছু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে ঝরে। অস্পষ্ট কুয়াশায় সবকটি মানুষ ধীরে ধীরে ছায়ার মতো মিলিয়ে যায়। আমি আর দেখতে পাই না।

তেনজিঙ্ ঘোষণা করেন, আজ rest করো। তোমাদের রেখে আসা সব মালপত্র পোর্টার পাঠিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি। ফ্রে পিকের দিকে আর যেতে হবে না। তেনজিঙের মুখের দিকে তাকাই। কি এক দুশ্চিন্তার রেখা তাঁর সারা মুখে। দুশ্চিন্তায় আর অনিদ্রায় ক্লান্ত দেহমন নিয়ে তাঁবুর ভেতরে এসে বসি। ছোট্ট তাঁবুর ভেতরে প্রচুর স্থান, একটু আগেই ছিল স্থানাভাব।

র‍্যাথঙ গ্যাপের কাছাকাছি, প্রায় সতরে হাজার ফুট উঁচে শিবির স্থাপন করতে হয়। স্থানটি র‍্যাথঙ্ হিমবাহের গ্রাবরেখার পাথরের ওপরে। নিচে কাচের মতো স্বচ্ছ বরফ, কাছেই বিশাল বরফের ফাটল, তার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে জলধারা সুড়ঙ্গ পথে। প্রায় পঞ্চাশ ষাট ফুট নিচে সেই সুড়ঙ্গের মতো। জলধারার বজ্র নির্ঘোষ সুড়ঙ্গপথে যাবার ফলে কেমন এক গুম্‌গুম্ শব্দ যেন ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। এই শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের শিবিরের উত্তরে র‍্যাথঙ শৃঙ্গের চুড়া থেকে বজ্রনির্ঘোষে তুষার ধস নেমে সমস্ত অঞ্চল তোলে কাঁপিয়ে। তারপরই গাঢ় কুয়াশার মায়াজাল, তার মাঝে আত্মগোপন করে র‍্যাথঙ, কাব্রুডোম, ফর্কপিক, সমস্ত র‍্যাথঙ উপত্যকা। কিন্তু কতক্ষণ কুয়াশার এই মায়ার খেলা চলে বড় জোর ঘণ্টাখানেক। আবার চোখের সামনে থেকে সরে যায় আবরণ। র‍্যাথঙ্এর তুষারধবল শৃঙ্গ সূর্যালোকে ঝলমল করে ওঠে। যেন উপহাস করে আমার সদম্ভ দৃষ্টিকে বলে, দেখেছ আমার শক্তি, এই অমোঘ শক্তি নিয়ে সৃষ্টি করে চলেছি; ভেঙেচুরে ধ্বংস করে চলেছি। কার নির্দেশে জান, ঐ মহামহিমান্বিত সম্রাট কাঞ্চনজঙ্ঘার।

তোমরা যাকে মহাকাল বল, যাকে ভাব দুর্জয়লিঙ্গ বলে? তাঁবুর সামনে পাথরের ওপরে বসে বসে সারাদিন তাকিয়ে থাকি। সূর্যের রঙ বদলানো দেখি র‍্যাথঙের শীর্ষে। র‍্যাথঙের দক্ষিণ-পূর্বের গিরিশিরা সঙ্গে যুক্ত কাব্রুশিখর, এখান থেকে দৃশ্যমান নয়। এই গিরিশিরার দক্ষিণে বেঁকে গিয়ে কাব্রুডোমে মিলেছে। মাঝে বিশাল কাব্রু হিমপ্রপাতের উৎস। শুনেছি এই গিরিশিরার ওপর দিয়ে সিকিমের জনক লাহ্বছেন ছেম্বু তিব্বত থেকে যোগবলে এসেছিলেন র‍্যাথঙ্ উপত্যকায়। দূর থেকে দেখা কাব্রু হিমপ্রপাতের মধ্যে একদিন যেতে হয় র‍্যাথঙ্ হিমবাহ পেরিয়ে। কাচের মতো মসৃণ শক্ত বরফে ঢাকা র‍্যাথঙ্ হিমবাহে অসংখ্য ফাটল, উঁচু নীচু ঢেউ খেলানো। আধ মাইলের সামান্য বেশী প্রশস্ত হিমবাহ পেরুতে বেশ সময় লাগে। তারপর পূর্ব গ্রাবরেখার কাছ দিয়ে অসংখ্য বরফের স্তূপের অরণ্যের ভিড়ে ঢুকে পড়ি। পথ বিপজ্জনক, দুর্গম তবে দুর্লঙ্ঘ্য নয়। এই হিমপ্রপাতে প্রথম এসেছিলেন গ্রাহাম সাহেব, তারপর কুক। হিমপ্রপাতের মধ্যে থাকতেই র‍্যাথঙ্ শৃঙ্গের ওপর থেকে তুষার-ধস ভেঙে পড়ে প্রচণ্ড গর্জনে। পালাবার উপায় নেই, তাই তাকিয়ে দেখি সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো, হাজার হাজার টন বরফ গুঁড়ো হয়ে এগিয়ে আসে যেন জলস্রোতের বেগে। আমাদের সামনে র‍্যাথঙের পাদদেশ পর্যন্ত অসংখ্য বড় বড় বরফের ফাটলের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে তুষার-ধসের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়। আমাদের গায়ে শুধু লাগে প্রচণ্ড বেগে হিমপ্রবাহের ধাক্কা।

একদিন এগিয়ে যাই গ্রাবরেখা ধরে র‍্যাথঙ্ গ্যাপে। নিচে শ'কয়েক ফুট পরেই ইয়ালুঙ হিমবাহের সীমানা। সবুজ জুনিপারের ঝোপ উঁচু থেকে দেখা যায় অপূর্ব। দক্ষিণ দিকে দেখা যায় সমস্ত র‍্যাথঙ্ হিমবাহ, নদীর মতো নেমে গেছে এঁকেবেঁকে। সামনে, ডাইনে, বড় বড় নীলাভ জলযুক্ত হ্রদ, একে Glacial lake বলে। দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্রাবরেখার প্রাচীরের ওপরে সারিবদ্ধ ইয়াকের দল। মুগ্ধ

হয়ে বসে যাই, দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে প্রখ্যাত অভিযাত্রী শরৎচন্দ্র দাসের বর্ণনা মনে পড়ে।

I thought for a moment that the sages of old were wrong in their ideas of heaven. When one looks up from below, he naturally conceives paradise to be some where on high. But on reaching such lofty altitudes, where breathing is a natural and unsurmountable difficulty, I could not but smile at the ignorance of those sages in their ideas of heaven. They must have been deluded with the grandeur of the void that encompasses the universe, to risk the situation of their paradies in such a desolate region. From my position here on the top of hoary semarum, I saw paradise below, while above me were nothing but eternal snows where death alone can dwell. The hanging glaciers, the towering pinnacles, the rushing snow drifts, the thundering avalanches, the yawing crevasses, the splintering of rocks from frost, and above all the cold, all were but various appendages of the lord of death. He chose to make his abode here, to rule the skies as well as the world below with his thunder and rain.

"আমি ক্ষণিকের জন্য ভাবলাম, পুরাকালের মুনিঋষিদের স্বর্গ সম্পর্কে বড় ভুল ধারণা ছিল। নিচ থেকে যদি কেউ তাকান, ভাববেন স্বর্গ উঁচুতে কোথাও হবে। কিন্তু যেখানে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর, এমন এক উচ্চ হিমালয়ে এসে মুনিঋষিদের স্বর্গ সম্পর্কে অজ্ঞতার কথা ভেবে হাসি পাচ্ছিল। তাঁরা হয়তো বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল শূন্যতার অপরূপ সৌন্দর্যকে স্বর্গের কল্পনা করে মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এই নিঃসঙ্গ স্থানটুকু তাদের স্বর্গ সম্পর্কে ধারণাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। আমি সুদূর অতীতের Semarvmএর শীর্ষ থেকে স্বর্গকে দেখেছিলাম নিম্নে। আমার চারপাশে উচ্চে শুধু তুষারময় রাজ্য। সেখানে একমাত্র মৃত্যু বাস করতে পারে। এই ঝুলন্ত হিমবাহ, দীর্ঘ সূচাগ্র বরফের স্তূপ, দ্রুত গতিশীল তুষারস্তূপ, বজ্রনির্ঘোষকারী তুষারধস, প্রশস্ত মুখব্যাদনকারী বরফের ফাটল, পাথরচূর্ণকারী

তুষারকণা, সর্বোপরি সাংঘাতিক শৈত্য, মৃত্যু-দেবতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মৃত্যু-দেবতা এখানেই তাঁর বাসস্থান স্থির করে যেন নিচ থেকে তাঁর বজ্র ও ঝঞ্ঝা নিয়ে আকাশ ও সারা বিশ্বকে শাসনে রেখেছেন।"

তেইশ

বিদায় নিই সিকিম থেকে।

ফিরে আসি চমরীকিয়াঙ্, জোংরী। মনলেপচায় দাঁড়িয়ে আর একবার বলি, থুজি চে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

তিনজন লামার দেশ ইয়ক্সামে এসে দুদিন বিশ্রাম। লোবসাঙের বাড়ি যাই, স্বল্প ভাষী লোবসাঙ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পেমাকে দেখতে পাই না। মেঝেয় বসে তাকিয়ে দেখি বার বার। পেমার পদশব্দের আশায় উৎকর্ণ হই। ভাবি এই বুঝি আসছে সে তুম্বার সাজসরঞ্জাম নিয়ে।

লোবসাঙ আমার দিকে তাকায়। আমি বলি, কাকে খুঁজছি বুঝতে পেরেছো?

—হাঁ দাজু... !

—কিন্তু দেখছি না তো পেমাকে? ওখান থেকে ভেবেছি তোমাদের এখানে বসব। পেমা গাছ থেকে নাশপাতি এনে দেবে পেড়ে। খেতে খেতে কাঞ্চনজঙ্ঘার গল্প বলব।

লোবসাঙের মুখ স্বল্পালোকে ম্লান হয়। হঠাৎ উঠে যায়, কিছু সময় পরে, নিজেই কেতলি ভর্তি গরম জল আর তুম্বা নিয়ে এসে বসে। গরমজল ঢেলে দিয়ে তুম্বার একটি পাত্র এগিয়ে দেয় আমার দিকে, অপরটি নিজে নিয়ে দু-একবার চুষে খেয়ে বলে পরিষ্কার গলায়, পেমা আসবে না দাজু।

শেষটায় ওর স্বামী এসে নিয়ে গেছে তো। আমিও ওকে সেই কথাই বলেছিলাম। তা এতে তুমি খুশী হও নি মনে হচ্ছে। না হবারই কথা। এতদিন ছিল তোমাদের ঘরে। আরে ফিকর মত্ করো। লোবসাঙের হাত চেপে ধরে আনন্দে হাসতে থাকি। লোবসাঙ হাসে না। লোবসাঙ আমার দিকে শান্ত দৃষ্টি মেলে তাকায়, স্বামীর ঘরে সে যায় নি।

—তবে

লোবসাঙ বলে, বকরি নিয়ে গিয়েছিল, পাহাড়ে। সন্ধ্যায় বকরি ফিরে এল। কিন্তু পেমা এল না। রাতে খুঁজে দেখলাম। সকাল বেলায় দেখি র‍্যাথঙ চ্যুর ঠাণ্ডা জলে তার দেহ ভেসে আটকে রয়েছে পাথরে খাঁজে।

—লোবসাঙ!

—দাজু।

—আমার নেশার মতো হয়েছে। একটু ধরে তাঁবুর কাছে পৌঁছে দেবে?

—চল।

আবার দার্জিলিঙে ফিরে আসি। উৎসব সাঙ্গ হয়, শেরপা কফি হাউসের সামনে চেয়ারে বসে আমি আর বিমল কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে থাকি তাকিয়ে। হোস্টেল থেকে একে একে সবাই বিদায় নেয়। এর মধ্যে আচারিয়া দাদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে অনেক বার। কিন্তু তিনি আমাকে চিনতে পারেন না।

দার্জিলিঙ রেল স্টেশন।

স্টেশন প্লাটফরম ধরে এগিয়ে যাই ধীরে ধীরে ফার্স্ট ক্লাস কামরার সামনে। কামরায় উপবিষ্ট আচারিয়া দাদা, সামরিক পোষাকে সজ্জিত। আমার দিকে তাকান স্থির দৃষ্টি মেলে।

আমি বলি, একটা কথা বলতে এলাম যাবার সময়।

নেমে আসেন আচারিয়া দাদা। আমার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন, বল।

—পাহাড় থেকে আমি আপনাকে তাড়াই নি।

—জানি।

—তবু বোধহয় আপনি আমাকে অন্য কিছু ভেবে রেখেছেন।

আচারিয়া দাদা চকিতের জন্য ঘড়ি দেখে নিয়ে বলেন, বীরেন, আমি কি খুব সেন্টিমেণ্টাল?

—না।

—খুবই আনস্মার্ট।

—না

—সবাই কিন্তু ভাবে।

—আমি ভাবি নি।

—কিন্তু অলকা ভাবত। আমাকে বলত সেন্টিমেণ্টাল ফুল। ওকে আমি ভালবাসতে চেয়েছিলাম। আমার প্রার্থনার উত্তরে বলেছিল, তুমি ভালবাস? বিনিময়ে কি চাও, ভালবাসা? আমাকে গ্রাম থেকে শহরে এনেছিলে, কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলে…। তারপর চাকরির ব্যবস্থা করেছ যাতে আম নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি। উপকার করেছ নিশ্চয়ই। সেজন্য আমি ঋণী। কিন্তু সে ঋণ কি তোমাকে ভালবেসে বিয়ে করে শোধ করতে হবে। আমি কি বলেছিলাম জান বীরেন, বলেছিলাম—না। তারপর শুধু এই ছোট্ট শব্দটি। That's end.

—এসব কথা থাক আচারিয়া দাদা…

—হ্যাঁ থাক্। সিকিম হিমালয়ে এসেছিলাম ছ'চোখ ভরে দেখতে; পাহাড় দেখলাম, পাহাড়ী মানুষ দেখলাম। যারা পাহাড়ে যায় শখ করে, দেখলাম তাদেরও।

—কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ।

—সব কথা ভুলে যান। শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা ছাড়া।

—যাক্ বীরেন, তোমার ওপর দারুণ অভিমান হয়েছিল, কেন জান?

—না।

—তুমি আমাকে মরতে দাও নি বলে। যাক্, সময় হয়ে গেছে। আচারিয়া দাদা সামরিক কায়দায় আমার হাত চেপে ধরে হ্যাণ্ড সেক করেন। বাই বাই বীরেন, উইস ইউ গুড লাক! ট্রেন ছেড়ে দেয়। আমি ধীরে ধীরে ফিরে আসি। আবার তাকিয়ে থাকি সোনালী মুকুটধারী কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। বলি, থুজি চে কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাঞ্চনজঙ্ঘা তোমায় ধন্যবাদ।

॥ এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে-সব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি ॥

সংস্কৃত

গুহ্য সমাজ তন্ত্র—সম্পাদক বিনয়তোষ ভট্টাচার্য।
অদ্বয় বজ্র সংগ্রহ—সম্পাদক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বাংলা

বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীত—ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত।
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য—ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচী।
বৌদ্ধদের দেব দেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য।
কবি জয়দেব ও গীত গোবিন্দ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ইংরাজী

Himalayan Journal vol. i & ii—Sir Josheph Hooker.
Aitchison's Treaties vol. i.—3rd. Ed. Calcutta. 1892
The light of Asia—E. Arnold.
Report on a visit to Sikhim and the Tibetan frontier, 1874
—Edger. J. Ware.
Account of an Embassy to the court of Tesho lama in Tibet. 1806—Capt. Turner samuel.
Report of a Mission to Sikhim and Tibetan Frontier. 1885
—Macaulay Colman.
Hyderabad, Kashmir, Sikhim and Nepal 2 vols. 1887
—Sir R. Temple
Sikhim, with hints on mountain and jungle warfare exhibiting also the facilities for opening commercial relations through the state of Sikhim with central Asia, Tibet, western China.
—Col. J C. Gawler.

Land of the Thunderbolt.—Zetland Lawrence John
Lambley Dundas. (·Ronaldshay).
Lepchaland or Six week in the Sikkim Himalaya—F.
Donaldson.
Round Kangchenjunga—Freshfield. D.
Sikkim Gazetteer—Risley
Living with Lepcha—John Murris
Sikkim and Bhutan—J. C. White.
The Gate of Tibet—J.·.A. M. Lowis
The land of Lamas—Rockhill
Journal of the Asiatic Society of Bengal—1840
Journal of the Asiatic Society of Bengal
—Vol. xl. pt ii. 1871
Journey Through Sikkim—W. T. Blantford
Journal of the Asiatic Society of Bengal—1881
Contribution on Tibet—S. C. Das.
Journal of the Asiatic Society of Bengal—1873
Papers on the valley of Chumbi—Dr. Campbell.
Alpine Journal—Vol. xi. 1882, vol. xii. 1884,
Vol. xxiii. 1906-1907. vol. xxvi. 1910
vol. xxvi. 1912.
/ Royal Geographical journal—Vol. vi. 1884, Vol. xxxi. 1908.
Vol. xxxiv. 1919
Himalayan Journal—Vol. ii.1930, vol. iii. 1931, vol. iv.1932,
vol. v. 1933, vol. vi. 1934, vol. vii. 1935. vol. viii. 1936,
vol. ix. 1937.